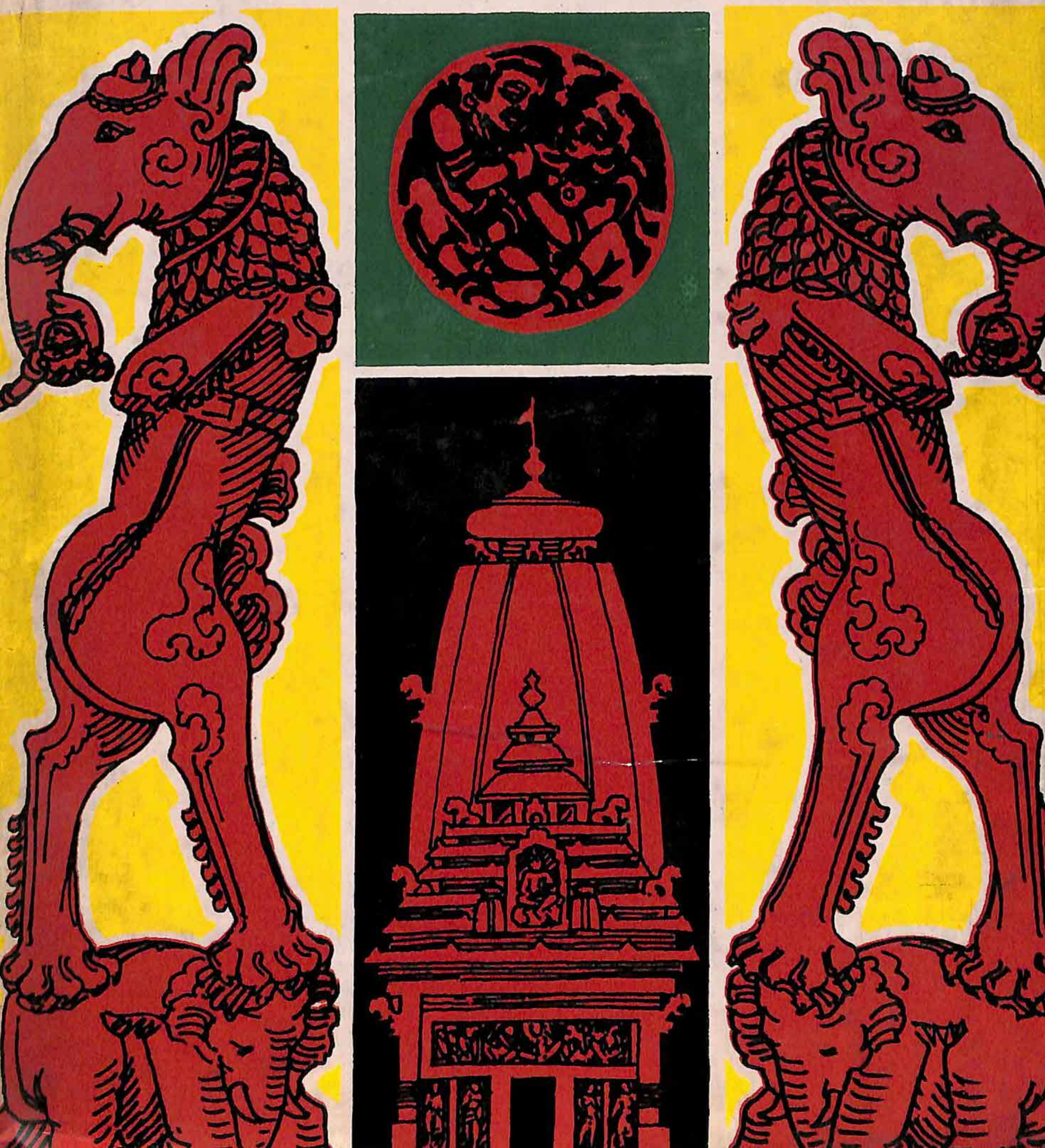
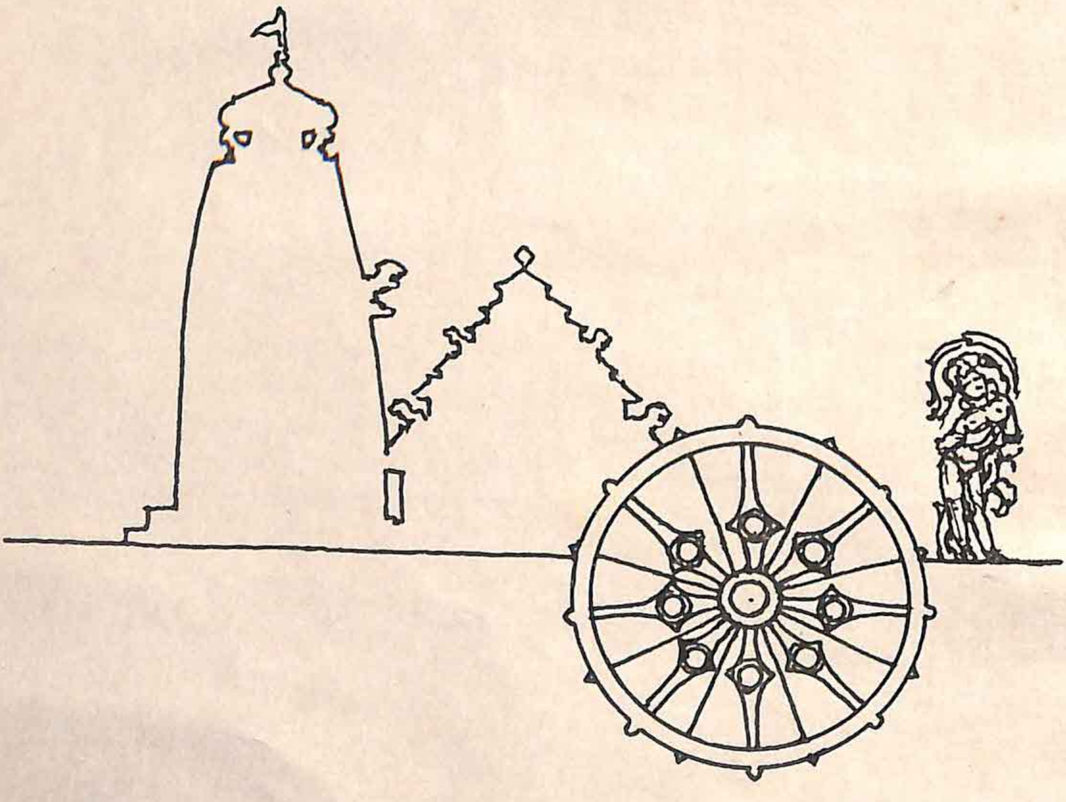
লাস্যতীর্থ কলিঙ্গ

নারায়ণ সান্যাল



কারুতীর্থ কলিঙ্গ



নারায়ণ সান্যাল

কারুতীর্থ কলিঙ্গ



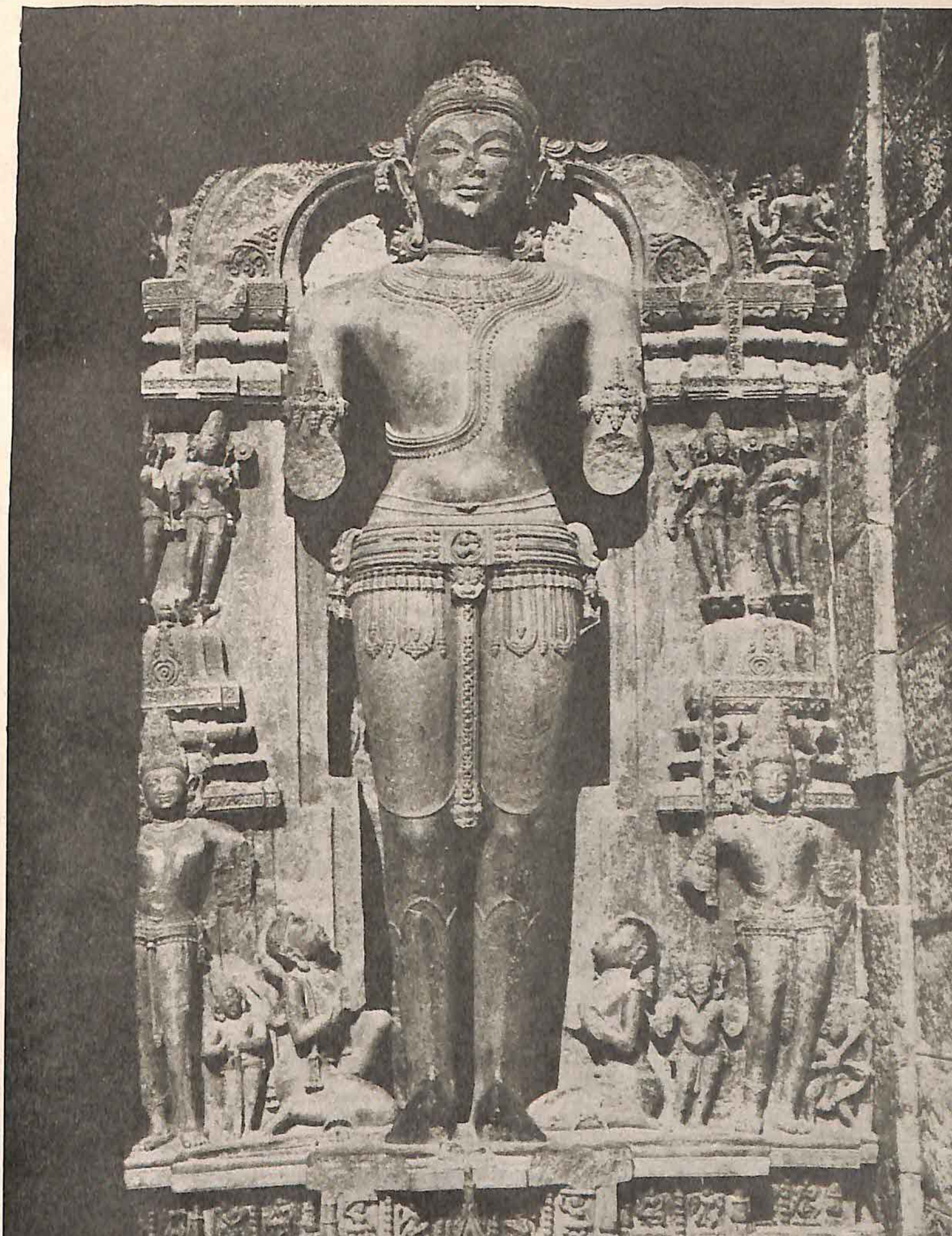
ভারতী বুক স্টল
6, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা 700 009

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার বারিক
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

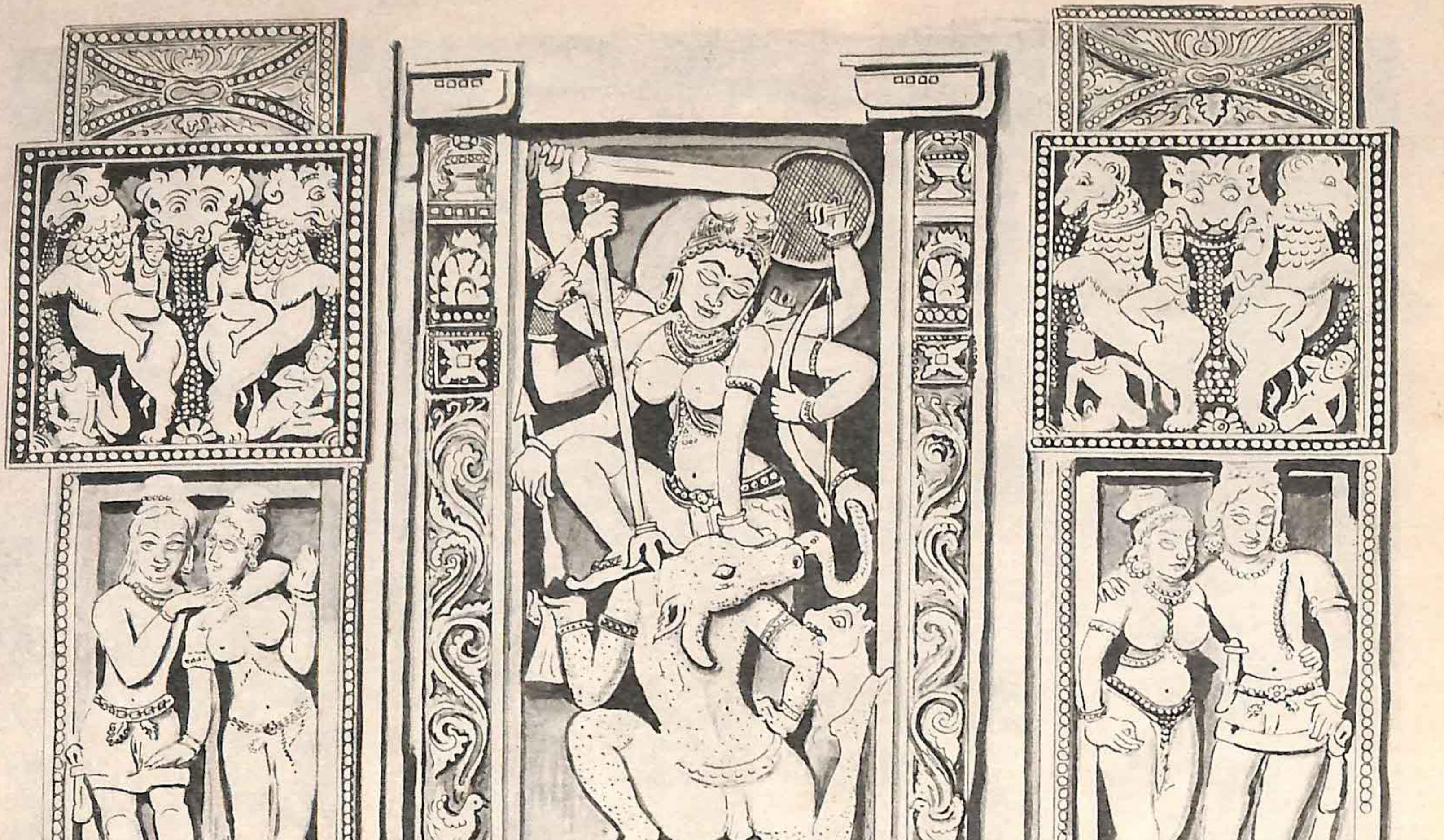
প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৯৩
ফেব্রুয়ারী, 1987

প্রচ্ছদ শিল্পী : খালেদ চৌধুরী

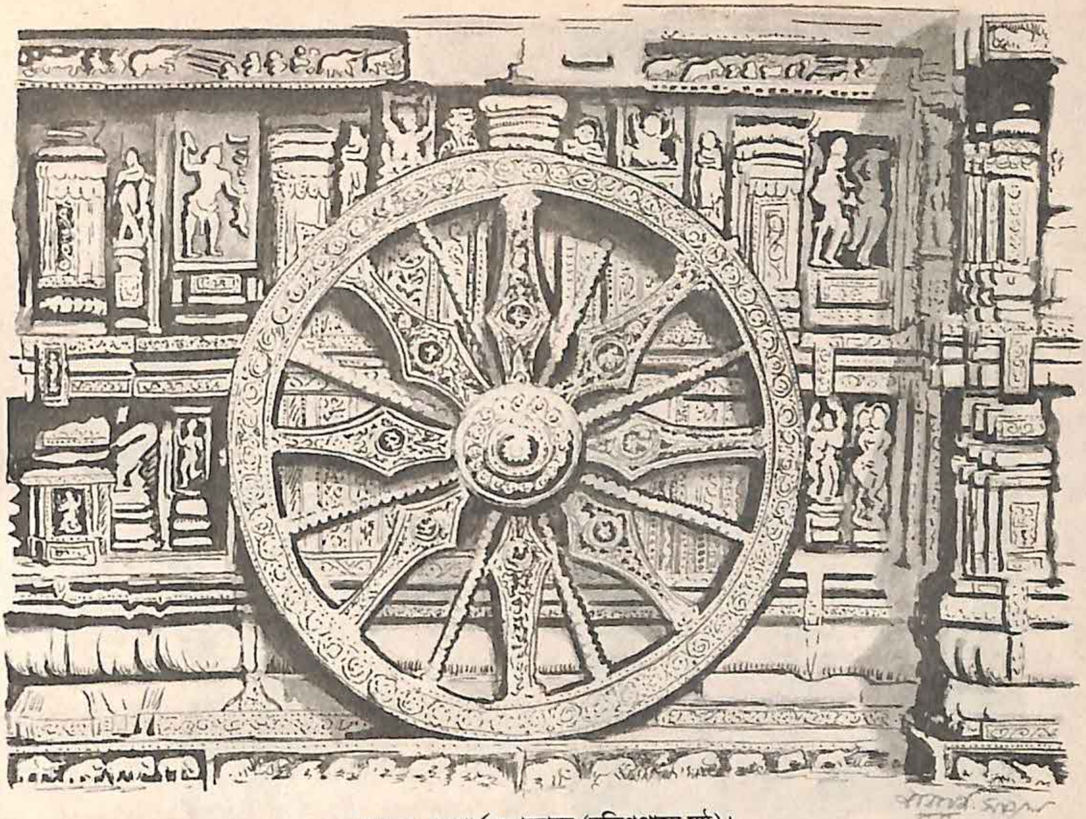
মুদ্রক : শ্রীতপনকুমার বারিক
অজন্তা প্রিন্টার্স
৭বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯



সূর্যমূর্তি, পশ্চিম পার্শ্বদেবতা, কোণার্ক জগমোহন।



মহিষমর্দিনী, বৈতাল-দেউল, ভুবনেশ্বর।



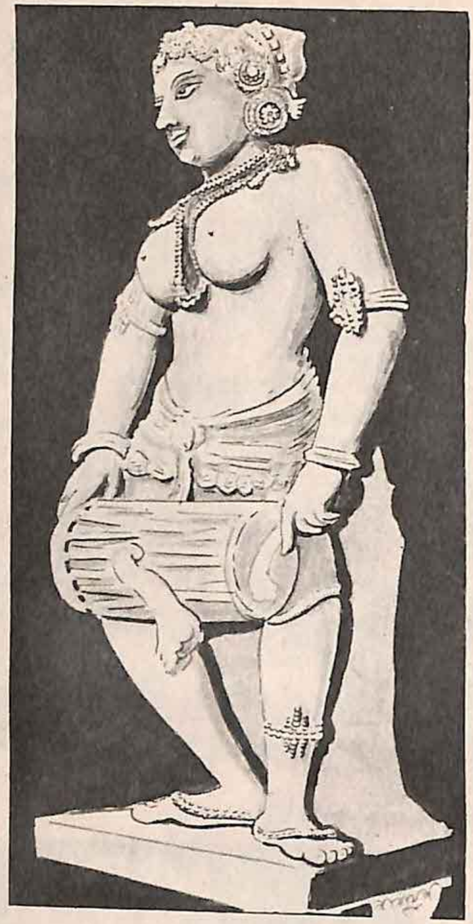
রথচক্র, কোণার্ক জগমোহন (দক্ষিণপ্রান্তে ষষ্ঠ)।



প্রথম পোতাল, কোণার্ক।



দ্বিতীয় পোতাল, উত্তরপ্রান্তে, পশ্চিমমুখী, কোণার্ক।



দেবদাসী, দ্বিতীয় পোতাল, পূর্বমুখী, কোণার্ক।



বরুণ মূর্তি, দিক্‌পাল, রাজারানী।



দেবদাসী, প্রথম পোতাল, উত্তরপ্রান্তে, পূর্বমুখী, কোণার্ক।



দেবদাসী, প্রথম পোতাল, দক্ষিণপ্রান্তে, পূর্বমুখী, কোণার্ক।

॥ কৈফিয়ৎ ॥

অনেকের কাছে, অনেক কারণে অনেকদিন ধরে অপরাধী হয়ে আছি। এই কৈফিয়তের সুযোগে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাক :

'কলিঙ্গের দেব-দেউল' নামে বহুদিন পূর্বে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। দীর্ঘদিন বইটি ছাপা নেই। ইতিমধ্যে অনেকে আমাকে পত্রযোগে প্রশ্ন করেছেন বইটি কেন পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে না। প্রত্যেককে ব্যক্তিগত-ভাবে জবাব দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। তার চেয়েও বড় কথা সাম্প্রতিককালে কেউ কেউ গুরুতর অভিযোগ এনেছেন—ইদানিং যাঁরা বই কিনেছেন তাঁরা লক্ষ্য করছেন বইতে যেসব ছবির উল্লেখ রয়েছে গ্রন্থে সেসব চিত্র ছাপা নেই! অপরাধী হিসাবে তাঁরা লেখককেই কটুকাটব্য করেছেন। উপায় নেই। সহ্য করে যেতে হয়েছে।

'কলিঙ্গের দেব-দেউল' বইটি রচনা করেছিলাম 1972-তে, প্রকাশিত হয় পরের বছর। অর্থাৎ চৌদ্দ বছর আগে। 'চৌদ্দ বছর কাঁদনে হয়' এবং 'দণ্ডকবন' কোথায় সেসব খবর জেনে ফেলেছি ; কিন্তু রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে পুনরুদ্ধার করতে পারিনি। কী করে করব ? আমার যে তেমন-তেমন লক্ষ্মণভাই ছিল না! শ্রীরামচন্দ্র সীতার অভাবে 'স্বর্ণসীতা' বানিয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন, আমিও 'কারুতীর্থ কলিঙ্গে' সান্ত্বনা পেতে চাইছি। রাবণ আমার নাগালের বাইরে!

আর একটু খোল্‌সা করে বলি :

'কলিঙ্গের দেব-দেউল' বইটির প্রকাশক ছিলেন শঙ্খ-প্রকাশনের তরফে শ্রীমান অমিতাভ মজুমদার। তাঁর পিতৃদেব শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ছিলেন আমার অনেক দিনের অকৃত্রিম বন্ধু। সত্তরের দশকে মনোরঞ্জনবাবু আমার অনেক অনেক বই একের পর এক ছেপেছিলেন 'শঙ্খ-প্রকাশন' এবং 'আনন্দধারা' প্রকাশন সংস্থাদ্বয়ের মাধ্যমে। অমিতাভর সঙ্গেও গড়ে উঠে-ছিল স্নেহ-শ্রদ্ধার এক নিকট সম্পর্ক। ঐ বইটি প্রকাশিত হবার পরের বছর সেটি ঘটনাচক্রে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহদাস পুরস্কার' পায়। পুরস্কার গ্রহণ করতে তাই দিল্লী যাবার প্রয়োজন হল। গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীমান অমিতাভ তখন দিল্লীতে থাকে। একাই। তখনো সে ছাত্র। তার আমন্ত্রণে তার ঘরেই আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। অমিতাভ আমাকে দিল্লী-স্থাপত্যের অনেক কিছু দেখিয়ে আনে। তখনই তাকে কথা দিয়েছিলাম—দিল্লী-স্থাপত্য নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও গ্রন্থ রচনা করি তবে অমিতাভই হবে সে গ্রন্থের প্রকাশক। আমি আমার সে প্রতি-শ্রুতি রাখতে পারিনি। কারণ বইটি লেখা যখন শেষ হল তখন না শ্রীমান অমিতাভ, না তার পিতৃদেব—কেউই আর 'শঙ্খ-প্রকাশন' অথবা 'আনন্দধারা'-র মালিক নন। বাধ্য হয়ে তাই সেই পাণ্ডুলিপিখানি (লা-জবাব দেহ্‌লী—অপরূপা আগ্রা) তুলে দিয়েছিলাম ভারতী বুক স্টলের তদানীন্তন সত্ত্বাধিকারী হৃষীকেশ বারিক মহাশয়ের হাতে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ-জনিত অপরাধের এই আমার কৈফিয়ৎ।

অমিতাভর 'ব্যাচিলার্স-ডেন'-এ যে-কদিন ছিলাম তার ভিতর একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। এ-কৈফিয়তের যেটা মূল প্রতিপাদ্য—প্রকাশকের চক্রান্তে লেখকের অসহায়ত্ব—তার সঙ্গে ঐ খণ্ডকাহিনীর যোগসূত্র আছে বলে সেটাও লিপিবদ্ধ করা গেল। পুরস্কার বিতরণী সভার ভিতরেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কয়েকজন ছাত্র হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করে ফেলে। কিন্তু তখন তাদের কথায় কান দেবার অবকাশ আমার ছিল না। মঞ্চের উপর বসে আছেন উপ-রাষ্ট্রপতি, এবং আমার ঠিক পাশের আসনটিতেই স্বনামধন্য ফাদার দাতিয়েন। তাঁর সঙ্গে তখন সদ্য আলাপ জমে উঠ্‌ছে। তিনিও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে কী একটা সম্মানপত্র গ্রহণ করতে এসে-ছেন। ঠিক মনে নেই, বোধহয় 'অনারারী-কজা' ডি. লিট বা ঐ জাতীয় কিছু। মোট কথা দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐ ছাত্রদের পাত্তা দেবার মত তখন না ছিল মেজাজ না সময়। ওরাও সেটা বুঝল। আমি কোন ঠিকানায় উঠেছি সংক্ষেপে জেনে নিয়ে কেটে পড়ল।

পরদিনই সকালে ওরা এসে হাজির। কী ব্যাপার ? শোনা গেল, দিল্লী প্রবাসী বাঙালী ছাত্ররা একটা বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করছে। ওদের ইচ্ছা আমি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকি। বলা বাহুল্য, আমি এক কথায় রাজী হয়ে যাই। পরদিন ওরা এসে আমাকে নিয়ে গেল। নাটক শেষে পৌঁছেও দিয়ে গেল। নাট্যসংস্থার নামটা এতদিন পরে মনে নেই ; কিন্ত নাটকটার কথা তের বছর পরেও ভুলিনি। একটি পাণ্ডুলিপি-নাটক। নাম : 'চালচিত্র'। মনে আছে এ জন্য যে, আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুবো-শাম যারা হরবখৎ রাষ্ট্রভাষায় বাৎচিৎ করে তারা যে

এমন সুন্দর একটা বাঙলা নাটক মঞ্চস্থ করবে এটা আমি আশা করতে পারিনি বলেই। অভিনয়ান্তেই আমি ফিরে এসেছি। কুশীলবেরা তখন তাদের মেক-আপ তুলতে ব্যস্ত, আর ফেব্রুয়ারীর দিল্লীর শীত আমার পাঁজরা ভেদ করছে। অপেক্ষা করিনি।

তাই তার পরের দিন সকালে ছাত্ররা আবার সদল-বলে এসে হাজির। নাটকটার বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হল। প্রসঙ্গত বাংলা-সাহিত্য। হঠাৎ একটি ছাত্র আমাকে প্রশ্ন করে বসল : আপনি আপনার কোন বই হিন্দিতে অনুবাদ করান না কেন?

হেসে বলি, প্রকাশক জোটেনি বলে।

—চেষ্টা করেছিলেন?

—হিন্দি প্রকাশনার কাউকে চিনি না, তাই সে চেষ্টা করিনি। তবে ইংরাজীতে একটি বই অনুবাদ করেছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটাও বেহাত হয়ে গেছে।

—'বেহাত' মানে?

—রাবণ-কর্তৃক অপহৃতা বলতে পার।

—বুঝলাম না।

খুলেই বললাম ওদের সব কথা। সাত-আটটি শ্রোতা—সবাই ছাত্র—মন দিয়ে শুনল।

যে বইটির ইংরাজী অনুবাদের প্রসঙ্গ উঠে পড়ল তার নাম সে আমলে ছিল 'অপরূপা অজন্তা'। সেটাও ঘটনাচক্রে একটা পুরস্কার পেয়েছিল, আর সেই সূত্রে বইয়ের এক কপি তদানীন্তন জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমারের হাতে আসে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করেন। তাঁর পরামর্শে বইটি আমি আদ্যন্ত পুনর্লিখন করি এবং 'অজন্তা অপরূপা' নামে প্রকাশ করি। তিনিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ঐ বইটির একটি ইংরাজী অনুবাদ করাতে।

বলা সহজ, করা কঠিন। অনুবাদটা করবে কে? সচরাচর অনুবাদক নির্বাচন করেন প্রকাশক; কিন্তু তাহলে সর্বপ্রথম প্রকাশক পাকড়াও করতে হয়। কী করে করব? ইংরাজী গ্রন্থের প্রকাশক বাংলা বই পড়বেন থোড়াই। এ বই 'অমুক' পুরস্কার পেয়েছে বললেও চিড়ে ভিজবে না। মাঝে মাঝে তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থও বিচিত্র কারণে যে আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়ে থাকে তা আমি-আপনিই অস্থিতে অস্থিতে জানি আর প্রকাশকেরা জানবেন না? অগত্যা নিজেই বসে যাই অনুবাদ করতে। বহু ঘষা-মাজা করে পাণ্ডুলিপি তৈরী হল। শতখানেক ছবি পুনরায় আঁকতে হল। দীর্ঘদিন পরে যখন সব কিছু সম্পূর্ণ হল তখন দেখি আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রথম শ্রেণীর ইংরাজী গ্রন্থের প্রকাশক প্রথমেই প্রশ্ন করেন ইতিপূর্বে আপনার প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থের নামটি কী? যাঁরা নিতান্তই পাঠক-পাঠিকা, অর্থাৎ নিজেরা লেখেন না তাঁদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না; আর যাঁরা লেখেন-টেখেন তাঁদের কাছে ব্যাখ্যাটা বাহুল্য : অর্থাৎ কোনও সাহিত্যের বাজারে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করা! খোদার কুদ্রতে শেষ পর্যন্ত একদিন শিকে ছিঁড়ল। দিল্লীর একটি অতি বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার কলকাতা ব্রাঞ্চ-অফিস পাণ্ডুলিপিটি অনুমোদন করলেন। স্ট্যাম্প-কাগজে রীতিমত কণ্ট্রাক্ট সই করে শতখানেক ছবি সহ টাইপ-করা পাণ্ডুলিপি কলকাতা অফিসে জমা দিয়ে এলাম।

ব্যস্! তারপরই ঘনিয়ে এল নৈঃশব্দ! তিন বছর ধরে আমি ক্রমাগত ঐ দিল্লী-অফিসে রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে গেছি। তাঁরা না-রাম, না-গঙ্গা! শেষমেশ পুনরায় একটি রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানালাম ক্ষমা-ঘেন্না করে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দিতে। যাতে আমি অন্য কারও দ্বারস্থ হতে পারি। প্রতিবারের মতো আমাকে সান্ত্বনা দিতে 'অ্যাক্‌নলেজমেণ্ট ডিয়ু' কাগজখানিই শুধু ফিরে এল। জবাব এল না। ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুঠো আঁকড়ে ধরে সেভাবে উকিলবাবুর শরণাপন্ন হলাম। তিনি কণ্ট্রাক্টখানি পড়ে বললেন, ওঁরা তো অন্যায় কিছু করছেন না। ওঁরা আপনার বইটি প্রকাশ করতে স্বীকৃত এ-কথাই শুধু বলেছেন। কবে, কতদিনের মধ্যে সে-সব কথা তো এগ্রিমেণ্টে লেখা নেই। বরং কণ্ট্রাক্টে উল্লেখ আছে যে, আপনার দেহান্তে আপনার ওয়ারিসবর্গ বংশ-পরম্পরায় রয়্যালটি পেতে থাকবেন। তাই নয়?

আমার চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়েছিল। আমতা আমতা করে বলি, তার মানে কি দাঁড়ালো যে, আমার জীবদ্দশায় বইটি ছাপা নাও হতে পারে?

—শুধু আপনার নয়, আপনার প্রত্যক্ষ ওয়ারিসদের জীবদ্দশাতেও না হতে পারে। তবে ছাপা হবার পর, তা সে যবেই হোক, প্রত্যক্ষ ওয়ারিসদের ওয়ারিস-বর্গ আইনানুগ রয়ালটি পাবে।

—বুঝলাম! এ-ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কী করতে পরামর্শ দেন?

—সীতা-উদ্ধারের সংকল্প ত্যাগ করতে! নতুন গ্রন্থরচনায় আত্মনিয়োগ করতে!

কাহিনীটি আমার তরফে করুণ! আশা ছিল, আমার তরুণ শ্রোতার দল গল্পটা শুনে আমাকে সহানুভূতি জানাতে অন্তত কিছুটা 'আহা-উহু' করবে। ওরা তার ধার দিয়েও গেল না। মাতব্বর শ্রেণীর একটি ছাত্র বরং বললে, এখন তো আপনি নিজেই দিল্লীতে এসেছেন, ওদের অফিসে গিয়ে পাণ্ডুলিপিটা ফেরত নিয়ে আসুন না?

বলি, সে-চেষ্টাও করেছি, ফল হয়নি কিছু।

—কেন ? কী বলল ওরা ?

—বললে, মালিক বোম্বাই গেছেন। ফিরতে দেরী হবে। আমার পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যাবে কিনা সে-কথা শুধু মালিকই বলতে পারেন। ওরা নিজ দায়িত্বে কিছু করতে পারবে না।

—দিল্লীর কোন্ প্রকাশন সংস্থা, বলুন তো ?

নামটা জানাই। ছেলেটি হাতঘড়ি দেখে বললে, দশটা বেজে গেছে। ওদের অফিস খুলেছে। আপনি জামা-কাপড় পাল্টে তৈরী হয়ে নিন দেখি মেসো-মশাই।

ছেলেটির জননীকে আমি চিনি না। তিনি নিশ্চয়ই আমার শ্যালিকা নন। কিন্তু তখনো আমার চুলগুলি এত সাদা হয়নি যে, 'দাদু' ডাকা চলে। আমি বলি, বৃথা চেষ্টা ভাই, মালিক যদ্দিন না আসছেন...

ওরা আমার কথায় কর্ণপাত করল না। বললে, সেসব আপনাকে ভাবতে হবে না। চলুন।

বাধ্য হয়ে আবার যেতে হল। দুখানি ট্যাক্সি নিয়ে ষাটের কোলে সাত-আটটি শ্যালিকাপুত্র সমেত। প্রকাশনা-দপ্তরের ম্যানেজার ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বিরক্ত হলেন। বললেন, কালই তো আপনাকে বলেছি মশাই, এখন কিছু করা যাবে না—

ছাত্রদের মুখপাত্র বললে, না, উনি আসতে চাননি। আমরাই ওঁকে জোর করে ধরে এনেছি। আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, শুনুন—

—বলুন ?

—এই ভদ্রলোক আপনাদের পাঁচ-সাতখানা রেজি-স্টার্ড চিঠি দিয়েছেন। আপনারা জবাব দেননি কেন ?

ম্যানেজার কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বললে, আপনারা কি তাই কৈফিয়ৎ তলব করতে এসেছেন ?

—এবং এখন স্বয়ং এসে পাণ্ডুলিপি ফেরত চাইছেন। আপনারা তাও দিচ্ছেন না। ব্যাপার কী ? কী পেয়েছেন আপনারা ? এটা দিল্লী শহর না মগের মুলুক ?

ওর কণ্ঠস্বরে ম্যানেজার একটু ঘাবড়ে যায়। কয়েকজন কর্মী তার কাছে ঘনিয়ে আসে। ম্যানেজার বলে, কী আশ্চর্য ! আমার কথাটা যে আপনারা বুঝতে চাইছেন না। ওঁর পাণ্ডুলিপি যে আলমারিতে রাখা আছে তার চাবি যে মালিকের কাছে ! আমি খুলব কি করে ?

ছাত্র-দলপতি এবার ওঁর ভিজিটার্স চেয়ারে জাঁকিয়ে বসে। বলে, লুক হিয়ার মিস্টার ! আপনাকে আমরা পনের মিনিট সময় দিচ্ছি। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়েই হোক, অথবা আলমারি ভেঙেই হোক, ওঁর পাণ্ডুলিপি এর মধ্যে ফেরত দিতে হবে। বুঝেছেন ? উইদিন ফিফ্‌টিন মিনিটস্।

ম্যানেজার রুখে ওঠে, আপনি কি আমাকে হুমকি দিচ্ছেন ?

—তাই তো দিচ্ছি মশাই ! এমন সোজা কথাটা বুঝতে আপনার এতটা সময় লাগছে ?

—আমি...আমি পুলিসে ফোন করতে পারি, তা জানেন ?

—কেন জানব না ? ঐ তো আপনার টেবিলেই টেলিফোন-রিসিভারটা রয়েছে। থানা-অফিসারকে বলুন, আমরা আপনাকে পনের মিনিটের আল্টি-মেটাম দিয়ে এখানে অপেক্ষা করছি।

আমি কী একটা কথা বলার উপক্রম করতেই ওর সহকারী আমার হাতটা ধরে অ্যাইসা হ্যাঁচকা টান মারল যে, আমি টাল সামলে স্ট্যাচু মেরে দাঁড়িয়েই থাকি।

ম্যানেজার আমতা আমতা করে, আপনারা কে ? কী পরিচয় বলুন তো ?

—আমরা সবাই দিল্লী-য়ুনিভার্সিটির ফাইনাল-ইয়ার স্টুডেন্টস্। আপনি আমাদের চেনেন না, থানা-অফিসার চেনে। তার খাতায় আমাদের নাম লেখা আছে কি না।

ম্যানেজারের গলকণ্ঠটা বারকয়েক ওঠা-নামা করল। বললে, আর পনের মিনিটের মধ্যে আমি যদি ঐ পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে না পাই, তাহলে আপনারা কী করবেন ?

—আমরা কী করব সে আলোচনা থাক। বরং আপনি কী করবেন সেটা শুনে রাখুন। কোন একটা 'গ্লেজিয়ার কোম্পানি'-তে তাহলে ফোন করবেন।

—'গ্লেজিয়ার কোম্পানি' ! তার মানে ?

—ঐ যারা কাচ মেরামত করে আর কি। পাণ্ডু-লিপিটা খুঁজে না পেলে কাল সকালে আপনার কিছু কাচের দরকার হবে তো। কারণ সকালে এসে দেখবেন শো-কেসের ঐ বড় বড় কাচগুলো সব চুরমার হয়ে ঘরময় ছড়ানো। মালিক ফিরে আসার আগে সেগুলো মেরামত করে রাখাই ঠিক নয় কি ?

ম্যানেজার উঠে দাঁড়াল। তর্জনীটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, ঐ ওঁর সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক ?

—দেশওয়ালী ভাই। আমরা সবাই বাঙালী। ক্যালকাটার। দু-একজন আবার নক্‌শালবাড়ির। 'নক্‌শালবাড়ি' নামটা শুনেছেন তো ?

ম্যানেজার জবাব দিল না। গট্ গট্ করে চলে গেল পাশের ঘরে। অনতিবিলম্বেই সে ফিরে এল। তার হাতে আমার পাণ্ডুলিপি এবং তাড়াবাঁধা ছবির বাণ্ডিল !

লক্ষ্মণভাই না পেলেও একঝাঁক তরতাজা তরুণ শ্যালিকাপুত্রের সাহায্যে সেবার সীতা-উদ্ধার সম্ভবপর হয়েছিল। ম্যানেজারের সুবুদ্ধিতে লঙ্কা-দাহনের প্রয়োজন হয়নি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গটুকু শুধু হয়েছিল। ইংরাজি বইটি (Immortal Ajanta) প্রকাশ করেছিলেন এই ভারতী বুক স্টলই।

* * *

সে রামও নেই, সে রাজ-রাজত্বের 'নকশালবাড়ীর অরাজকতা'ও নেই। এখন আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব কিছুই আইন মোতাবেক সুশৃঙ্খলভাবে হয়। তাই 'কলিঙ্গের দেব-দেউল' গ্রন্থে লেখকের উল্লিখিত চিত্রগুলি না থাকার অপ-রাধে লেখককেই ভর্ৎসনা শুনতে হয়। হবেই। লেখক হিসাবে নামটা যে আমারই ছাপা হয়েছে।

আজ্ঞে না, এজন্য অমিতাভ বা মনোরঞ্জনবাবু আদৌ দায়ী নন।

যেহেতু মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তাই তাঁর সঙ্গে আমার কোন লিখিত চুক্তি কোনকালেই হয়নি। 'শঙ্খ-প্রকাশন' এবং 'আনন্দধারা' থেকে সত্তরের দশকে আমার লেখা বইগুলি একের পর এক প্রকাশিত হয়েছে : আমি নেতাজীকে দেখেছি, নেতাজী রহস্য সন্ধানে, জাপান থেকে ফিরে, বিশ্বাসঘাতক, গজমুক্তা, অন্তর্লীনা, আবার যদি ইচ্ছা কর এবং কাঁটা-সিরিজের প্রথম দিক-কার অনেকগুলি গোয়েন্দা কাহিনী। লেখকের প্রাপ্য হিসাব-সহ বছর বছর মিটিয়ে দিয়েছেন শ্রীমজুমদার। তারপর ব্যক্তিগত কারণে তিনি তাঁর প্রকাশনার সত্ত্ব বিক্রয় করে দেন। আমার অবিক্রীত বইগুলি সমেত। শুধু আমার নয়, আমারই মতো হতভাগ্য আরও অনেকের। যিনি বা যাঁরা কিনলেন তাঁরা ঐ দিল্লীর প্রখ্যাত প্রকাশকের মতো হাঁকিয়ে বসলেন ব্যবসায়ে।

অসাধু প্রকাশক বই ছাপেন, বই বেচেন, গাড়ি-বাড়ি বানান, লেখকের প্রাপ্যটা মেটানোর কথা তাঁদের স্মরণে থাকে না। লেখক রেজিস্টার্ড চিঠি দিলেও জবাব দেন না। ওঁরা জানেন, লেখক সচরাচর আইন-আদালত এড়িয়ে চলতে চান। না চাইলেই বা কি? আদালতে অমন হাজার হাজার মামলা বছরের পর বছর ঝুলছে! যাক না বেটা আদালতে। লেখক তা যান না, কোর্ট-কাছারীতে সময় নষ্ট করার বদলে নতুন রচনায় নিবদ্ধদৃষ্টি হন। রাবণধর্মী প্রকাশকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। স্বর্ণলঙ্কার জৌলুষ বৃদ্ধি হয়। কোনও প্রকাশন সংস্থার মালিকানা হাতে এলে অবিক্রীত গ্রন্থগুলি হয় তাঁর সম্পত্তি। পাঁঠা যখন এক্তিয়ারভুক্ত তখন তা মাথার দিকেও কাটা চলে, লেজের দিকেও। ভিতরে কী ভূষিমাল আছে সেটা তো ক্রেতাপাঠক বুঝবেন বইটা কেনার পরে। তার আগেই তো লেখকের নাম দেখে তিনি গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বসে আছেন। লেখকের সঙ্গে ইতিমধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে ঐ সব বই পুনঃ-প্রকাশের সম্ভাবনা আদৌ নেই। ফলে অবিক্রীত বইকে 'অবিকৃত' রাখার কী প্রয়োজন? ছবি-টবি, ফর্মা-টর্মা বাদ যায় তো যাক, দামটা যেন ঠিক থাকে!

'কলিঙ্গের দেব-দেউল' বইতে শেষেদিকে গ্রন্থ-বর্ণিত ছবিগুলি না থাকার বিষয়ে এই আমার কৈফিয়ৎ।

'অপরূপা অজন্তা' পুনর্লিখনের পরে 'অজন্তা অপরূপা' হয়েছিল। এবার এটিকে পুনর্লিখন বলা ঠিক নয়। একই বিষয়বস্তুতে 'কলিঙ্গের দেব-দেউল' আর 'কারুতীর্থ কলিঙ্গ' দুটি বিভিন্ন গ্রন্থ। বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত গ্রন্থটি আর পুনঃপ্রকাশিত হবে না।

'নির্ঘণ্ট' লিখবার সময় একটি মারাত্মক ত্রুটি নজরে পড়ল ছাপা ফাইল-কপি দেখতে গিয়ে। পৃষ্ঠা —81-এর দ্বিতীয় স্তম্ভের অষ্টম পংক্তিতে। মুদ্রাকর প্রমাদ নয়, লেখকেরই ভ্রান্তি। 'দশাবতার স্তোত্রে'র সেই অনবদ্য 'শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্' চরণটি কেন যে আমার স্মরণে আসেনি বলতে পারব না—যে-কোন কারণেই হোক 'গঙ্গাস্তোত্রে'র সঙ্গে আমি তাকে গুলিয়ে ফেলেছি। বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতাররূপে যিনি কাব্যে স্বীকৃতি দেন তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি জয়দেব; নবম শতাব্দীর যুগাবতার দাক্ষিণাত্যের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নন।

এ-গ্রন্থের দুখানি রেখাচিত্র (5·36 এবং 5·37) প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগারের আঁকা। আমার সামনেই এঁকেছিলেন, আমরা যখন যৌথভাবে কলিঙ্গ-তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়েছিলাম। দুটি চিত্র (5·20 এবং 5·28) এঁকেছে শ্রীমান গৌতম দাশগুপ্ত। এঁদের সঙ্গে আমার যে আন্তরিক সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ জানানোর অবকাশ নেই। ঠিক তেমনিভাবে ভারতী বুক স্টল এবং অজন্তা প্রেসের শ্রীমান তপন বারিক, সুবীর সরকার, শীতল ঘোষ, অরুণ রায়, স্বপন দে, প্রভাত যশ প্রভৃতিকেও ফর্মাল ধন্যবাদ জানানোর অবকাশ নেই—যদিও তারা সকলেই এ বইটিকে সুন্দরতর করার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছে। এরা সকলেই আমার স্নেহের পাত্র।

নারায়ণ সান্যাল

31·12·86

॥ উৎসর্গ ॥

রাবণ চরিত্রের পরে বাল্মীকী, বশিষ্ঠ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের পরিকল্পনা যদি না করা হত, দুর্যোধন-দুঃশাসনকে অতিক্রম করে ভীষ্ম-বিদুর-শ্রীকৃষ্ণ যদি উপস্থিত না হতেন তাহলে কাব্য দুটি মহাকাব্য হত না।

কলেজ-স্ট্রীটও তাই!

রাবণ-দুর্যোধন-দুঃশাসনের পাশাপাশি কলেজ-স্ট্রীটে আছেন রাম-বিদুর-হৃষীকেশ!

তাঁরাও বই ছাপেন, বই বেচেন, হয়তো গাড়ি-বাড়িও করেন কিন্তু দপ্তরী থেকে লেখক কাউকেই বঞ্চিত করে নয়। হিসাবের কারচুপি না করেও তাঁদের প্রকাশন সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তা যদি না হত তাহলে কলেজ-স্ট্রীট এতদিন 'কলেজ-স্ট্রীট' থাকত না!

তেমনি এক সদ্যপ্রয়াত খুদতৃপ্ত মহামতি বিদুর-কেই বইটি উৎসর্গ করতে চাই।

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ একত্রিশ বছর আগে। আমার একটি চুয়ান্ন পৃষ্ঠার চটি বই ছাপানোর উপলক্ষ্যে। ঘটনাচক্রে সেটিই ('গ্রাম্যবাস্তু') সদ্যসাক্ষর-সাহিত্যে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম বছর প্রথম পুরস্কার পায়। তারপর তিনি আমার অনেক বই ছেপেছেন। শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্কটা গাঢ়তর হয়েছে। আমার লেখা তাঁর প্রিয় একটি গ্রন্থ থেকেই তাঁর ছাপাখানার নামটি সংকলন করেন, যে ছাপাখানা থেকে এ বই ছাপা হল। আমাকে নিয়ে গেছেন তাঁর দেশের বাড়িতে। সেখানে যে বিদ্যালয়, পাঠাগার, আখড়া বা ক্লাব বানিয়েছেন তা আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে একত্রে পুকুরে অবগাহন স্নান করেছি, আসন-পিঁড়ি হয়ে ক্ষেতের চালের ভাত, বাগানের সব্জি আর পুকুরের মাছে ভাগ বসিয়েছি! বৃদ্ধ বয়সে গ্রাম্যজীবনে বিনোদনের জোগান দিতে একটি চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ পর্যন্ত বানিয়েছেন। তার নাম দেন ঐ গ্রন্থটির অপরাংশ : অপরূপা।

বয়সে আমার চেয়ে বছর-কয়েকের বড়; কিন্তু তাঁর মনটা দশ বছরের পরে আর বাড়েনি। নিজের ভাগ্য নিজে গড়েছেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে নাকি কেটেছিল তাঁর কৈশোরকাল। কি জানি হয়তো কিছুটা অতিশয়োক্তি ছিল সেই অভিমান-ম্লান বাল্যস্মৃতিচারণে; তবে কিছুটা সত্য ছিলই। কারণ স্কুলে খুব ভাল রেজাল্ট করা সত্ত্বেও অর্থাভাবে তিনি নাকি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। তা হোক, শতকরা শতভাগ সৎপথে থেকেও যে প্রকাশনার জগতে সাফল্যলাভ করা সম্ভব তিনি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন কলেজ-স্ট্রীট পাড়ায়। ইহলোকে সেটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। সবচেয়ে অবাক করা খবর—বৈভব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। দীর্ঘদেহী মানুষটি আর্থিক সাফল্যের শীর্ষচূড়ায় উঠেও শেষজীবনে যে ধুতি পরতেন তাকে আমরা প্রাকৃত ভাষায় বলি 'খেটো ধুতি'। একত্রিশ বছরের ভিতরে একদিনও তাঁকে বিজাতীয় পোশাকে দেখিনি। বিনা 'মেক-আপ'-এই তিনি যে-কোন যাত্রার আসরে বিদুর-চরিত্রে অভিনয় করলে বেমানান হত না! পায়ে সাবেকী তালপাতার চটি, চুল উস্কো-খুস্কো, গ্রীষ্মে হাফশার্ট, শীতে বড়-জোর দোলাই। নাস্তা সারতেন মুড়ি-নারকোল-শশা দিয়ে! শহুরে মুখরোচক তাঁর মুখে রুচত না। কলেজ-স্ট্রীটের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে গেলেন নিতান্ত গাঁয়ের মানুষ হিসাবে।

একবার কুণ্ডু-ট্রাভেল্‌স্‌-এ ভারত ভ্রমণে গেছিলেন। ওঁর এক সহযাত্রী পরে আমাকে বলেছিলেন, এক মাসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনি উনি দশ-বিশ লাখ টাকার মালিক! আপনার কাছে এইমাত্র শুনলাম। আশ্চর্য মানুষ তো!

হ্যাঁ! আশ্চর্য মানুষই ছিলেন কলেজ-স্ট্রীট পাড়ার সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রকাশক :

হৃষীকেশ বারিক!

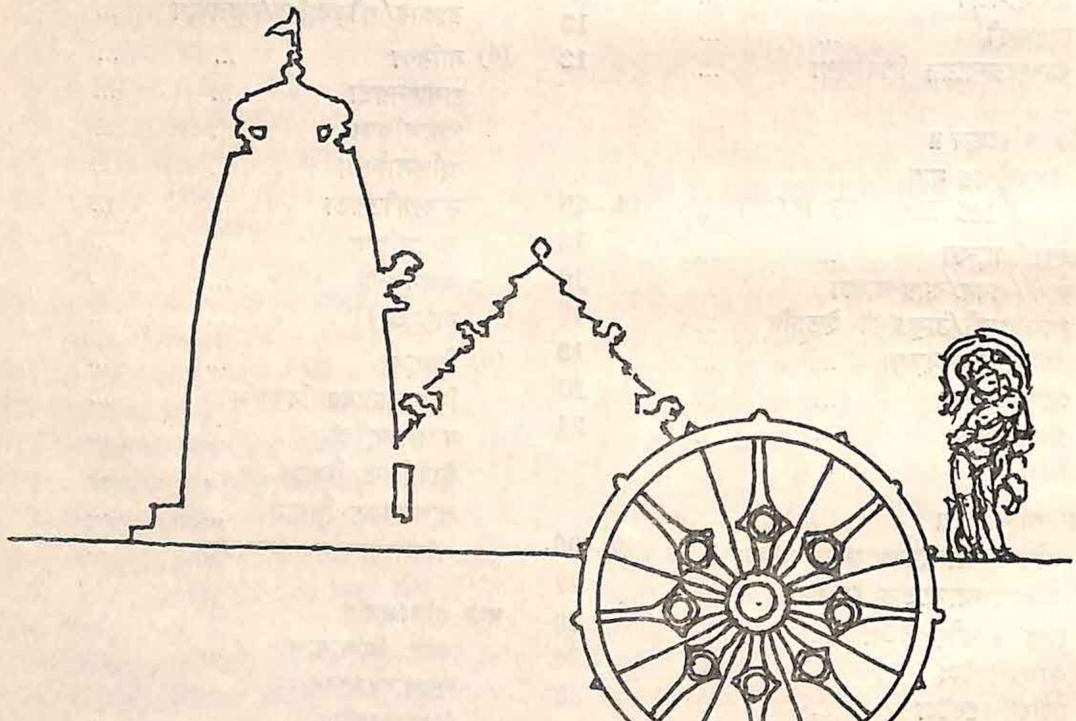
ক্ষেদ এইটুকু যে, পাণ্ডুলিপিখানি যাঁর হাতে দিয়ে এসেছিলাম ছাপা বইটি আজ আর তাঁর হাতে দিতে পারছি না!

নারায়ণ সান্যাল

'কারুতীর্থ কলিঙ্গ'-র অগ্রজ :

§—আমাদের প্রকাশনা।
†—গ্রন্থ নিঃশেষিত হবার পর পুনঃমুদ্রণ হয়নি, হবে না।
*—প্রথম প্রকাশকালে নাম ভিন্নতর ছিল ; যেমন—অরণ্যদণ্ডক = নৈমিষারণ্য ; মহাকালের মন্দির = রাওয়ালা ; অজন্তা-অপরূপা = অপরূপা-অজন্তা ; হে হংস-বলাকা = বিহঙ্গ-বাসনা।

বিষয়সূচী





চিত্রসূচী









কথারম্ভ

উড়িষ্যা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য। প্রতিবেশী। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের নাড়ির যোগ। রামেশ্বর-দ্বারকা-বৃন্দাবন অথবা বদ্রীনারায়ণের আকর্ষণও বড় কম নয়, কিন্তু হয়তো দূরত্বের জন্য তা আমাদের অত অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি ; কামাখ্যা বা গয়াতীর্থের ক্ষেত্রে দূরত্বটা অতবেশী অন্তরায় ছিল না, তবু পুরী ও কাশীধামের সঙ্গে বাঙালীর যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা অনন্য। পুরী-ধামের সঙ্গে এই নিবিড় আত্মীয়তাবোধের বিষয়ে বোধকরি সবচেয়ে বড় অবদান নদীয়ার ঐ প্রেমের ঠাকুরের। তাই ভ্রমণোন্মাদ মধ্যবিত্ত বাঙালীর হাতে কিছু জমলেই সে ছোটে পুরীর দিকে। অজন্তা, মাদুরা, মহাবলীপুরম পরিদর্শনের সাধ মেটায় পুরী-কোনার্ক-ভুবনেশ্বরের চক্রাবর্তনে। সেটাই এই ভ্রমণোন্মাদ মধ্যবিত্ত বাঙালীর নাগালের মধ্যে। কিন্তু কোন একটা দেশের প্রাচীন শিল্পকর্ম—তা সে স্থাপত্যই হোক, অথবা ভাস্কর্যই হোক, রসিয়ে রসিয়ে দেখতে হলে একজন ভালো গাইডের দরকার, নিদেন একখানা ভালো নির্দেশক-গ্রন্থের। উড়িষ্যার মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এক অমূল্য সম্পদ ; দেড় শ' বছর ধরে অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত তা নিয়ে ইংরাজীতে তথ্যবহুল আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। দুষ্প্রাপ্য, তাই সেগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে পড়বার সুযোগ নেই—কিন্তু দশটা-পাঁচটার শৃঙ্খলে আবদ্ধ আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ, অথবা রান্নাঘর থেকে বৈঠকখানায় আবদ্ধ আমাদের সঙ্গিনীরা সেসব গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগই কি ছাই নিতে পারি ? উড়িষ্যার উপর সহজলভ্য ভ্রমণকাহিনীও কিছু আছে—বাঙলাভাষাতেই—কিন্তু তাতে কাহিনীর খাদই যেন বেশি, যথার্থ নির্দেশনার অভাব। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ভুবনেশ্বরের স্বল্প-খ্যাত কয়েকটি প্রাচীন মন্দির খুঁজে বার করতে আমাকে হিম্ সিম্ খেতে হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন শিল্প-নিদর্শন অন্বেষণ করতে গিয়ে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে—স্থানীয় গাইড, পাণ্ডা অথবা রিক্‌শা-ওয়ালার দল আমাকে নির্দেশ দিতে পারেনি।

একটা কথা। সেটা সর্বপ্রথমেই সবিনয়ে স্বীকার করে নেওয়া যাক। সেটা অধিকারভেদের কথা। আমার শিক্ষা বা পেশা কোনটাই একাজের সহায়ক নয়। তবু এ-রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছি শুধুমাত্র এই কারণে যে, প্রকৃত অধিকারীরা এ জাতীয় গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হয়ে আসছেন না। ভারতবর্ষের অমূল্য স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উপরে ভারতীয় ভাষায় রচনা অতি সামান্য ; ইংরাজীতে ইতিপূর্বে যা রচিত হয়েছে তাও শুধুমাত্র পুরা-তত্ত্ববিদদের জন্য—আপনার-আমার জন্য নয়। ইদানিং যা লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তাও অধিকাংশ ডক্‌টরেট পাওয়ার উদ্দেশ্যে—সাধারণ রসপিপাসু পাঠকের জন্য নয়। এ রচনাটি আমি বিশেষজ্ঞ গবেষক-দের জন্য লিখিনি। আবার যাঁরা শুধুমাত্র পুণ্য-সঞ্চয়ের লোভে ও-পথের পথিক হতে চান, অথবা ঘূর্ণিঝড়ের মতো সব কয়টি বুড়ি-ছুঁয়ে কলকাতায় ফিরে এসে বলতে চান যে, তাঁরা কিছুই বাদ দেননি,—ঠিক তাঁদের জন্যও নয়। এ তিন শ্রেণী-বাদে আমার নজরে আর এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা ধরা পড়েছেন। তাঁরা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চান, বুঝতে চান, শিল্পরসের দিকে তাঁদের স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে, অথচ দরদী নির্দেশকের অভাবে তাঁরা ঠিকমতো রসাস্বাদন করে উঠ্‌তে পারেন না বলে ব্যথিত হন। সেই মধ্যশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভ্রমণ-পাগল রসপিপাসু বাঙালী পাঠকের উদ্দেশ্যেই এ রচনা। এবং তাঁদের জন্য, যাঁরা শারীরিক কারণেই হোক অথবা অর্থনৈতিক কারণেই হোক, স্বচক্ষে

এগুলি দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। বৈঠকখানার ছারপোকা-অধ্যুষিত আরাম-কেদারায় বসে বই হাতে দেশভ্রমণ করতে বাধ্য হন যাঁরা। এ রচনা তাঁদেরও জন্য।

শিল্পসম্ভারগুলি বিচার করতে বসে অনেক প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, যার সদুত্তর বই ঘেঁটে অথবা পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি পাইনি। প্রায় পনের বছর পূর্বে প্রকাশিত "কলিঙ্গের দেব-দেউল" গ্রন্থে প্রকৃত অধিকারীদের উদ্দেশ্যে সেগুলি প্রশ্ন-বোধক চিহ্নরূপেই রেখেছিলাম। তার কিছু কিছু এই দশ-পনের বছরের অভিজ্ঞতায় সমাধান করতে পেরেছি ; বিশেষ করে মিথুন-তত্ত্ব বিষয়ে। ঐ বিষয়ে একটি পৃথক ইংরাজী গ্রন্থ লিখেছি, প্রকাশ করেছেন "নাভানা"। ভ্রমণকালে শিল্পকর্মগুলির কিছু কিছু স্কেচ করে এনেছি, প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে কিছু আলোকচিত্রও সংগ্রহ করা গেছে। চিত্রকর হিসাবে আমার সীমিত ক্ষমতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আলোকচিত্রের পরিবর্তে হাতে-আঁকা ছবিকেই আমি বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। একটি বিশেষ কারণে। আমার মনে হয়েছে, এভাবে বক্তব্য বিষয়টি পাঠকের কাছে আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। যে ব্যঞ্জনাটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা আছে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে ; যে অংশ মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনে অবলুপ্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তার সম্ভাব্যরূপ কল্পনায় ভরিয়ে তোলা যাবে। তাছাড়া ক্যামেরার হাত আমার ভালো নয়।

কিন্তু সঙ্গীতচর্চার প্রথম পর্যায়ে যেমন সারগমের উপলবন্ধুর বাধা, কাব্যপাঠের সূচনায় ব্যাকরণ যেমন একটি অবাঞ্ছনীয় কিন্তু অনিবার্য প্রতিবন্ধ, তেমনি উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের ভিতর থেকে আনন্দরস আহরণ করতে হলে আমরা প্রথমেই শিল্প-ব্যাকরণের একটি নীরস উপলবন্ধুর বাধার সম্মুখীন হব। সে বাধা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। সমকালীন ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, ধর্মসচেতনতা, সমকালীন নরনারীর চিন্তাভাবনা, মানসিকতা এর কোনটাকেই উপেক্ষা করা চলবে না। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের মূলধারাটির সঙ্গে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের সম্পর্ক, বিভিন্ন শিল্পনির্দেশনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং ক্রমবিকাশের ধারা এগুলিও আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তারিত আলোচনা করতে ইচ্ছুক তাঁদের সুবিধা হবে মনে করে গ্রন্থশেষে কিছু নির্দেশনাও রেখে যাওয়া গেল।

উড়িষ্যার যাবতীয় দেব-দেউল ও স্থাপত্যনিদর্শন নিয়ে আমরা সামুহিক আলোচনা করতে বসিনি। সে কাজ গবেষকের। অল্পদিনের ছুটিতে যেটুকু দেখে আসা সম্ভব—ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের ত্রিকোণ ভূখণ্ডে বিধৃত কলিঙ্গের সেই মৌল স্থাপত্য ধারাটিই আমাদের লক্ষ্য ; যদিও প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শিল্প নিদর্শনের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়বে।

ভ্রমণকাহিনীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলকেই আমরা বেশি করে আঁকড়ে ধরি। যে পথ দিয়ে চলি, সেই পথরেখা ধরেই দেখতে থাকি ও দেখাতে থাকি। ফলে সাল-শতাব্দী অনেক সময় উল্টোপাল্টাভাবে এসে উপস্থিত হয়। তাতে ভুল ধারণা হওয়ার আশঙ্কা। তাজমহল ও ইতমদ্উদ্দৌলা দর্শনান্তে ফতেপুর-সিক্রিতে এসে দর্শক সেলিমচিস্তি দরগার জালি-কাজ দেখে মুগ্ধ হন না ; বলেন—এ আর এমন কি ? তাঁর খেয়াল হয় না—'ফতেপুর-সিক্রি'-র জালি-কাজকেই উন্নততর করেছেন জাহাঙ্গীর এবং শাহ্জাহাঁর জমানার প্রস্তরশিল্পী। গবেষকের পথ কিন্তু ভিন্ন ; তিনি ইতিহাস আশ্রয়ী। পর পর যেভাবে শিল্প নির্দশনগুলি সৃষ্ট হয়েছিল তিনি সেইভাবেই ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করেন। সে-ক্ষেত্রে ভ্রমণকারী পাঠককে সূচীপত্র অথবা নির্ঘণ্ট হাতড়ে দ্রষ্টব্য বিষয়টিকে খুঁজে নিতে হয়। সেটাও বিড়ম্বনার। আমরা এ-ক্ষেত্রে মধ্যপথ অবলম্বন করব। ঘটনাচক্রে উড়িষ্যার স্থাপত্যবিকাশ যে ক্রমপর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল সেইভাবেও ভ্রমণ করা সম্ভবপর। পর্যায়ক্রমে যদি আমরা ধৌলী, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, ভুবনেশ্বর, খিচিঙ, পুরী ও কোনার্ক পরিক্রমা করি তাহলে আমাদের ভ্রমণপথ ইতিহাস-ভূগোল কোনটাকেই অস্বীকার করবে না। □

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিঙ্গ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও যুগবিভাগ

কলিঙ্গের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় :

মহাভারতের আদিপর্বেই আমরা 'কলিঙ্গ' দেশের নাম পাচ্ছি। ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে দানবরাজ বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র এবং সুহ্ম নামে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। এ'রা বালেয় ক্ষত্রিয় বা বালেয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে এই পঞ্চভ্রাতার প্রচেষ্টায় পাঁচটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয় ; পাঁচটি রাজ্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মহাভারত মতে আদিমতম বঙ্গরাজ ও কলিঙ্গরাজ সহোদর ভ্রাতা। এ'রা উভয়েই আর্য এবং অনার্য-রক্তের যৌথ অধিকারী। ব্রহ্মপুরাণে[1]-ও এই কাহিনীর সমর্থন পাই ; এমনকি ঋগ্বেদেও[2] আমরা উতথ্য-মুনির পুত্র, বৃহস্পতির পৌত্র দীর্ঘতমা ঋষির নাম পাচ্ছি ; যদিও সেখানে আদিম কলিঙ্গরাজের জনক হিসাবে তাঁর পরিচয়টা পাই না। এ ছাড়াও মহাভারতে একাধিকবার কলিঙ্গরাজের উল্লেখ আছে। দুর্যোধন কলিঙ্গরাজ চিত্রঙ্গদের কন্যাকে বিবাহ করেন[3]। বনবাসকালে যুধিষ্ঠির যখন গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির আশ্রম থেকে সমুদ্রতীর ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে অগ্রসর হতে থাকেন তখন লোমশমুনি তাঁকে বলেছিলেন, 'বৈতরণী নদীতীরে আছে কলিঙ্গ রাজ্য, সেখানে দেবগণের আশীর্বাদভিক্ষু স্বয়ং ধর্মরাজ যজ্ঞরত।'[4]

তিনটি দেশবাচক শব্দের সঙ্গে আমাদের বারে বারে সাক্ষাৎ হবে : কলিঙ্গ ; ওড়িষা (বা উড়িষ্যা) এবং উৎকল। তাদের সীমারেখাটা ঠিক কোথায় বলা কঠিন। যেটুকু অনুমান-নির্ভর তা বলছি ; কিন্তু তার আগে বলে নেওয়া ভালো যে, আমরা এ-গ্রন্থে কলিঙ্গ বলতে বর্তমান 'ওড়িষা' রাজ্যকেই বোঝাতে চাইছি—যার উত্তরে বিহার, উত্তর-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ। আয়তন প্রায় 1.56 লক্ষ বর্গ কি. মি.। রাজধানী ভুবনেশ্বর।

'ওড়িষা' নামটি সম্ভবত এসেছে 'ওড্র' জাতির দেশ হিসাবে। ওড্র জাতির বাস ছিল—'ময়ূরভঞ্জ-সিংভূম-মানভূম' অঞ্চলে। প্রাচীনকালে কশাই (কংসাবতী, কপিশা) আর বৈতরণী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করত তাদের বলা হত 'উৎকলী'। বর্তমানে তা বালেশ্বর এবং মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ। এই উৎকল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে—বৈতরণী নদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ছিল 'কলিঙ্গ' রাজ্য।

পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদ আঃ খ্রীঃ পূঃ 1500 সালের এবং মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয় খ্রীঃ পূঃ 900 অব্দের কাছাকাছি। কলিঙ্গ নামের প্রথম ইতিহাস-স্বীকৃত নজির হিসাবে আমরা খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মগধরাজ এবং নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের কলিঙ্গ বিজয়ের উল্লেখ করতে পারি। বোধকরি কলিঙ্গরাজ্য 'জয়' অর্থ 'লুণ্ঠন' ;

কারণ কলিঙ্গরাজ মহাপদ্মের সৈন্যদলের কাছে মাথা নত করলেও দেখছি কলিঙ্গরাজ্য মগধের করদ রাজ্য হয়ে পড়েনি। এ অনুমানের সপক্ষে যুক্তি : মৌর্য সম্রাট অশোকের (273-232 খ্রীঃ পূঃ) কলিঙ্গ অভিযান।

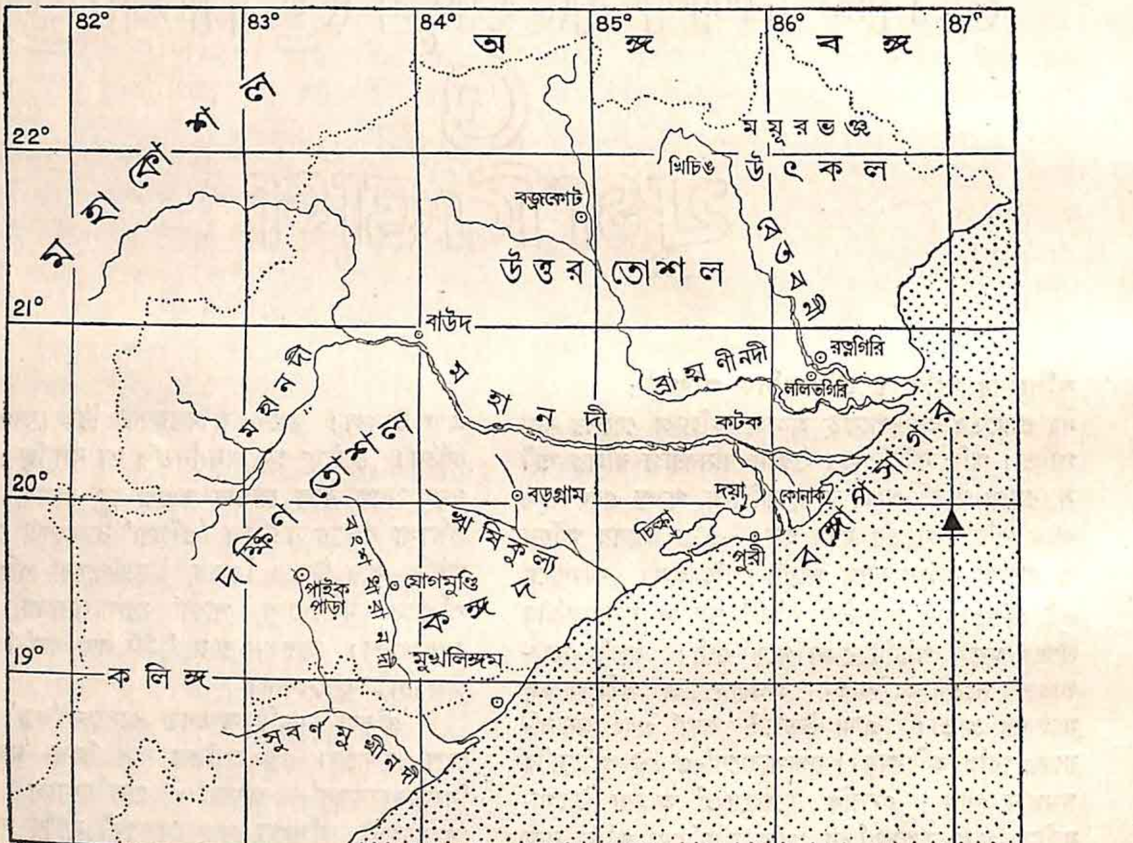
কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতায় সম্রাট অশোকের হৃদয়ে একটি পরিবর্তনের সূচনা করে। চণ্ডাশোক রূপান্তরিত হন ধর্মাশোকে। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ সদ্ধর্মের প্রচারই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জীবনের ব্রত। কলিঙ্গ রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী 'তোসলি'-র অনতিদূরে সম্রাট অশোক একটি শিলালিপি উৎকীর্ণ করান—সেটিই ভারত-বর্ষের আদিমতম ঐতিহাসিক শিলালিপি।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ্যে 'মহামেঘবাহন' রাজবংশের এক মহাপরাক্রান্ত নৃপতি খারবেল ইতিহাস-স্বীকৃত প্রথম কলিঙ্গরাজ। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, সংগীতজ্ঞ এবং জৈন-ধর্মাবলম্বী। এঁর একটি শিলালিপি ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এক অমূল্য দিক্‌চিহ্নরূপে স্বীকৃত। খারবেল মগধ জয় করে মহাপদ্ম নন্দের ঋণ পরিশোধ করতে মগধ লুণ্ঠন করেন।

খারবেল-এর পর থেকে গুপ্তযুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রত্যন্তের মতো কলিঙ্গ-রাজ্যের ইতিহাসও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে কলিঙ্গরাজ্য গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং অন্তত 570 খ্রীঃ পর্যন্ত কলিঙ্গ ছিল গুপ্তরাজদের করদ রাজ্য। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে গুপ্তরাজেরা হীনবল হবার পর তদা-নীন্তন কলিঙ্গের একাধিক ভূস্বামী নিজ-নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিভিন্ন রাজ্য স্থাপন করেন।

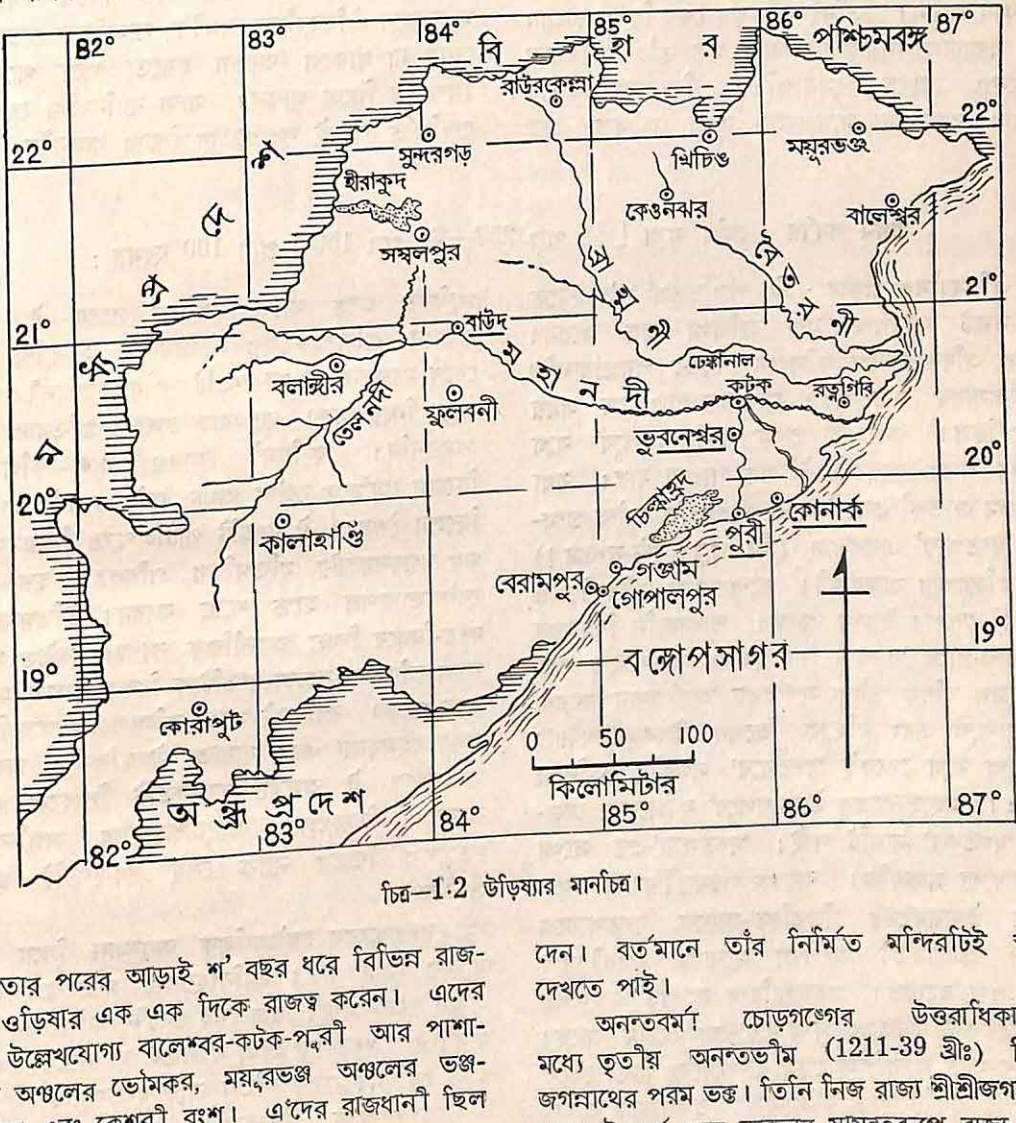
সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে গৌড়রাজ শশাঙ্কর কলিঙ্গ-বিজয় আর একটি ঐতিহাসিক দিক্‌চিহ্ন। কারণ শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। ওড়িষার দত্তবংশীয়েরা



চিত্র—1.1 প্রাচীন কলিঙ্গের সম্ভাব্য মানচিত্র।

এবং শৈলোদ্ভব নৃপতিগণ আদিতে ছিলেন শশাঙ্কের সামন্তরাজ। শশাঙ্কের অনুসরণে এই সামন্তরাজগণের মাধ্যমে ভুবনেশ্বরে এল শিবমন্দির গড়ার রেওয়াজ।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি শৈলোদ্ভববংশীয় নৃপতি মাধব বর্মণ নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। তাঁর আমল থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শৈলোদ্ভববংশীয়েরা সম্ভবত ভুবনেশ্বরকে রাজধানী করে কলিঙ্গ শাসন করেন।



চিত্র—1.2 উড়িষ্যার মানচিত্র।

তার পরের আড়াই শ' বছর ধরে বিভিন্ন রাজবংশ ওড়িষার এক এক দিকে রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালেশ্বর-কটক-পুরী আর পাশাপাশি অঞ্চলের ভৌমকর, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের ভঞ্জবংশীয়া এবং কেশরী বংশ। এঁদের রাজধানী ছিল যাজপুর অথবা ভুবনেশ্বর।

একাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি আসেন গঙ্গ বংশীয়েরা। তাঁদের রাজধানী কখনো কটক, কখনো চৌদার। দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদে এই বংশের নরপতি অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ সোমবংশীয়দের বিতারণ করে কটক-পুরী অঞ্চল অধিকার করেন। এঁর আমলে বহু মন্দির সংস্কার ও নির্মাণে হাত দেওয়া হয়। চোড়গঙ্গের সাম্রাজ্য ভাগীরথী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গ বংশীয়েরা তাঁদের পূর্বসূরীদের মতো শৈব উপাসক ছিলেন ; কিন্তু অনন্তবর্মা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং পুরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করে দেন। বর্তমানে তাঁর নির্মিত মন্দিরটিই আমরা দেখতে পাই।

অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তৃতীয় অনন্তভীম (1211-39 খ্রীঃ) ছিলেন জগন্নাথের পরম ভক্ত। তিনি নিজ রাজ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথের নামে উৎসর্গ করে দেবতার সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। রথযাত্রার দিন সুবর্ণ-সম্মার্জনী

হস্তে রাজার যে ভূমিকাটি দেখি, সেটি তিনিই প্রচলন করেন।

1435 খ্রীষ্টাব্দে গজপতি বংশীয় কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর ওড়িষার সিংহাসন অধিকার করেন। কপিলেশ্বরের পৌত্র প্রতাপরুদ্রের আমলে, বস্তুত 1516 খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আগমন করেন। জীবনের শেষ সতের বছর শ্রীচৈতন্য পুরীধামেই অবস্থান করেন।

গজপতি বংশের পতনের পর অন্ধ্র দেশের মুকুন্দ হরিচরণ (রাজত্বকাল 1559-68 খ্রীঃ) ওড়িষা অধিকার করেন। তিনিই ওড়িষার শেষ হিন্দু রাজা। শেষ বঙ্গরাজ সিরাজউদ্দৌলার মত তাঁর পরাজয়ের পিছনেও আছে সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা। বাংলার আফগান মুসলমান রাজা কলিঙ্গ জয় করেন। তাঁর সেনাপতি ছিলেন : কালাপাহাড়। আকবর (1556-1605 খ্রীঃ) পরে ওড়িষাকে মুগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

যুগবিভাগ :

কলিঙ্গ-স্থাপত্যের সার্ধসহস্রবর্ষব্যাপী শিল্প-স্ফুরণকে আমরা মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করতে পারি। এই সুবৃহৎ পঞ্চাঙ্ক নাটকটি মঞ্চস্থ করার পূর্বে নান্দীকারের একটি সংক্ষিপ্ত চুম্বকভাষণ আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারে। স্থাপত্যের মূল্যায়নে ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক প্রভাবগুলি জানা না থাকলে আমরা হয়তো পদে পদে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকব। স্যার ব্যানিস্টার ফ্লেচারের[5] প্রদর্শিত পথেই স্থাপত্যের বিচার বাঞ্ছনীয়।

প্রথম পর্যায় : মৌর্য যুগ [খ্রীঃ পূঃ 257—খ্রীঃ পূঃ 150] প্রায় 100 বৎসর :

(ক) **ঐতিহাসিক প্রভাব** : খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মগধ-সম্রাট মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। নন্দের অধিকারকালে কলিঙ্গে কিছু পয়ঃপ্রণালীর সংস্কারসাধন করা হয়। সেচ-ব্যবস্থাও সে সময় উন্নত ছিল। আলোচ্য প্রথম পর্যায়ের পূর্ব যুগ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা 'কুরুধম্ম জাতক' এবং 'মহাভাষ্য' প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ-মতে 'দন্তপুর' এককালে (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ-সপ্তম ?) ছিল কলিঙ্গের রাজধানী। বুদ্ধদেবের জীবনীতেও 'উৎকল' দেশের উল্লেখ আছে। শাক্যমুনি বিহারের উরুবিল্ব-গ্রামে 'বুদ্ধত্ব' লাভ করার অব্যবহিত পরে যে দুজন বণিক তাঁকে সর্বপ্রথম অর্ঘ্যপ্রদান করেন, সেই ত্রাপুশ্য এবং বহ্লিক ছিলেন 'উৎকলদেশীয়'। প্রাকবুদ্ধ যুগ থেকেই 'দন্তপুর' নগরীর অস্তিত্ব স্বীকৃত। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে কলিঙ্গের রাজধানী 'দণ্ডকুর' নামটি পাই। 'দন্তপুর'-এর সঙ্গে ধ্বনিসাদৃশ্য লক্ষণীয়। অনেক পরবর্তীকালে গঙ্গ-বংশীয় ইন্দ্রবর্মনের 'জিরঙ্গি'-ফলকে দন্তপুরকে স্বর্গের অমরাবতী অপেক্ষা মনোরম নগরীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাগোবিন্দ সুত্তন্ত মহাবস্তু এবং কয়েকটি জাতকে 'দন্তপুর'-এর উল্লেখ আছে। দাঠাবংশ মতে বুদ্ধশিষ্য ক্ষেম বুদ্ধদেবের চিতা থেকে সংগৃহীত একটি দন্ত কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত সেই দাঁতটির উপর একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। সুদীর্ঘকাল ঐ স্তূপে বুদ্ধদেবের শব-দন্তটি পূজিত হতে থাকে। কথিত আছে—ঐ দন্তের প্রভাবে কলিঙ্গরাজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হতে দেখে মগধরাজ ঐ শব-দন্তটি স্বীয় রাজধানী পাটলিপুত্রে নিয়ে যান। করদরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রতিবাদ করতে পারেননি। কাহিনী আরও বলে—কলিঙ্গরাজ ছিলেন ধর্মমতে বৌদ্ধ অথচ তাঁর সম্রাট মগধরাজ ছিলেন শৈব। ঐ দন্তটি পাটলিপুত্রে নিয়ে আসার পর মগধসম্রাটের মতিগতির পরিবর্তন হয়—তিনি বৌদ্ধভাবাপন্ন হতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ঐ দন্ত-বিষয়ে কিছু অলৌকিক কাণ্ডও ঘটতে থাকে। ফলে তাঁর সভাসদেরা দন্তটিকে বিদায় করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। কাহিনী মতে, কলিঙ্গরাজ গুহাশিবের কন্যা হেমবালা এবং জামাতা, উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার ঐ অমূল্য শব-দন্তটি সিংহলে পাচার করেন। সিংহলের অনুরাধাপুরের জগদ্বিখ্যাত স্তূপের ভিতর নাকি সেই শব-দন্তটি আজও সংরক্ষিত।

দন্তপুরের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কানিংহ্যামের মতে গোদাবরী-তীরে রাজমহেন্দ্রী ছিল সেই প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী এবং দন্তপুর হচ্ছে নীলাচল বা পুরী। কারও মতে মেদিনীপুরের দাঁতন সেই দন্তপুর।

অপরপক্ষে সিংহলীয় পুরাবৃত মহাবংশে কলিঙ্গের রাজধানীরূপে বর্ণিত হয়েছে : সিংহপুর। বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহুর নামানুসারে

নাকি সেই নগরীর নাম। ক্যানিংহ্যামের মতে গঞ্জাম-জেলার পশ্চিমে বর্তমান সিংহপুর সেই নগরী। মেগাস্থেনিস এবং প্লিনির মতে কলিঙ্গের রাজধানী ছিল—'পার্থলিস্' বা 'পার্টেলিস্'। বর্ণনা অনুসারে মহানদী তীরবর্তী কটকের কাছাকাছি তার অবস্থান। আবার টলেমী উল্লেখ করেছেন : 'পলোর নগরী'। সেটি কোথায় তা জানা যায় না।

ইতিহাস ছেড়ে যদি হিন্দুপুরাণের দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখতে পাই আলোচ্য ভৌগোলিক অঞ্চলে চারটি ক্ষেত্র বিদ্যমান। যাজপুরে পার্বতী বা বিরজা-ক্ষেত্র ; ভুবনেশ্বরে একাম্র বা শাম্ভব-ক্ষেত্র ; কোণার্কে অর্কক্ষেত্র বা পদ্মক্ষেত্র এবং পুরীধামে পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্র।

সে যাই হোক, প্রাক-মৌর্যযুগের ইতিহাস বা তথ্য বস্তুত আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগছে না ; যেহেতু সে আমলের কোনও ভাস্কর্য-স্থাপত্য নিদর্শন আমরা আজও উদ্ধার করতে পারিনি।

প্রথম পর্যায়ের প্রাচীনতম যে শিল্পনিদর্শনটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা মগধ-সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় সংক্রান্ত। ধৌলী ও ঝাউগাছা শিলালেখ। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সম্রাট অশোক কলিঙ্গের সেই ক্রান্তিকারী যুদ্ধে—যার ফলে চণ্ডাশোক রূপান্তরিত হয়েছিলেন ধর্মাশোকে—অবতীর্ণ হয়েছিলেন 261 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে[6]।

(খ) **ধর্মীয় প্রভাব** : কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতায় চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত। অশোকের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বন—বৌদ্ধধর্ম প্রচার—ফলে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন ধর্মের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার।

(গ) **সামাজিক প্রভাব** : যুদ্ধের ক্ষতি—পরাধীনতার গ্লানি—মৌর্য প্রভাবে উত্তরাপথের সঙ্গে যোগসাধন—ঐ পথরেখা ধরে পারসীক, গ্রীক ও ব্যাক্ট্রিয়ার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়।

(ঘ) **স্থাপত্য নিদর্শন** : ধৌলী ও ঝাউগাদা শিলালেখ—সিংহস্তম্ভ শীর্ষ (ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা)—ভাস্করেশ্বরের শিবলিঙ্গ (?)।

দ্বিতীয় পর্যায় : গুহামন্দির যুগ [আঃ খ্রীঃ পূঃ 146—খ্রীঃ পূঃ 75] প্রায় 70 বৎসর :

(ক) **ঐতিহাসিক প্রভাব** : খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে কলিঙ্গে চেদী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজবংশের তৃতীয় নৃপতি খারবেল একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি। নন্দ এবং মৌর্যরাজগণের কলিঙ্গ অধিকারের প্রতিশোধস্বরূপ তিনি মগধ আক্রমণ করেন এবং মগধরাজ বহসতিমিতকে পরাজিত করেন। খারবেলের সময় 'কলিঙ্গনগর' ছিল রাজ্যের রাজধানী। সেটি সম্ভবত বর্তমানে গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত মুখলিঙ্গম জনপদ। খারবেল মগধরাজ পুষ্যমিত্র এবং অন্ধ্রের শ্রীসতকর্ণীর প্রায় সমসাময়িক।

চেদীরাজ্য তখন মহামেঘবাহন বংশের অধিকারে।

(খ) **ধর্মীয় প্রভাব** : রাজানুগ্রহে জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান।

(গ) **সামাজিক প্রভাব** : খারবেলের সুশাসনে দেশে সর্বাঙ্গীন উন্নতি। নানান জনহিতকর কার্য। মৌর্য-শাসনমুক্ত হওয়ায় কলিঙ্গরাজ্যে মুক্তির স্বাদ।

(ঘ) **স্থাপত্য নিদর্শন** : উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির অসংখ্য গুহামন্দির এই যুগের স্থাপত্য সম্পদ।

তৃতীয় পর্যায় : আদি হিন্দু যুগ [575 খ্রীঃ—800 খ্রীঃ] প্রায় 225 বৎসর :

(ক) **ঐতিহাসিক প্রভাব** : অন্ধ্রের শ্রীসতকর্ণীর পুত্র গৌতমীপুত্র সতকর্ণী কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময় কলিঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুমান করা হয়, গঞ্জাম পর্যন্ত গুপ্তদের আধিপত্য ছিল। এই সময় মধ্য ও দক্ষিণ কলিঙ্গে মাঠর ও বাশিষ্ঠ রাজবংশের নামের উল্লেখ পাই। পঞ্চম শতকের একটি সনদে চন্দ্রবর্মণ নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। অপর একটি লেখতে মাঠর-বংশীয় বাশিষ্ঠীপুত্র শক্তিবর্মনের নাম পাওয়া যায়। উভয়েই কলিঙ্গাধিপতি নামে উল্লেখিত। সপ্তম শতকের প্রথমভাগে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত অধিকার করেন। কটক-বালেশ্বর অঞ্চলের দত্তবংশীয়রা এবং গঞ্জাম জেলার শৈলোদ্ভবেরা ছিল গৌড় রাজার সামন্ত। 634 খ্রীঃ আইহোল লেখ থেকে জানা যায়, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কলিঙ্গরাজকে

পরাজিত করে বর্তমান গোদাবরী জেলার অন্তর্গত পিষ্টপুর (বর্তমান নাম পিঠপুরম্) অধিকার করেন। থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধনকে একটি নেপালী লেখতে গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতি রূপে বারে বারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পরে ভৌমকরদের অভ্যুত্থান।

(খ) **ধর্মীয় প্রভাব** : শৈব-শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয় থেকে শৈব উপাসকদের প্রাধান্য। গৌড়রাজ শশাঙ্ক সম্ভবত ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বর (লিঙ্গরাজ) মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ভৌমকরেরাও শৈব উপাসক। বৌদ্ধ ও জৈনরা একান্তবাসী। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন ৎসাঙ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'কা-লঙ-কা' বা কলিঙ্গে আসেন। তাঁর মতে এর বিস্তার ছিল 5,000 যোজন, এখানে দশটি মহাযানী সঙ্ঘারামের কথা তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখিত হয়েছে।

শক্তি পূজার সূচনা এ-যুগের এক বৈশিষ্ট্য।

(গ) **সামাজিক প্রভাব** : বিভিন্ন রাজবংশের কলিঙ্গ বিজয়ের প্রচেষ্টায় কলিঙ্গদেশ বহিঃসভ্যতার ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসে। চালুক্য, গুপ্ত, গৌড় রাজ্যের প্রভাব অনঃস্বীকার্য। কালিদাস 'রঘুবংশ'-গ্রন্থে কলিঙ্গের রাজধানীকে সমুদ্রোপকূলবর্তী নগর এবং কলিঙ্গরাজকে মহেন্দ্রাধিপতিরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কলিঙ্গ বঙ্গদেশের দক্ষিণে কপিশা নদী (কাঁসাই) থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং দণ্ডকারণ্য ছিল এ রাজ্যের সীমা। নদী ও সমুদ্রপথে পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ, ও বাণিজ্য অব্যাহত ছিল—তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, দক্ষিণ কোশল ও অন্ধ্রদেশ। দক্ষিণ ও উত্তর থেকে উপর্যুপরি আক্রমণে দেশে অশান্তি ছিল বটে, কিন্তু শান্তির সময়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্বৃদ্ধির সুযোগও আসে।

(ঘ) **স্থাপত্য নিদর্শন** : শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, বর্তমানে অবলুপ্ত রামেশ্বর প্রভৃতি শিবমন্দির। নাগর শিল্পে 'রেখ দেউল'-এর উদ্ভব। পরে শিশিরেশ্বর। পরশুরামেশ্বর মন্দিরে রেখ-দেউলের সম্মুখে সর্বপ্রথম মণ্ডপের প্রয়োজন স্বীকৃত—অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হচ্ছে। ঐ 'মণ্ডপে' আহিওল স্থাপত্যের প্রভাব। শেষ পর্যায়ে বেতাল মন্দিরে প্রথম 'কাখর দেউল'-এর আবির্ভাব।

চতুর্থ পর্যায় : মধ্যহিন্দু যুগ [800 খ্রীঃ—1100 খ্রীঃ] প্রায় 300 বৎসর :

(ক) **ঐতিহাসিক প্রভাব** : সোমবংশী রাজন্যবর্গ কর্তৃক ভৌমকরদের বিতাড়ন—কেশরী বংশের প্রতিষ্ঠা। ভৌমকরদের রাজত্বকাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদ থেকে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত।[7] ভৌমকরদের শাসনকালের শেষদিকে নানান অশান্তির সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, শেষ চারজন শাসকই রমণী![8] সোমবংশীরা আসেন দক্ষিণ-কোশল থেকে। ব্রহ্মেশ্বর শিলালিপিতে জানা যায়, দক্ষিণ কোশল অধিপতি সোমবংশী জন্মেজয় কেশরী ওড্র (উড়িষ্যা) জয় করেন এবং স্বহস্তে একটি 'কুন্তা'-র[9] সাহায্যে ওড্ররাজকে নিহত করে এদেশের নৃপতিরূপে অধিষ্ঠিত হন। এই বংশের প্রথম ছয়জন নৃপতি যথা-ক্রমে প্রথম যযাতি, ভীমরথ, ধর্মরথ, নহুষ, দ্বিতীয় যযাতি এবং উদ্যোতকেশরী। এরপর কেশরী বংশের প্রভাব ক্রমশঃ কমতে থাকে। ক্রমে তা 'শেষ হিন্দুযুগে' গঙ্গ বংশীদের অধিকারে চলে যায়। সোমবংশীদের সময়কাল 950 খ্রীঃ থেকে 1065 খ্রীঃ পর্যন্ত।[10]

(খ) **ধর্মীয় প্রভাব** : ব্যাপক শিব ও শক্তির উপাসনা। তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান ব্যাপক হয়ে উঠ্ছে। বৌদ্ধরা কয়েকটি সঙ্ঘারামে সীমাবদ্ধ। জৈনরা প্রায় নিশ্চিহ্ন। তাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের চিহ্ন নাই।

(গ) **সামাজিক প্রভাব** : পূর্বযুগের ধর্মবৈরিতা হ্রাস পেয়েছে। বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করেরা হিন্দুমন্দিরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর পুরীধামে অদ্বৈত-বেদান্ত চর্চার জন্য মঠ প্রতিষ্ঠা করায় সামাজিক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত। কেশরী রাজন্যবর্গের ব্যবস্থা-পনায় বিভিন্ন সামন্তরাজা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। রাষ্ট্র-বিপ্লব সীমিত। শিল্পে স্ফুরণ।

(ঘ) **স্থাপত্য নিদর্শন** : মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, কেদারে-শ্বর, সিদ্ধেশ্বর, মেঘেশ্বর প্রভৃতি শৈবমন্দির। মোহিনী ও গৌরী প্রভৃতি শাক্তমন্দির। প্রথমোক্তরা দ্বৈত-দেউল—সম্মুখে পীড়-মণ্ডিত জগমোহন, পশ্চাতে রেখ-মণ্ডিত বিমান ; দ্বিতীয়োক্তরা কাখর দেউল। এই পর্যায়েই রাজারানী মন্দির নির্মিত। সেটি কোন দেবতা বা দেবীর তা জানা যায় না। তার স্থাপত্যও কলিঙ্গ-স্থাপত্যে নূতন ধরনের।

পঞ্চম পর্যায় : শেষ হিন্দু যুগ [1100 খ্রীঃ—1300 খ্রীঃ] প্রায় 200 বৎসর :

(ক) **ঐতিহাসিক প্রভাব** : কেশরীবংশের শেষ অপুত্রক রাজার দেহান্তে চোড়গঙ্গ কর্তৃক গঙ্গ-বংশের প্রতিষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হিসাবে সময়টা 1118 খ্রীঃ[11]। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষকদের মতে সময়টা 1114 খ্রীঃ[12]। চোড়গঙ্গ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ; দীর্ঘ 72 বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজ্যের দক্ষিণসীমা গোদাবরী এবং উত্তরসীমা হুগলী বা ভাগীরথী নদী। অর্থাৎ মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার তদানীন্তন ভূম্যধিকারীরা ছিলেন কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গর করদ রাজা। আমাদের আলোচ্য সময়কাল, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই গঙ্গ বংশই নিরবচ্ছিন্নভাবে কলিঙ্গাধিপতিরূপে রাজ্যশাসন করেন।

(খ) **ধর্মীয় প্রভাব** : শৈব ও শক্তিপূজার সমান্তরালে বিষ্ণুপূজার প্রবর্তন—বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান, যা আমাদের আলোচ্য সময়কাল অতিক্রান্ত হবার পরেই প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হতে চলেছে শ্রীচৈতন্যদেবের নীলাচল মহালীলার প্রভাবে।

(গ) **সামাজিক প্রভাব** : গঙ্গ-বংশের সুশাসনে বাণিজ্যের প্রসার ; আর্থিক সচ্ছলতা, ধর্মে সহিষ্ণুতা এবং শিল্পের স্ফুরণ এ-যুগের বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) **স্থাপত্য নিদর্শন** : ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বর অর্থাৎ লিঙ্গরাজ মন্দির পুনর্নির্মাণ। অনতিদূরে ঐ নগরে প্রথম বিষ্ণুমন্দির, বৃহদায়তন অনন্ত-বাসুদেব দেউল। উভয় মন্দিরই কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় চার-দেউল পদ্ধতিতে নির্মিত : ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন ও বিমান। প্রথম তিনটি পীড়-দেউল এবং গর্ভগৃহের উপর বিমানটি রেখ-দেউল। অতঃপর পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং কোনার্কে সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনায় রথপ্রতিম সূর্যমন্দির। যদিও সেখানেও ঐ চার-দেউল পরিকল্পনা স্বীকৃত।

এই সার্ধসহস্র বর্ষব্যাপী শিল্প-সাধনা যে ত্রিকোণ ভূখণ্ডে বিধৃত, সেই ভুবনেশ্বর-পুরী-কোনার্কের স্থাপত্যচিন্তার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যা ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্যচিন্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনন্য। কলিঙ্গ-স্থাপত্য নাগর-স্থাপত্যের অন্তর্গত। নাগর-স্থাপত্যের আদিগুরু হিসাবে বিশ্বকর্মা স্বীকৃত। তাঁর রচিত 'বাস্তুশাস্ত্রম্' গ্রন্থ এই স্থাপত্যের বাইবেল। কারও মতে তিনি ঋষি, ইদানিংকালে তো তিনি দেবতা। বাস্তবে বোধহয় বিশ্বকর্মা ছিলেন প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এক-জন বিশ্রুতকীর্তি স্থপতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যরীতি—'নাগররীতি' বা ইংরাজীতে 'ইন্দো-এরিয়ান স্টাইল' উত্তর ও পূর্বভারতে বিস্তৃত। অপরপক্ষে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য দানব-স্থপতি ময়-দানবের অনুসারী। এই দুই মহান স্থাপত্যরীতির মিলনে তৃতীয় একটি স্থাপত্যরীতি অন্ধ্র ও মধ্যভারতে প্রতিষ্ঠা পায়, যাকে বলি 'বেশর স্থাপত্য'। তা সে যাই হোক, নাগর-স্থাপত্য ক্রমে তিনটি মূলধারায় বিভক্ত হয়। কলিঙ্গ-রীতি, খাজুরাহো-রীতি এবং গুজরাট ও রাজপুতানার রীতি। সমগ্র ভারতবর্ষে সপ্তম শতাব্দী থেকে মন্দির নির্মাণের একটা জোয়ার এসেছিল। তার পূর্বেও হয়তো মন্দির নির্মিত হয়েছে ; কিন্তু হয়তো তা ছিল পোড়ামাটির—যার চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পাথরের কাজেও শিল্পীদের দক্ষতা পূর্বযুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন স্থপতি ঋণাত্মক-স্থাপত্যে অর্থাৎ পাহাড় কেটে গুহামন্দির বানিয়েছেন বহু পূর্ব যুগ থেকে। কিন্তু পাথর গেঁথে মন্দির তৈরী করার রীতি চালুক্য ও গুপ্তযুগ থেকেই বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। উড়িষ্যার শিল্পীদল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির কাণ্ডকারখানা সকৌতূহলে লক্ষ্য করেছেন, দেখেছেন, বুঝেছেন, ভেবেছেন কিন্তু তাঁদের মাপজোখ রীতিনীতির হুবহু নকল করেননি। দেশীয় শিল্পগুরুর দল ভেবেচিন্তে স্বরাজ্যে অনুষ্ঠিতব্য নির্মাণশৈলীর পৃথক নির্দেশ দিয়ে গেছেন —যা থেকে জন্ম নিয়েছে এই আঞ্চলিক শৈলী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ওড়িয়া স্থপতি ও ভাস্কর অতি নিষ্ঠাভরে তা মেনে চলেছেন। প্রয়োজনে পরিবর্তন যেটুকু করতে বাধ্য হয়েছেন তাতেও স্বকীয় চিন্তার ছাপ, কারও নিছক অনুকরণ নয়। মন্দির-নগর আরও তো কত আছে এই মহান উপদ্বীপে—আহিওল, মহাবলীপুরম, বাদামী, বেলুর, খাজুরাহোতেও আছে সারি সারি মন্দির ; কিন্তু সেগুলি দু-এক শতাব্দীর সাময়িক শিল্পস্ফুরণ মাত্র, দীর্ঘকালের ধারাবাহিকতা সেখানে নেই। অপরপক্ষে ধারাবাহিকতার কোনও অভাব নেই অন্যান্য নগরীতে —পাটলীপুত্র, বারানসী, উজ্জয়িনী কিম্বা দিল্লী-ইন্দ্রপ্রস্থে ; কিন্তু স্থাপত্য-ভাস্কর্যে বহিঃপ্রভাবমুক্ত আঞ্চলিক 'স্টাইল' বলে সেখানে কিছু নেই।

সেদিক থেকে কলিঙ্গ সমগ্র ভারতবর্ষে অনন্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। □

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্যযুগ

[খ্রীঃ পূঃ 257—খ্রীঃ পূঃ 150]

ধৌলী ও ঝাউগাদা শিলালেখ :

ভুবনেশ্বরের সাত কিলোমিটার দক্ষিণে পুরী যাবার পথের ধারে, ডানদিকে ধৌলী পর্বত বা ধৌলগিরির পাদদেশে ভারতবর্ষের অন্যতম একটি প্রাচীন শিলালিপির সন্ধান পাবেন। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর মৌর্যসম্রাট অশোক বালিপাথর খোদাই করে এই শিলালিপিটি লেখান। শিলালেখের উপরে পাথরের মাথায় ঐ একই পাথর খোদাই করে তৈরী করা



চিত্র—2·1 ধৌলী পর্বতে স্বয়ম্ভূ হস্তিমূর্তি।

হয়েছিল একটি হস্তিমূর্তির সম্মুখাংশ। উচ্চতায় প্রায় এক মিটার। হস্তিমূর্তি তথাগতের প্রতীক, যে বুদ্ধদেব শ্বেতহস্তীর রূপ ধারণ করে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন—পালিভাষায় যাঁকে বলা হয় গজতমে, সংস্কৃতে গজোত্তম। মৌর্যযুগের পাথরের কাজে সচরাচর যে মসৃণ পালিশ দেখা যায়, এখানে তার অভাব। তার হেতু অশোকস্তম্ভ সচরাচর চুনারের পাথরে খোদাই করা হ'ত ; তাতে প্যালিশ ওঠে ভাল ; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বয়ম্ভূ প্রস্তরখণ্ডেই শিলালেখের উপরে হস্তিমূর্তিটি খোদাই করা হয়েছে (চিত্র—2·1)। সে পাথরে পালিশ ওঠে না।

সম্রাট অশোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যেসব শিলালেখ রেখে গেছেন তাতে দেখতে পাই বাঁধা-বয়ানের চতুর্দশটি অনুশাসন। ধৌলীতে দেখছি, প্রথম থেকে দশম অনুশাসন পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা হয়েছে এবং চতুর্দশতম অনুশাসনটিও অবিকৃত। শুধুমাত্র একাদশ থেকে ত্রয়োদশ—এই তিনটি অনুশাসন অনুপস্থিত। শুধু অনুপস্থিতই নয়, তার পরিবর্তে দুটি নূতন বাণী সংযোজন করেছেন মৌর্যসম্রাট। এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ঐ তিনটি অনুপস্থিত অনুশাসনে সম্রাট অন্যত্র জানিয়েছিলেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতায় তিনি মর্মাহত, সে-যুদ্ধে লক্ষাধিক কলিঙ্গবাসী নিহত হয় ; এবং দেড়লক্ষ বন্দী হয়। আরও জানিয়েছিলেন—পরবর্তী মহামারী এবং অন্নাভাবে সংখ্যাতীত কলিঙ্গবাসী প্রাণ হারায়। অতি বিচক্ষণ সম্রাট বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যে এই মর্মান্তিক সংবাদটি বিজ্ঞাপিত করেননি—তিনি জানতেন, সেই দুর্ঘটনার কথা কলিঙ্গবাসী যত শীঘ্র ভুলে যাবে ততই মঙ্গল। ধৌলী শিলালেখে অনুশাসনত্রয়ীর এই অনুপস্থিতি যে একটি কাকতালীয় ঘটনা নয়, তার প্রমাণ সম্রাটের ঝাউগাদা শিলালেখ। কলিঙ্গে অবস্থিত এই দ্বিতীয় শিলালেখেও ঐ তিনটি অনুশাসন বর্জিত। পরিবর্তে ঝাউগাদা ও ধৌলী শিলালেখে দুটি বিশেষ অনুশাসন যুক্ত হয়েছে—যা নাকি ভারতবর্ষের অন্যান্য শিলালেখে অনুপস্থিত। মজার কথা, এই

দুটি অনুশাসনও আবার হুবহু এক নয়, সামান্য প্রভেদ আছে ; যা থেকে আমরা হয়তো কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাব।

নূতন অনুশাসন-দ্বয়ের প্রথমটিতে সম্রাট তাঁর অমাত্যদের আদেশ দিয়েছেন--তাঁরা যেন পক্ষপাত-শূন্য হয়ে প্রজাদের প্রতি সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করেন এবং দ্বিতীয়টিতে তোশলীর রাজপ্রতিনিধি এবং মহামাত্রদের জানিয়েছেন যে, কলিঙ্গের যে-অঞ্চল সম্রাট জয় করেননি সেই প্রত্যন্তদেশের স্বাধীন কলিঙ্গবাসীদের প্রতিও সম্রাট সমানভাবে শুভাকাঙ্ক্ষী। এই দুটি অনুশাসনে সম্রাট তাঁর যাবতীয় প্রজাবর্গকে পুত্র-সম্বোধন করেছেন। 'অশোক' এই নাম কোথাও ব্যবহৃত হয়নি, নিজেকে তিনি সর্বত্র 'প্রিয়দর্শী' নামে উল্লেখ করেছেন।

আগেই বলেছি, ঝাউগাদা ও ধৌলীতে অবস্থিত শিলালেখদুটির বয়ানে সামান্য প্রভেদ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ঝাউগাদাতে সম্রাট ঐ অনুশাসনটি উৎকীর্ণ করিয়েছেন শুধুমাত্র মহামাত্রকে উদ্দেশ করে ; অপরপক্ষে ধৌলীতে তা করা হয়েছে মহামাত্র এবং তোশলীর রাজপ্রতিনিধিকে উদ্দেশ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিজিত কলিঙ্গরাজ্যে মগধ-প্রতিনিধির অধিষ্ঠান ছিল ধৌলীর অনতিদূরে কোন স্থানে—যার প্রাচীন নাম তোশলী।

স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—কোথায় ছিল সেই তোশলী ? মগধসম্রাট অশোক বস্তুত একবারই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—অন্য কোনও দেশীয় রাজা মাগধী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করবার দুঃসাহস দেখায়নি। অশোকের শিলালেখেই প্রমাণ রয়েছে যে, তদানীন্তন কলিঙ্গরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে আড়াই লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। সুতরাং এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যায় যে, প্রাক-মৌর্য যুগে কলিঙ্গে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজবংশ শাসন করতেন। কারণ ঐ বিপুল সৈন্যবাহিনীর অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহার যে প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তার পিছনে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন থাকার শতাব্দীসঞ্চিত মানসিক প্রস্তুতি অনস্বীকার্য। সুতরাং প্রাচীনতম ঐ শিল্পনিদর্শনকে পিছনে ফেলে বিস্মৃত অতীতের উজানে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

সে অবলুপ্ত অতীত-যাত্রায় আমাদের বস্তুত তিনটি মাত্র পাথেয়। প্রথমতঃ, জগন্নাথদেবের মন্দিরে সংরক্ষিত অতি প্রাচীনকালের কিছু হাতে-লেখা পুঁথি : মাদলাপঞ্জী। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি প্রাচীন পুরাণ—একাম্র পুরাণ, স্বর্ণাদ্রি-মহোদয়, একাম্র চন্দ্রিকা, কপিল সংহিতা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, ভারতেতিহাসের কয়েকটি সূত্র, যে প্রসঙ্গ 'কলিঙ্গ' নামের উৎপত্তির কথায় ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরে হাতে-লেখা তালপাতার যে পুঁথি আছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা দ্বিমত। প্রথম যুগে স্টার্লিং[1], হাণ্টার[2], ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়[3] অথবা রাজেন্দ্রলাল মিত্র[4] প্রভৃতি এই পুঁথির সাহায্যে কলিঙ্গের আদিম ইতিহাস সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসবেত্তা রমাপ্রসাদ চন্দ[5] অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[6] প্রাচীন কলিঙ্গের ইতিহাস সঙ্কলনে মাদলাপঞ্জীকে একেবারেই আমল দিতে চাননি। তাঁদের মতে এর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই। অপরপক্ষে বর্তমান-যুগে উড়িষ্যার কয়েকজন নব্যপণ্ডিত মাদলাপঞ্জীকে অভ্রান্ত সত্য বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্ক শুনে আমাদের মনে হয়েছে যে, মাদলাপঞ্জীর যাবতীয় বিবরণ নির্ভুল এ-কথা বলাও যেমন বাতুলতা তেমনি তার আদ্যন্তই ভ্রান্ত এ-কথা বলাও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারলে 'ক্ষীরমিবম্বুমধ্যাৎ' নীতিতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করা সম্ভব। একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পুরী-মন্দিরের উপর বারে বারে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ হয়েছে—ফলে বারে বারেই ঐ পর্বতপ্রমাণ পুঁথি স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। সম্রাট আকবরের সম-সময়ে বাংলার নবাব সুলেমানের সেনাপতি 'কালাপাহাড়' উড়িষ্যা আক্রমণ করে এবং পুরীর মন্দির ও তার যাবতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে স্মৃতির উপর নির্ভর করে বিনষ্ট অংশ পুনরায় লেখানো হয়। ফলে ভুল না থাকাই অস্বাভাবিক হত।

মাদলাপঞ্জী :

এই মাদলাপঞ্জী অনুসারে কলিঙ্গ-ইতিহাসে প্রথম নৃপতি হচ্ছেন মহাভারতের পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির, যাঁর রাজত্বকাল, মাদলাপঞ্জী মতে[7] খ্রীঃ পূঃ 3101-3083 ; হিসাব মতো তারপর পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়, শঙ্করদেব প্রভৃতি দীর্ঘনামের তালিকা অতিক্রম করে বুদ্ধদেবের প্রায় সমসময়ে পাচ্ছি বজ্রদেবকে, যাঁর রাজত্বকালে নাকি কলিঙ্গ দেশ উত্তর দিক থেকে যবনরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজা বজ্রদেব এবং তাঁর পরবর্তী নৃপতি ভোজদেব যবন রাজার সঙ্গে

যুদ্ধ করেন এবং যবন সৈন্য বিতাড়ন করেন। এরপর পুনরায় অনেকগুলি রাজার নাম পার হয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে রাজা শোভিনদেব যখন কলিঙ্গের সিংহাসনে আসীন তখন পুনরায় রক্তবাহু যবন সৈন্য কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করে। শোভনদেব 'জগন্নাথদেবের মূর্তিটি নিয়ে শোনপুরের দিকে পালিয়ে যান। পুঁথিমতে তারপর কলিঙ্গের সিংহাসনে এসে বসেন একজন পরাক্রমশালী রাজা 474 খ্রীষ্টাব্দে। তিনিই বিখ্যাত কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কেশরী। তাঁর রাজধানী ছিল জয়পুরে। যবন আক্রমণ তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করেন, রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন এবং শোনপুর অঞ্চল থেকে 'জগন্নাথদেবের মূর্তিটি স্বরাজ্যে ফিরিয়ে এনে পুরীর বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করান। অর্থাৎ মাদলাপঞ্জী মতে যযাতি কেশরীই পুরীর বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ; আর সে মন্দির ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অগ্রজ ; কারণ পঞ্জীমতে যযাতি কেশরীর তিনপুরুষ পরে অলাবু কেশরী (623-677 খ্রীঃ) লিঙ্গরাজের মন্দিরটি নির্মাণ করান।

মাদলাপঞ্জীর বিবরণ যে নির্ভুল নয়, এ-কথা আগেই বলেছি—সাল-শতাব্দী, প্রাপ্ত সনদ ও শিলালেখের সঙ্গে কিছুই মেলে না। কিন্তু নামগুলির ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়।

তোশলী :

বিভিন্ন পুরাণ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার আলোচনা মন্দিরদর্শনকালে করা যাবে। সে যাই হোক, অশোকের শিলালেখ থেকে কথাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এবার সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। সম্রাট অশোক-উল্লিখিত তোশলী জনপদ কোথায় ছিল ? ধৌলীর কাছাকাছি এটুকু অনুমান করা যায়। কিন্তু ঠিক কোথায় ?

ধৌলী শিলালেখের অবস্থান থেকে প্রায় চার কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এবং ভুবনেশ্বর শহরের দুই কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে একটি অতি প্রাচীন জনপদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে শিশুপালগড়ে। এটি একটি অবলুপ্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষ। জনপদের চতুর্দিকে মাগধী-রীতিতে অর্থাৎ রাজগৃহের অবরোধের মতো সুউচ্চ প্রাচীর আছে। তাতে দুটি প্রবেশতোরণ ; কিছু পোড়ামাটির তৈজস এবং কয়েকটি মুদ্রা ছাড়া এখানে আর কিছু আবিষ্কৃত হয়নি। তবু বিশেষজ্ঞরা[8] বলেন, এ জনপদে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মনুষ্যবাসের চিহ্ন পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, এই শিশুপালগড়ই হচ্ছে সেই অশোক-বর্ণিত তোশলী, যেখান থেকে কলিঙ্গের চেদীরাজ মাগধীসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে সৈন্যসমাবেশ করেছিলেন।

অশোকের প্রায় দু'শ বছর পরে কলিঙ্গরাজ খারবেল যে এখানে রাজত্ব করতেন তার প্রমাণ আছে উদয়গিরির হাতী-গুম্ফা শিলালেখে। কিন্তু হাতী-গুম্ফা আমাদের যুগ-বিভাগ হিসাবে দ্বিতীয় যুগে। সে কথা এখানে নয়। আমরা এখনও আছি মৌর্য-যুগে।

অশোকের ধৌলী ও ঝাউগাদা শিলালেখ ছাড়া মৌর্য-যুগের কোনও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন উড়িষ্যায় দেখতে পাওয়া যায়নি। বিতর্কমূলক কয়েকটি দ্রষ্টব্য আছে ভুবনেশ্বরে—এবার সেই আলোচনা করি। পুরাতত্ত্বের এই নীরস আলোচনা কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর মত কৌতূহলোদ্দীপক !

ভাস্করেশ্বরের শিবলিঙ্গ :

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র গত শতাব্দীর শেষপাদে সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন—ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভাস্করেশ্বর মন্দিরের মূল শিবলিঙ্গটি আসলে নাকি একটি অশোক স্তম্ভের ভগ্নাংশ[9] ! কী সাঙ্ঘাতিক কথা ! রাজেন্দ্রলালের সব কথাতেই দেখছি ফার্গুসন-সাহেব আপত্তি জানাতেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল তাঁর সন্দেহের সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তির অবতারণাও করেননি। ফলে পরবর্তী গবেষকের দল—মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল-কুমার বসু এবং কে. এন. মহাপাত্র প্রভৃতি এ-মত মেনে নিতে পারেননি। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের কিন্তু মনে হয়েছে পূর্বসূরী রাজেন্দ্রলাল যে কথাটা বলেছিলেন তার মধ্যেই সত্য আছে—ঐ শিব-লিঙ্গটি অশোক স্তম্ভেরই ভগ্নাংশ। শ্রীপানিগ্রাহী তাঁর গ্রন্থে[10] এবিষয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

আকারে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত যে কোন শিব-লিঙ্গের তুলনায় আলোচ্য শিবলিঙ্গটি অতি প্রকান্ড। উচ্চতা—তিন মিটার ; লিঙ্গমূলের পরিধি —পৌনে চার মিটার ; গৌরী-পীঠের বেড় প্রায় ছয় মিটার। লক্ষ্য করবার বিষয়, শিবলিঙ্গের গায়ে ছেনির দাগ আছে, যেন রীতিমত আয়াসে তার মসৃণতা অথবা কোন প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে তুলে ফেলা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে, গৌরী-পীঠের পাথরখানি একটি

মাত্র পাথর কেটে বার করা হয়নি,—যা অন্য সব শিবলিঙ্গে দেখা যাচ্ছে,—সেখানি চারটি পৃথক পাথরের সমাহার। বেশ বোঝা যায়, কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গের চারদিকে গৌরী-পীঠ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীপানিগ্রাহী ঐ শিবলিঙ্গের গায়ে কিছু ব্রাহ্মী অক্ষর দেখেছেন বলেও দাবী করেন। শ্রীপানিগ্রাহীর গ্রন্থরচনাকালে শিশুপালগড়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাজ চলছিল। সে কার্যের ভারপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি এ-দিকে আকর্ষণ করা হলে ভাস্করেশ্বর মন্দিরের কাছে-পিঠে অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। ফলে, মন্দিরের উত্তর-দ্বারের প্রায় শওয়া শ' মিটার দূরে মাটির ভিতর থেকে একটি 'বেদিকা-থভ' (স্তূপের চতুর্দিকে যে রেলিং থাকে তার স্তম্ভ) আবিষ্কৃত হয়—নিঃসন্দেহে সেটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। মনে হয়, এখানে একটি অশোক স্তম্ভই শুধু ছিল না, একটি স্তূপও ছিল। 'বেদিকা-থভ' আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে আরও অনুসন্ধান চালানো হয়—এবার মন্দিরের উত্তর-দ্বারের মাত্র বারো মিটার দূরে মাটির নিচে থেকে উদ্ধার করা হল একটি সিংহ-মূর্তির ঊর্ধ্বাংশ। সিংহ-মূর্তিটি প্রকাণ্ড, সেটি শিবলিঙ্গ যে-পাথরে তৈরী সেই পাথরের অথচ মূল-মন্দির সে পাথরের নয়! ভুবনেশ্বরের যাদুঘরে ঐ সিংহ-মূর্তিটি এখনও দেখতে পাবেন একতলার ঘরে; উচ্চতায় এক মিটার, পরিধিতে আড়াই মিটার। মূর্তিটির গায়ে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত হরফে লেখা আছে 'শ্রী সিংহ-বন্ধ'। উড়িষ্যার মন্দিরে এ জাতীয় সিংহ-মূর্তি (উড়-গজ-সিংহ, ঝাম্পান সিংহ প্রভৃতি; সে সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করব) মূল মন্দিরের উপর যথেষ্ট সংখ্যায় আছে; কিন্তু প্রথম কথা, ঐ সিংহ-মূর্তির পরিকল্পনা প্রথম যুগের কোন মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় কথা, পঞ্চম শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরে এমন কোন মন্দিরের কথা কল্পনাই করা যায় না যে-মন্দির দেউলের উপর অতবড় সিংহের ওজন বহন করতে পারবে। তৃতীয় কথা, এই সিংহ-মূর্তিটি যখন মাটির নিচে থেকে আবিষ্কৃত হয়, তখন দেখা যায় চারদিকে চারখানি ভারী পাথর দিয়ে সেটিকে সুকৌশলে কবর দেওয়া হয়েছিল, উপরেও ছিল পাথরের টুকরা—স্বাভাবিক মাটি নয়। মূর্তিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবার জন্য লাইন ধরে ছেনির দাগ দেওয়াও ছিল।

সবটা মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে, ভাস্করেশ্বর মন্দিরের শিবলিঙ্গ আসলে একটি রূপান্তরিত অশোক স্তম্ভ—সেখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপও ছিল। সম্ভবতঃ ভৌমকরযুগে শৈবরা সেটিকে শিবমন্দিরে রূপান্তরিত করে। অশোক স্তম্ভকে করে শিবলিঙ্গ—স্তম্ভশীর্ষের সিংহটিকে সমাধিস্থ করে। □



মৌর্যযুগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুহামন্দির যুগ

[খ্রীঃ পূঃ 146—খ্রীঃ পূঃ 75]

দ্বিতীয় যুগ বা গুহামন্দির যুগের যাবতীয় নিদর্শনগুলি দেখতে পাবেন ভুবনেশ্বরের আট কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি অনুচ্চ পর্বতে। সে দুটির নাম উদয়গিরি ও খণ্ড-গিরি। চিত্র—3.1-এ দেখতে পাচ্ছ ভুবনেশ্বর থেকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি সড়ক চাঁদকার দিকে চলে



চিত্র—3.1 উদয়গিরি খণ্ডগিরির ভূমিনক্শা।

গেছে—যার পূর্বদিকে উদয়গিরি এবং পশ্চিমদিকে খণ্ডগিরি। এই দুটি পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য কৃত্রিম ও অকৃত্রিম গুহা। কলিঙ্গরাজ খারবেল এখানে নাকি একাই 117টি গুহা খনন করান। অধিকাংশ গুহাই অবশ্য ভেঙে গেছে—তবু যা আছে তাও অনেক। আমরা মাত্র কয়েকটি গুহার অবস্থান ঐ চিত্র—3.1-এ চিহ্নিত করে দিলাম এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্কেত অনুসারে সেগুলিকে সনাক্ত করলাম।

একটা কথা বলা দরকার। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য কলিঙ্গের স্থাপত্য-চিন্তাকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করে আলোচনা করছি—তার মানে কিন্তু এ নয় যে, এক যুগের কাজ অন্য যুগে একেবারেই হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতে জৈন সন্ন্যাসীরা যে মৌর্য যুগের আগেও গুহা খনন করতেন না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। বরং এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অশোকের আক্রমণের পূর্বকাল থেকেই এখানে গুহা খনন কার্যে জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তার ঐতিহাসিক নজির নেই। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন যা এখানে পাওয়া যায় তা হাতী-গুম্ফায় অবস্থিত একটি শিলালেখ—যার সময়কাল খ্রীঃ পূঃ 157 অব্দ।

পুরাতত্ত্ববিদদের মতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কৃত্রিম গুহাটি আছে বরাবর[1] পর্বতে। তার নাম 'সুদামা-গুহা'। সেটি সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত। উদয়গিরির কোনও গুহা তার থেকে বয়সে প্রাচীন বলে প্রমাণিত হয়নি। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে এই দুই পর্বতে অবস্থিত প্রথম যুগের কৃত্রিম গুহা-গুলিকে আমরা চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি :

প্রথম পর্যায় (আঃ 146 খ্রীঃ পূঃ) হাতী-গুম্ফা ; সর্প-গুম্ফা ; ব্যাঘ্র-গুম্ফা এবং পবন-গুম্ফা।

দ্বিতীয় পর্যায় (আঃ 146—126 খ্রীঃ পূঃ) স্বর্গপুরী ; মঞ্চপুরী ; জয়বিজয় ; ঠাকুরানী ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্যায় (আঃ 126—100 খ্রীঃ পূঃ) অনন্ত-গুম্ফা ; তত্ত্ব-গুম্ফা 1 ও 2।

চতুর্থ পর্যায় (আঃ 100—75 খ্রীঃ পূঃ) রানী-গুম্ফা ও গণেশ-গুম্ফা।

অর্থাৎ প্রথম যুগের সব কয়টি গুহাই মাত্র 70 বৎসরের ভিতর খোদিত হয়েছিল।

একেবারে প্রথম যুগেই অর্থাৎ প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের একটি যক্ষিণী মূর্তি উদয়গিরিতে আবিষ্কৃত হয়েছে যা ভারহুত ও সাঁচী শৈলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ মূর্তিটি ঠিক কোথায় পাওয়া গিয়েছিল জানি না, কিন্তু এটি 'ফ্রি-স্ট্যান্ডিং' বা বিচ্ছিন্ন মূর্তি—এটি পুরাতত্ত্ব বিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত।

হাতী-গুম্ফা : একটি প্রাকৃতিক গুহাকে ছেনি-হাতুড়ির সাহায্যে বর্ধিত করে হাতী-গুম্ফাতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। প্রবেশ-পথের উপরে কিছুটা অংশ মসৃণ করে শিলালেখটি উৎকীর্ণ করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্টার্লিং এই লিপিটি প্রথম আবিষ্কার করেন ; কিন্তু এর পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। তিনি এর একটি অনুলিপি[2] প্রকাশ করে পণ্ডিতদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন। পরে লেঃ কিট্টো পুনরায়[3] এই লিপির একটি অনুলিপি প্রকাশ করেন এবং নিজ বুদ্ধিমত একটি অনুবাদও প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলাল[4] এবং প্রিন্সেপ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পুনরায় এক-একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয়েছিল 'অরা' নামে একজন কলিঙ্গরাজ এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ করান এবং 'অরা' অনেক জনহিতকর কাজ করেন। বিরাট জলাশয় এবং গুহামন্দির খনন করান। ওঁদের মতে উল্লিখিত 'অরা' ছিলেন অশোক-পূর্ব নৃপতি, যার অনুসিদ্ধান্ত—এই হাতী-গুম্ফাটি সাঁচী-ভারহুত-সুদামা-কর্ণকৌপরের পূর্ব যুগের, বস্তুতঃ ভারতবর্ষের প্রথম গুহামন্দির।

কিন্তু এ মত স্থায়ী হয়নি। ডাঃ ভগবানদাস ইন্দ্রজী আরও কয়েক বছর পরে এই শিলালিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ করেন যে, এটি খ্রীষ্ট-পূর্ব 157 অব্দে খোদিত ; সম্রাট অশোকের পরবর্তী কালে। যদিও এ আলোচনা নিছক ইতিহাসের বিষয়-ভুক্ত তবু পাঠকের কৌতূহল হতে পারে রাজেন্দ্রলাল বা প্রিন্সেপ কেন এটিকে অশোক-পূর্ব যুগের বলে মনে করেছিলেন। সংক্ষেপে সে কথা বলি :

শিলালেখের একস্থানে আছে 'অর নন্দরাজের প্রাসাদ নির্মূল করেন'। সুতরাং মনে করা হয়েছিল, শিশুনাগ বংশের (650-314 খ্রীঃ পূঃ) মহারাজ নন্দ, যাঁর রাজধানী ছিল সম্ভবতঃ গিরিব্রজে, তাঁকেই এই কলিঙ্গরাজ 'অর' পরাজিত করেন। কিন্তু ইন্দ্রজী শিলালিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার করে প্রমাণ করেন যে, 'অর' প্রকৃত-প্রস্তাবে খা-'অর'-বেল নামের অপভ্রংশ, খারবেল নামের নির্ভুল পাঠ সপ্তদশ পংক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে। কলিঙ্গরাজ মগধ-রাজধানীতে মহারাজ নন্দের প্রাসাদ অধিকার করলেও তা নন্দের জীবিতাবস্থায় নয়—তখন মৌর্যরাজ বহসাতিমিত মগধ-সম্রাট।

এই শিলালেখের তিনটি পংক্তি ঐতিহাসিকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :

প্রথমতঃ, তৃতীয়[5] পংক্তিতে বলা হয়েছে, "মহারাজ সতকর্ণীকে স্বমতে আনতে না পেরে খারবেল বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, হস্তিবাহিনী, রথী এবং পদাতিকের সাহায্যে তাঁকে স্বরাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে প্রতিহত করেন।"

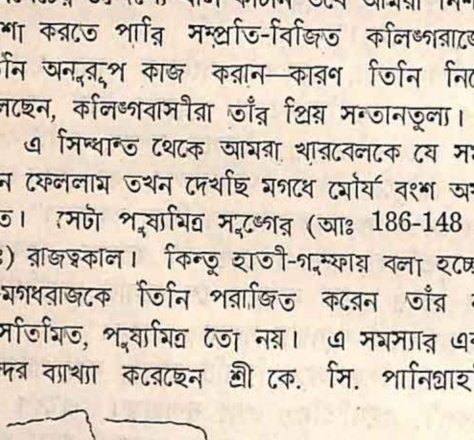
দ্বিতীয়তঃ, ত্রয়োদশ পংক্তিতে বলা হয়েছে, "মগধ-রাজ বহসাতিমিতকে খারবেল নিজ পদানত করেন এবং কলিঙ্গের জীনাসন সম্পদ, যেটি নন্দ-রাজ ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা অঙ্গ-মগধ রাজ্য থেকে পুনরায় কলিঙ্গে নিয়ে আসেন।"

তৃতীয়তঃ, ষষ্ঠ পংক্তিতে বলা হয়েছে, "একশত তিন বৎসর পূর্বে নন্দরাজ যে খালটি কেটেছিলেন খারবেল সেটি পুনরায় সংস্কার করেন।"

ফলে শিলালেখে তিনটি রাজার নাম পাচ্ছি,—সতকর্ণী, বহসাতিমিত এবং নন্দরাজ। এঁদের যে কোন একজনকে সনাক্ত করতে পারলেই রাজা খারবেলের সময়টা আমরা নির্ধারণ করতে পারি। ডাঃ বড়ুয়ার মতে নন্দরাজ আর কেউ নয়, স্বয়ং মৌর্য-সম্রাট অশোক। যুক্তি—অশোকের শিলালেখ থেকে বোঝা যায়, তিনিই প্রথম ভারতীয় সম্রাট যিনি বুদ্ধ-দেবের পরবর্তীকালে 'চির অপরাজেয়' (অবিজিতং বিজিনিতাম্) কলিঙ্গের চেদীরাজকে পরাস্ত করেন। সুতরাং একমাত্র তাঁর পক্ষেই কলিঙ্গরাজের প্রাসাদ অথবা দেবমন্দির থেকে জৈন তীর্থঙ্করের কোন পবিত্র সিংহাসন বিজয়চিহ্ন-রূপে পাটলিপুত্রে অথবা রাজগৃহে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর এবং তাঁর পক্ষেই বিজিত কলিঙ্গ রাজ্যে সেচের জন্য পয়ঃপ্রণালী খনন করানো সম্ভব। কলিঙ্গরাজ খারবেল সম্রাট অশোকের 103 বৎসর পরে মগধরাজকে পদানত করে সেই পবিত্র সিংহাসনটি স্বদেশে ফিরিয়ে আনেন। এখন অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের কাল সুচিহ্নিত ; সেটা খ্রীষ্টপূর্ব 261 অব্দের কথা। ধৌলী এবং ঝাউ-

গাদায় তাঁর শিলালেখ স্থাপনের সময়কাল 257 খ্রীঃ পূঃ। সুতরাং ধরা যেতে পারে, প্রায় ঐ সময়েই অশোক হাতী-গুম্ফায় উল্লিখিত খালটি খনন করান। এ থেকে প্রমাণ হয়, হাতী-গুম্ফার সময়কাল (257-103=) 154 খ্রীঃ পূঃ। আরও একটি সূক্ষ্ম সূত্রের নির্দেশে ঐতিহাসিকরা তারিখটা আরও সাত বৎসর পেছিয়ে বলেছেন, 147 খ্রীঃ পূঃ। সে সূত্রটির কথা পরে বলছি। জলসেচের খালটি যে অশোকই খনন করান, এ সিদ্ধান্তের পিছনে আরও যুক্তি আছে। দেখা যাচ্ছে, সম্রাট অশোক সুদূর গিরিনগরে (আধুনিক গিরনার, সৌরাষ্ট্রে) তাঁর পূর্বপুরুষ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত একটি খাল খনন করার উদ্দেশ্যে একজন পারসিক বাস্তুকারকে[6] নিয়োগ করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশে সম্রাট যদি জলসেচের উদ্দেশ্যে খাল কাটান তবে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি সম্প্রতি-বিজিত কলিঙ্গরাজ্যেও তিনি অনুরূপ কাজ করান—কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, কলিঙ্গবাসীরা তাঁর প্রিয় সন্তানতুল্য।

এ সিদ্ধান্ত থেকে আমরা খারবেলকে যে সময়ে এনে ফেললাম তখন দেখছি মগধে মৌর্য বংশ অস্তমিত। সেটা পুষ্যমিত্র সুঙ্গের (আঃ 186-148 খ্রীঃ পূঃ) রাজত্বকাল। কিন্তু হাতী-গুম্ফায় বলা হচ্ছে—যে-মগধরাজকে তিনি পরাজিত করেন তাঁর নাম বহসতিমিত, পুষ্যমিত্র তো নয়। এ সমস্যার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন শ্রী কে. সি. পানিগ্রাহী[7]।



চিত্র—3.2 ব্যাঘ্র গুম্ফার প্রবেশপথ।

তিনি বলেছেন, পুষ্যমিত্র সুঙ্গ ছিলেন মগধ-সম্রাটের সেনাপতি। তিনি সম্ভবতঃ মৌর্য বংশেরই কোন অযোগ্য বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে রাজ্যশাসন করতেন। মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র স্বনামে কখনই রাজ্যশাসন করেননি। প্রমাণ স্বরূপ পানিগ্রাহী বলেছেন, বৃহদ্রথের মৃত্যুর অনেক পরে অযোধ্যাপতি ধনদেব তাঁর শিলালেখে সগর্বে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'সেনাপতি' পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সুহৃদ। যদি পুষ্যমিত্র স্বনামে রাজ্যশাসন করতেন তাহলে নিশ্চয়ই 'সেনাপতি' বিশেষণের পরিবর্তে 'সম্রাট' পুষ্যমিত্র বলে উল্লেখ করতেন।

হাতী-গুম্ফায় উল্লেখ আছে যে, খারবেল মগধ জয় করতেই বেরিয়েছিলেন কিন্তু অপর শত্রু সতকর্ণীর আক্রমণে তিনি প্রথমবার মগধ জয় করতে পারেননি। পিছনের শত্রুকে নিরস্ত করতে হয়েছিল তাঁকে। সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের জীবিতকালে খারবেল তাঁর মগধ জয় কার্য সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে খারবেল তাঁর নিজের দ্বাদশবর্ষ রাজত্বকালে মগধ বিজয় করেন, সম্ভবত : 148 খ্রীষ্টপূর্বে। সেনাপতি পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পরে মগধরাজ বহসতিমিতকে পরাজিত করা খারবেলের মত ক্ষমতাশালী নৃপতির পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ছিল না। এ থেকেই অনুমান করা হয়েছে—হাতী-গুম্ফার শিলালেখের সময়কাল তার পর বৎসর, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ 147।

ইতিহাসের বিষয়ে এতকথা বলতে হল শুধু বোঝাতে যে, হাতী-গুম্ফার ঐ শিলালেখটি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। ঐ দুর্বোধ্য হরফগুলি থেকেই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের তিনজন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি—মগধের পুষ্যমিত্র সুঙ্গ, কলিঙ্গের খারবেল এবং অন্ধ্রের সাতবাহনরাজ শ্রীসতকর্ণী ইতিহাসে প্রস্ফুটিত।

সর্প-গুম্ফা ও পবন-গুম্ফা : হাতী-গুম্ফার প্রায় সমসময়েই নিকটবর্তী এই দুটি গুহা খনন করানো হয়েছিল। সর্প-গুম্ফার সম্মুখে ছোট্ট একটি বারান্দা, তাও ভেঙ্গে গেছে। প্রবেশদ্বারের উপরে তিন-ফণাওয়ালা একটি সাপের মূর্তি খনন করা। এ গুহাতে দর্শনীয় কিছু নেই—আছে একটি শিলালেখ—মাত্র একটি পংক্তি। তা শুধু বলছে, "এই গুহাটি চৌলকর্মার (অথবা চৌল কমস) আবাসস্থল।" অনুমান করা যায়, তিনি সম্রাট খারবেলের অনুগৃহীত একজন জৈন সন্ন্যাসী। ফার্গুসনের[8] মতে ঐ সন্ন্যাসী হরিদাস নামে অপর একটি গুহা খনন করান। হরিদাস গুহারই নামান্তর পবন-গুম্ফা।

ব্যাঘ্র গুম্ফা : প্রথম পর্যায়ের এই গুহাটির

উল্লেখ বিশেষভাবে করতে হচ্ছে এই কারণে যে, এর গঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি শিল্পীমনের পরিচয় পাচ্ছি। ঝুঁকে-পড়া একটা স্বাভাবিক পাথরকে এমন ভাবে খনন করা হয়েছে যে, সামনে থেকে দেখলে মনে হবে প্রকাণ্ড একটা বাঘ মুখব্যাদান করে আছে। ঐ হাঁ-মুখেই প্রবেশ পথ। বাঘের দাঁতগুলি লক্ষণীয়—চোখ দুটি, নাক এবং কান। ভিতরের গুহাটি ছোট্ট, মাত্র দুই মিটার গভীর। উচ্চতাও মাত্র এক মিটার। দ্বারের উপর একটি ছোট্ট শিলালিপি, যার পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে এই গুহায় ছিল জৈন সন্ন্যাসী সভুতীর বাস। বিচিত্র গঠনের জন্য এর একটি চিত্র সংযোজন করা গেল (চিত্র—3.2)।

স্বর্গপুরী, মণ্ডপুরী, জয়বিজয়, ঠাকুরানী ইত্যাদি : চিত্র—3.1 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অন্যূন নয়টি গুহা অর্ধচন্দ্রাকারে রানী গুম্ফাকে ঘিরে আছে। কিন্তু আমরা জানি, এই গুহাগুলি যখন খনন করা হয় তখন রানী গুম্ফা ছিল না, কারণ শেষোক্তটি চতুর্থ পর্যায়ের গুম্ফা। এই নয়টি গুহার মধ্যে দুটি দেখছি দ্বিতল,—স্বর্গপুরী (বা অলকাপুরী) এবং জয়বিজয়। পরবর্তী যুগের রানী-গুম্ফাও দ্বিতল এবং আকারে এ দুটির অপেক্ষা অনেক বড়। রানী-গুম্ফার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে দেখব যে, স্বর্গপুরী অথবা জয়বিজয়-গুম্ফায় দ্বিতলের স্তম্ভগুলি একতলার স্তম্ভের ঠিক উপরে খোদাই করা—অপর পক্ষে রানী-গুম্ফার দ্বিতলের স্তম্ভগুলি অনেক পিছনে সরানো। কেউ কেউ বলেছেন, রানী-গুম্ফার শিল্পীরা একথা জানতেন না যে, স্তম্ভগুলি একই অক্ষে থাকলে, অর্থাৎ মাথায়-মাথায় থাকলে ভারসাম্য ভালভাবে রক্ষিত হয়। শিল্পীদের এই অনভিজ্ঞতার ফলেই নাকি রানী-গুম্ফার একতলার ছাদটি ভেঙে পড়েছিল। আমরা ঐসব বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। অজন্তার ষষ্ঠ-গুহাতেও দ্বিতলের স্তম্ভগুলি একতলার স্তম্ভের সঙ্গে এক অক্ষে খোদিত হয়নি—তবু তা ভেঙে পড়েনি। বস্তুতপক্ষে দ্বিতল গুহা-মন্দিরে স্তম্ভগুলি ঠিক মাথায়-মাথায় হবে অথবা ধাপে ধাপে হবে তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের উপর। যে পাহাড় কেটে ঐ দ্বিতল গুহাবাস তৈরী হচ্ছে তার ঢালের উপর সেটি নির্ভরশীল। পাহাড় যদি যথেষ্ট ঢালু হয় তখন ধাপে ধাপে খোদাই করলে (যেমন নাকি রানী-গুম্ফা) অনেক কম ঘন-মিটার খনন করতে হবে। অপরপক্ষে পাহাড়ের গা যদি খাড়া হয় তখন একতলার ঠিক উপরে দ্বিতল খনন করলে (যেমন নাকি স্বর্গপুরী) খনন-কার্য অনায়াসে লাঘব করা যায়। একটু চিন্তা করলেই এ সত্য অনুধাবন করা যাবে ; এজন্য কাউকে বিদগ্ধ বাস্তুবিদ হতে হবে না।

সে যাইহোক, স্বর্গপুরীতে আছে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রবেশ পথের দুদিকে আছে দুটি হস্তি-মূর্তির অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য নিদর্শন। খিলানের উপর সমান্তরাল 'ফ্রিজে' রেলিঙের একটি নক্‌শা—সাঁচী অথবা ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপের রেলিং (সূচী-থভ-উষ্ণীষ প্রভৃতি)-এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

স্বর্গপুরীর ঠিক পাশেই জয়বিজয় গুম্ফাটিও দ্বিতল এবং এখানেও দ্বিতল-অংশ একতলার ঠিক উপরে অবস্থিত। দুটি করে কক্ষ এবং সে দুটি আকারে সমান নয়। কক্ষের উচ্চতা মাত্র এক মিটার। গুহা কক্ষের প্রবেশ পথটিও ছোট, প্রায় 1 মি×·75 মি। বারান্দার তিনদিক ঘিরে প্রায় একহাত চওড়া টানা একটি পাথরের বেঞ্চি আছে, যা নাকি পর্বতগাত্র থেকে খনন করে বার করা। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, এ জাতীয় পাথরের বেঞ্চি উদয়গিরি খণ্ড-গিরির একটি বৈশিষ্ট্য ; অনেক গুহাতেই আছে। এ ধরনের পাথরের লম্বা টানা-বেঞ্চি ভারতবর্ষের অন্য কোন কৃত্রিম গুহাবাসে দেখতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় নাসিককে কেন্দ্র করে এবং অজন্তাতে সমসাময়িক হীনযানী বৌদ্ধদের যে-সব পার্বত্যগুহা দেখতে পাওয়া যায় তাতে এ-রকম টানা বেঞ্চি নেই, আছে ছোট ছোট তক্তাপোষের মত প্রস্তরাসন। সেগুলি একজন শ্রমণের শয়নের উপযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, এখানে ঐ টানা-বেঞ্চি বারান্দাতে অবস্থিত, ফলে শ্রমণেরা দল বেঁধে এখানে বসলে উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পেতেন। অপরপক্ষে বৌদ্ধ বিহারে প্রস্তরাসনগুলি অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল গুহাভ্যন্তরে—ফলে সেগুলি শয়নের জন্যই নির্মিত, উপবেশনের জন্য নয়।

জয়বিজয়-গুম্ফার দু' পাশে দুটি দ্বারপাল, একটি পুরুষ ও একটি রমণী। প্রবেশদ্বারদ্বয়ের উপর যে অর্ধচন্দ্রাকার খিলান সে-দুটিকে যুক্ত করে জমির সমান্তরাল যে 'ফ্রিজ' তাতে অর্ধোৎকীর্ণ (bas-relief) ভাস্কর্যের নিদর্শন। দেখতে পাচ্ছি—কয়েকজন রমণী একটি বৃক্ষকে পূজা করতে আসছেন। এই ভাস্কর্যে বৌদ্ধ প্রভাব অনস্বীকার্য। সাঁচী-ভারহুতের বিশেষ জাতের রেলিং, বোধিদ্রুমের পূজা, স্তূপপূজা, গজলক্ষ্মী এবং স্বস্তিকাচিহ্ন এখানকার

প্রাচীন গুহাগুলিতে বারে বারে দেখতে পাচ্ছি। এই লক্ষণগুলি দেখে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হাণ্ট, স্টার্লিং প্রভৃতি পূর্বসূরীরা আন্দাজ করেছিলেন যে, এগুলি বৌদ্ধ গুহা। পরবর্তীকালে প্রাচ্যবিশারদরা বলেছেন যে, এইসব প্রমাণ সত্ত্বেও মেনে নিতে হবে এগুলি জৈন সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নয়। সেই পরবর্তী প্রাচ্য-বিশারদদের নির্দেশানুসারে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, উদয়গিরি-খণ্ডগিরির সব কিছুই জৈনধর্মের, বৌদ্ধদের নয়। আমার মনে হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে জেমস্ ফার্গুসনের মতবাদ। তিনিই তাঁর গ্রন্থে পূর্বসূরীদের সমস্ত মত নস্যাৎ করে সর্বপ্রথম[9] এই মতবাদ ঘোষণা করেছিলেন। ফলে তাঁর পরবর্তী-যুগের সকল পণ্ডিতই মনে করেন এগুলি জৈন গুহা—বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত। অথচ আশ্চর্য, এ মত-বাদের পক্ষে কেউ কোন জোরালো যুক্তি দেখাননি ; অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। আমার এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত করে যদি কোন বিদগ্ধ পাঠক সে-দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বাধিত হব। পরবর্তী সংস্করণে সে ভ্রান্তি অপনোদিত হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি ক্লেশকর অধ্যায়ের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি। ফার্গুসন সাহেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতবিরোধ হয়েছিল। অজন্তা ও উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পের বয়স নিয়ে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ বাদানুবাদের কথা প্রাচ্য-সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। ফার্গুসন তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার রাজেন্দ্রলালকে (তখন স্বর্গতঃ) আক্রমণ করেছেন, এমনকি কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত কটু ভাষায়[10]। [লক্ষণীয় ফার্গুসন এই অশোভন ভাষা তাঁর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন এ কথা জেনে যে, প্রতি-পক্ষ প্রতিবাদ করতে পারবেন না, কারণ তিনি মৃত।] রাজেন্দ্রলাল এ পথের পথিকৃৎ—নানান বিষয়ে তাঁর ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুতঃ ফার্গুসনও এমন অনেক উক্তি করে গেছেন যা পরে ভ্রমাত্মক বলে প্রমা-ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাঁদের গবেষণা একেবারে নিষ্ফল হয়েছে এ কথা বলা অনুচিত। আমার তো মনে হয়েছে যে, রাজেন্দ্রলালের মতের বিরোধিতা করতে বসে ফার্গুসন কিছুতেই মানতে রাজী হননি যে, উড়িষ্যার এই গুহাগুলিতে জৈন ছাড়াও কিছু কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরও বাস ছিল।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, গুহাগুলির নির্মাণ-সময়ে কলিঙ্গের রাজধর্ম ছিল জৈন। খারবেল জৈন ছিলেন ; কিন্তু তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, এ গুহাগুলির কোনটিতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন না। সম্রাট অশোক তো ঘোর বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তাঁর আদেশে এবং অর্থসাহায্যে বরাবর পর্বতে অজীবক জৈন সম্প্রদায়ের জন্য সুদামা, লোমশঋষি, কর্ণকৌপর ইত্যাদি গুহা খনন করানো হয়। অশোক-পৌত্র সম্রাট দশরথ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নাগার্জুন পর্বতে জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য গোপিকা গুহাটি খনন করান। কলিঙ্গরাজ খারবেল এঁদের পর-বর্তী যুগের রাজা। তাঁর বা তাঁর কোন অধঃস্তন পুরু-ষের পক্ষেও জয়বিজয় প্রভৃতি গুহা (যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে) বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য তৈরী করা অসম্ভব কেন হবে ? এই যুগেই কাথিয়াওয়াড় রাজ্যের জুনাগড়ে, গিরনারে, বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীরা পাশাপাশি গুহা নির্মাণ করে বাস করেছেন। বহু শতাব্দী পরেও ইলোরাতে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা পাশা-পাশি গুহা নির্মাণ করে বাস করেছেন। একমাত্র উদয়গিরি-খণ্ডগিরিতেই সেটা কেন অসম্ভব বিবে-চিত হয়েছে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সুস্পষ্ট বৌদ্ধ প্রতীক—গজলক্ষ্মী, নাগপূজা, বোধিদ্রুম, মকরমূর্তি, ভারহুত রেলিং এবং বিশেষত ত্রিরত্ন ('বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' এই মন্ত্রের প্রতীক একটি ত্রিশূলের মত ফলক, যা নাকি বৌদ্ধ স্তূপের উপর প্রায় সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় ; সেই চিহ্নটি রানী-গুম্ফার খিলানের উপরও দেখা যায়) আর স্বস্তিকা[11] প্রভৃতির ইঙ্গিত অস্বীকার করে কেন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এগুলি শুধুমাত্র জৈন সম্প্রদায়ের বলে ঘোষণা করেছেন, তা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি।

অনন্ত-গুম্ফা, তত্ত্ব-গুম্ফা : এবার আমরা তৃতীয় পর্যায়ের দুটি গুহার প্রসঙ্গে আসতে পারি। এ-দুটি কিন্তু উদয়গিরি পর্বতে নয়, পার্শ্ববর্তী খণ্ডগিরিতে। অনন্ত-গুম্ফার একটি মাত্র কক্ষ (7·3 মি ×2·1 মি), যার সম্মুখে প্রায় 210 সে. মি. চওড়া একটি বারান্দা আছে। প্রথমাবস্থায় এ গুহায় চারটি প্রবেশ দ্বার ছিল, বর্তমানে দুটি দ্বার ও একটি জানালা আছে। দ্বারের উপর ফ্রিজ অংশে একই রকম অলঙ্করণ—স্বস্তিকা, ত্রিরত্ন, গজলক্ষ্মী, সর্প-শীর্ষ, বোধিদ্রুম এবং ভারহুত-সাঁচী স্তূপের বিশেষ-জাতের রেলিং বা বেদিকা। বৌদ্ধ ভাস্কর্যের ছাপ যে অতি স্পষ্ট একথা অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ সে কথা

কিন্তু ফার্গুসনও তাঁর "কেভ টেম্পলস্ অফ ইন্ডিয়া" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন—তবু বলেছেন, গুহাগুলি শুধুমাত্র জৈন সন্ন্যাসীদের। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নয়।

তত্ত্ব-গুম্ফার দুটি অংশ উপর নিচে অবস্থিত। স্থানীয় লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাইড আমাকে বলেছিলেন 'তত্ত্ব' শব্দটা এসেছে 'তোতা' থেকে। গুহা ভাস্কর্যে তোতাপাখী সমেত একটি নারীমূর্তিও তিনি দেখিয়ে ছিলেন। এ জাতীয় 'তোতাপাখি গাইডের' নির্দেশনা থেকে দর্শক গুহাগুলির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কতটা ধারণা নিয়ে যাবেন তা ভেবে দেখা দরকার।

পর্যায়ক্রমে তত্ত্ব-গুম্ফা 1, 2 দেখার পর আমরা আসি অনন্ত-গুম্ফাতে। তারপর প্রায় পাশাপাশি তিনটি গুম্ফা—নবমুনি, বারোভূজি ও ত্রিশূল। শেষের দুটিকে একত্রে বলা হয় সাতবক্র বা সাত-ঘরা। শেষোক্ত গুহায় চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের অর্ধোৎ-কীর্ণ পাথরের মূর্তি আছে। এগুলি পরবর্তী যুগের। চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের নাম আমরা জানি, তাঁদের সনাক্ত করার উপায়ও আমরা জানি—প্রত্যেক তীর্থঙ্করের বিশেষ এক চিহ্ন, বাহন বা প্রতীক আছে। গুহা প্রাচীরে মূর্তিগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো নেই। প্রতীকচিহ্ন থেকেও তাঁদের সনাক্ত করার অসু-বিধা ঘটেছে এজন্য যে, অনেক ক্ষেত্রেই চিহ্নগুলি ভেঙে গেছে। আমরা তাঁদের সনাক্ত করবার একটা চেষ্টা এখানে করে দেখতে পারি।

চব্বিশজন জৈন-তীর্থঙ্করের প্রতীক-চিহ্ন সম্বন্ধে মূল সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে জৈন অভিধান-কারিক হেমচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোকে :

	নাম	জন্মস্থান
1	আদিনাথ বা ঋষভনাথ	বিজিতা-নগরী
2	অজিতনাথ	অযোধ্যা
3	সম্ভবনাথ	শ্রাবস্তী
4	অভিনন্দন	অযোধ্যা
5	সুমতীনাথ	ঐ
6	পদ্মপ্রভ	কৌশাম্বী
7	সুপার্শনাথ	কাশী
8	চন্দ্রপ্রভ	চন্দ্রপুর
9	পুষ্পদন্ত	কনন্দীনগরী
10	শীতলনাথ	ভদ্রপুর
11	শ্রেয়াংশনাথ	সিংহপুর
12	বামপূজ্য	চম্পাপুরী
13	বিমলনাথ	চম্প্যেয়পুর

বৃষো গজাশ্ব প্লবগঃ ক্রৌঞ্চোব্জং স্বস্তিকঃ শশী।

মকরঃ শ্রীবৎসঃ খড়্গী মহিষঃ শূকরস্তথা ॥

স্যেনো বজ্রং মৃগশ্ছাগো নন্দাবর্ত্তো

ঘটোঽপি চ।

কূর্ম্মো নীলোৎপলং শঙ্খঃ ফণীসিংহোঽতাং

ধ্বজাঃ ॥

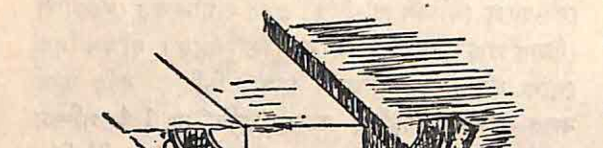
অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে প্রতীক-চিহ্নগুলি হচ্ছে—বৃষ, হস্তী, অশ্ব, প্লবগ (বনমানুষ), ক্রৌঞ্চ, অব্জ (পদ্ম), স্বস্তিক, শশী, মকর, শ্রীবৎসচিহ্ন, খড়্গী (গণ্ডার), মহিষ, শূকর, শ্যেন, বজ্র, মৃগ, ছাগ, নন্দাবর্ত, ঘট, কূর্ম, নীলোৎপল, শঙ্খ, ফণী এবং সিংহ।

আলোচ্য সাতচক্র গুম্ফাটি পূর্বমুখী। গুহায় প্রবেশ করে সম্মুখের প্রাচীরে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রাচীরে) ষোলোটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যাবে। ডানদিকের দেওয়ালে (দক্ষিণ প্রাচীরে) এবং বামদিকের দেওয়ালে (উত্তর প্রাচীরে) চারটি করে মূর্তি আছে। দক্ষিণ দিক থেকে যদি মূর্তিগুলিকে আমরা চিহ্নিত করি তবে বলব—দক্ষিণ প্রাচীরে আছে মূর্তি নং 1-4, পশ্চিম প্রাচীরে 5-20 এবং উত্তর প্রাচীরে মূর্তি নং 21-24। এর ভিতর যে মূর্তিগুলির প্রতীক-চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না সেগুলি হচ্ছে মূর্তি নং 11, 13, 14, 15, 16, 17 এবং 23। তবু যেগুলি আন্দাজে ভরা যায়। আমি যেভাবে তাদের পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছি তা এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম :

প্রতীক	গুহায় মূর্তিসংখ্যা	অবস্থান প্রাচীর
ঋষভ	1	দক্ষিণ
হস্তী	2	ঐ
অশ্ব	3	ঐ
বনমানুষ	4	ঐ
ক্রৌঞ্চ	5	ঐ
পদ্ম	6	ঐ
স্বস্তিকা	7	ঐ
অর্ধচন্দ্র	8	ঐ
কুম্ভীর	14	ঐ
শ্রীবৎস চিহ্ন	11	ঐ
গণ্ডার	23	উত্তর
মহিষ	12	পশ্চিম
শূকর	13	ঐ

	নাম	জন্মস্থান	প্রতীক	গুহায় মূর্তিসংখ্যা	অবস্থান প্রাচীর
14	অনন্তনাথ	অযোধ্যা	শ্যেন	9	পশ্চিম
15	ধর্মনাথ	রত্নপুরী	বজ্র	10	ঐ
16	শান্তিনাথ	হস্তিনাপুরী	হরিণ	16	ঐ
17	কুন্থনাথ	ঐ	ছাগল	17	ঐ
18	অরনাথ	ঐ	নন্দাবর্ত	18	ঐ
19	মল্লিনাথ	মথুরা	কলস	19	ঐ
20	মুনিসুব্রত	রাজগৃহ	কূর্ম	21	উত্তর
21	নামিনাথ	মথুরা	নীলপদ্ম	20	পশ্চিম
22	নেমিনাথ	সৌরীপুর	শঙ্খ	22	উত্তর
23	পার্শ্বনাথ	কাশী	সর্প	15	পশ্চিম
24	বর্ধমান মহাবীর	কুন্দগ্রাম	সিংহ	24	উত্তর

এর ভিতর আটটি স্থানক বা দণ্ডায়মান মূর্তি, বাকি ষোলোটি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দণ্ডায়মান আটটি মূর্তির দু' পাশে চামরধারী সেবকমূর্তি, উপরে দুটি করে গন্ধর্ব। কোথাও কোথাও পদতলে নাগ-



চিত্র—3·3 গণেশ গুম্ফার স্তম্ভ।

নাগিনী বা শ্রমণদের মূর্তি খোদাই করা। কৈশোরে যাঁরা কিশোর-পত্রিকায় ধাঁধার পাতাটি নিয়ে সময় কাটাতেন তাঁরা নিজেরাই প্রতীক-চিহ্ন দেখে দেখে মূর্তিগুলিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন—জিগ্‌স-ধাঁধা সমাধানের আনন্দ পাবেন।

অনন্ত-গুম্ফা, নবমুনি ও সাতবক্র গুহাগুলি একটি বৃহদায়তন জৈনমন্দিরকে চক্রাকারে ঘিরে আছে। যদিও এটি মাত্র আজ থেকে দু'শ বৎসর পূর্বে নির্মিত, তবু এই পর্যায়েই তা উল্লেখ করা গেল। এই মন্দিরের পশ্চিমে নাকি একটি বৌদ্ধ স্তূপও ছিল—আমি সেটির সন্ধান পাইনি।

এবার শেষ পর্যায়ের দুটি গুহার প্রসঙ্গে আসা যাক। সে দুটি উদয়গিরিতে।

গণেশ-গুম্ফা : উদয়গিরির উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, বস্তুতঃ উদয়গিরি পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে গণেশ-গুম্ফার অবস্থিতি। এটি একটি একতলা গুহা, প্রায় 9.14 মিটার লম্বা এবং 3 মিটার গভীর। সম্মুখে একটি বারান্দা, তাতে পাঁচটি স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধ-স্তম্ভ (pilaster)। গুহাটি আবিষ্কারের সময়ে দক্ষিণ-দিকের দুটি স্তম্ভকে ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল—পুরাতত্ত্ববিভাগ সে দুটি পুনরায় তৈরী করেছেন ; কিন্তু প্রাচীন যুগের যে-দুটি স্তম্ভ টিকে আছে সে দুটিকে আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে পারি। এই স্তম্ভগুলির কোন পাদদেশ (base) নেই। মাঝখানে কিছুটা অংশ বিষ্ণুকাণ্ড (অর্থাৎ আট-কোনা, octagonal), তার উপর ও নিচের অংশ ব্রহ্মকাণ্ড (চতুষ্কোণ, square)। স্তম্ভশীর্ষ (abacus) বলে কিছু নেই—তার দু-প্রান্তে দুটি নক্‌শা-কাটা ব্র্যাকেটে নারীমূর্তি। লক্ষণীয় যে, নিচের চতুষ্কোণ ব্রহ্মকাণ্ডের ধারগুলি মাটি থেকে লম্বভাবে বা খাড়াভাবে ওঠেনি ; কাণ্ডটি অল্পভাবে মোটা থেকে সরু হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ এখানকার অধিকাংশ স্তম্ভই এই জাতের। স্তম্ভ দেখেই পশ্চিমখণ্ডের বিভিন্ন জাতের স্থাপত্যের জাত নির্ণয়

সম্ভব, ভারতীয় স্থাপত্যে সে সুবিধা নেই—তবু বলতে পারি, উদয়গিরি-খন্ডগিরির এই স্তম্ভগুলির বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। সমসময়ে নির্মিত বৌদ্ধ স্থাপত্য-কীর্তি, যথা . ভাজা-কনডেন-কান্হেরী, অজন্তা, ভারহুত-সাঁচীতে এ জাতের স্তম্ভ দেখা যায় না। তাই এই বিশেষ জাতের স্তম্ভের একটি নক্‌শা চিত্র —3.3-এ সংযোজন করা গেল। বারান্দার পিছনে পাশাপাশি দুটি কক্ষ, প্রত্যেকটিতে দুটি করে প্রবেশ-দ্বার। তার উপরে জমির সমান্তরালে ফ্রিজ-অংশে নানান ধরনের মূর্তি ও নক্‌শা। এর ভিতর দুটি অংশে মনে হয় দুটি চিত্র-কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে—যেমন চিত্র-কাহিনী দেখেছি সমসাময়িক সাঁচীর তোরণে অথবা অজন্তার নবম-দশম গুহার আলেখ্যে! বিশাল ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও মূর্তি-গুলির আকৃতিতে, বেশভূষায় এবং অল্‌টো-রিলিভো উপস্থাপনের কায়দায় বেশ একটা সাযুজ্য অনুভব করা যায়। মূর্তিগুলির নিচে দিয়ে জমির সমান্ত-রালে 'থভ' ও 'সূচী'-র নক্‌শা সাঁচী ও ভারহুতের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আশ্চর্য সাদৃশ্য।

প্রথম চিত্রটি দেখে মনে হয়, কোন একজন রাজা সসৈন্য শিকারে যাচ্ছেন। দেখছি, রাজা একটি হরিণকে বধ করবার জন্য শরসন্ধান করছেন। হরিণটি কিন্তু সাধারণ হরিণ নয়, সে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। কারণ, তার দুটি পাখা আছে। পরবর্তী দৃশ্যে দেখেছি—রাজা বিস্ময়াহত, হরিণটি তাঁর পদতলে বসে আছে এবং একজন বনদেবী রাজাকে কিছু বলছেন। জানি না, শিল্পীর বক্তব্য বিষয়টি কী ছিল ; কিন্তু এ চিত্রের সঙ্গে শরভ-জাতক কাহিনীর বেশ মিল আছে। শরভ জাতকেও রাজা হরিণ শিকার করতে গিয়েছিলেন ; সেখানে হরিণটি ছিল স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সেখানেও বনদেবী রাজাকে নিষেধ করেছিলেন। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন এ গুহা বৌদ্ধ গুহা নয়—কিন্তু জাতকের গল্প কি সে যুগে সার্বজনিনতা লাভ করেনি ? জানি না।

দ্বিতীয় চিত্রটিকে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় সনাক্ত করেছেন[12] অনাদিকালের লোকগাথা উজ্জয়িনীর বাসবদত্তা কাহিনীর সঙ্গে, যে কাহিনী যুগে যুগে উজ্জয়িনীর কথাকোবিদ বৃদ্ধরা বলে গেছেন (কালিদাসের মেঘদূত স্মর্তব্য)। আচার্যের মতে এ কাহিনীতে আমরা দেখছি কোশলরাজ উদয়নের সাহায্যে উজ্জয়িনীর রাজকন্যা বাসবদত্তার পলায়ন কাহিনী। কাহিনীর চারটি অংশ, বাম থেকে দক্ষিণে পর পর সাজানো। সর্ববামে দেখছি—হস্তি-পৃষ্ঠে কোশলরাজ উদয়ন, নায়িকা বাসবদত্তা এবং উদয়নের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজপ্রাসাদ থেকে পলায়ন-পর। আরও দেখছি—উজ্জয়িনী রাজার সৈন্যদল রাজকন্যার অপহরণে বাধা দিতে এসেছে। উদয়ন দুইভাবে এ বাধা অতিক্রম করছেন—প্রথমতঃ, তর-বারির সাহায্যে ; দ্বিতীয়তঃ, কিছু স্বর্ণমুদ্রা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বাধাদানকারী অর্থগৃধ্নু সৈনি-কেরা স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে হুড়মুড়িয়ে।

পরবর্তী দৃশ্যটিতে দেখছি—হস্তী এসে পৌঁচেছে কোশলনগরীতে (চিত্র—3·4)। হাতিটি নতজানু হয়ে বসেছে। আরোহীরা অবতরণ করেছেন এবং রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এ দৃশ্যে বাসবদত্তার হাতে একটি বীণা (মূল কাহিনীতে এই বীণাটিই ছিল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু। উদয়ন বাসব-দত্তার সান্নিধ্যে এসেছিলেন বীণা বাজানো শেখাতে গিয়ে)। শেষ দৃশ্য—দক্ষিণতম অংশে দেখছি, কোশল-রাজ এবং বাসবদত্তা নিভৃতে আলাপনরত।

শিল্পবস্তুটির এই সনাক্তিকরণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে বলতে হবে এটিই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ (secular) প্রথম কাহিনী-চিত্র। কারণ সাঁচী-ভারহুত-অজন্তার সমসাময়িক কাহিনীগুলি হয় জাতক থেকে সঙ্কলিত, অথবা বুদ্ধের জীবনী থেকে। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী কোন ব্রতকথা নয়, নেহাতই গল্প-কথা !

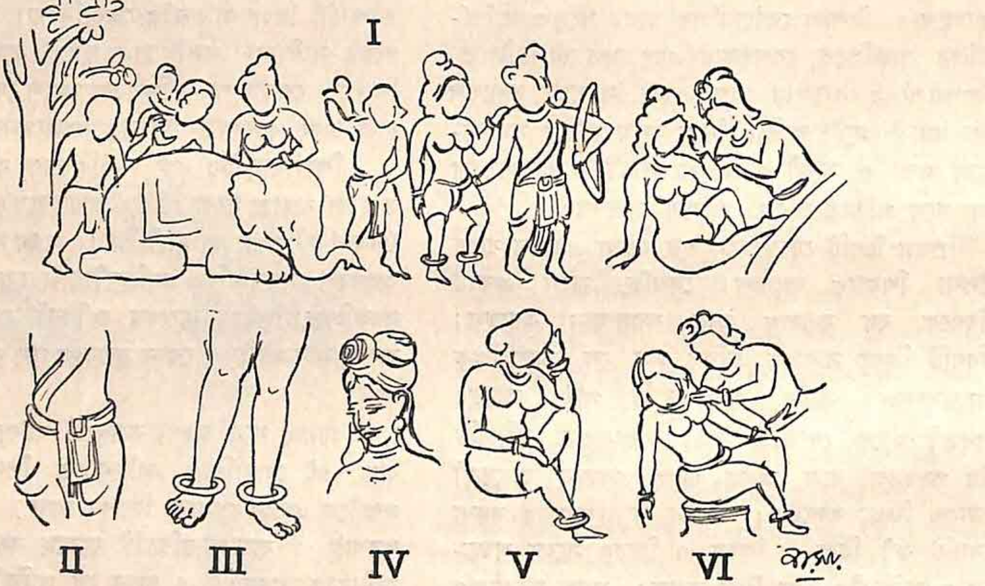
আমার মনে অবশ্য কয়েকটি খটকা আছে। প্রথম কথা, এই রোমাণ্টিক কাহিনীতে শিল্পী উদয়নের মন্ত্রীকে এতটা প্রাধান্য দিলেন কেন ? প্রথম তিনটি দৃশ্যেই ঐ বাহুল্য-চরিত্রটি রয়েছে আমাদের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে। এ ছাড়া যে মূর্তিটিকে আচার্য সুনীতিকুমার উদয়নের সেনাপতি বলে চিহ্নিত কর-ছেন সেটি আকারে ছোট—যেন কিশোরের মূর্তি। তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় দৃশ্যে নায়িকার কাঁধে এবং তৃতীয় দৃশ্যে ঐ কিশোরের কাঁধে যেন আর একটি শিশুর মূর্তি রয়েছে। সেই শিশুটি কে ? চতুর্থতঃ, শেষ দৃশ্যে নায়িকার মূর্তিটি, তার বসার ভঙ্গি যেন বিষাদগ্রস্তার। আর নায়ক যেন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ! এইগুলি বাসবদত্তা-উদয়ন কাহিনীর সঙ্গে তো খাপ খায় না !

এজন্য আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এটা বিশ্বান্তর জাতকের কাহিনী নয় তো ? জাতক-কাহিনী অনু-সারে—রাজপুত্র বিশ্বান্তর ছিলেন দানবীর। একবার কলিঙ্গদেশে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। কলিঙ্গবাসীদের দুঃখে রাজপুত্র রাজহস্তিটিকে দান করে দেন। দেশ-

বাসী আপত্তি জানায় কিন্তু রাজপুত্র বিশ্বান্তরের সহায়তায় কলিঙ্গবাসীরা হস্তিটিকে নিয়ে নিজ দেশে পলায়ন করে। এজন্য ক্ষুব্ধ হয়ে প্রজাবৃন্দ মহারাজের কাছে রাজপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং রাজা সঞ্জয় পুত্রের নির্বাসন দণ্ড দেন। দানবীর বিশ্বান্তর স্ত্রী মাদ্রী, পুত্র কাহ্নজিন ও শিশুকন্যা কৃষ্ণাকে নিয়ে বনবাসে চলে যান। সেখানে একদিন যখন মাদ্রী বনফল আহরণে অন্যত্র ব্যস্ত তখন এক-জন ব্রাহ্মণ এসে বিশ্বান্তরের কাছে ভিক্ষা চায়। বিশ্বান্তর অনন্যোপায় হয়ে নিজ পুত্রকন্যাকে দান করে বসেন। দিবাবসানে বনফল আহরণ করে ফিরে এসে মাদ্রী এ সংবাদ পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

জিনের স্কন্ধে কৃষ্ণা এবং শেষ দৃশ্যে বিষাদগ্রস্তা মাদ্রীকে বিশ্বান্তরের সান্ত্বনাদানের প্রয়াস। এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য একাধিক আপত্তির কারণ আছে। প্রথমতঃ, বিশ্বান্তর হস্তিপৃষ্ঠে বনযাত্রা করেননি, করেছিলেন রথে; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষজ্ঞদের মতে এটি জৈন গুহা—বৌদ্ধ গুহা নয়, ফলে জাতক কাহিনী এখানে চিত্রিত হবার সম্ভাবনা অল্প।

কাহিনীটি যাই হোক না কেন একটা কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। গণেশ-গুম্ফা খননের প্রায় সমসময়ে, (অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই) হয়ত বা বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর আগে-পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তে শিল্পীরা যে শৈলীতে, যে স্টাইলে



চিত্র—3.4 গণেশ গুম্ফার অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য।

I—গণেশ গুম্ফার অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য-কাহিনীর শেষাংশ
II—ভারহুতে কুবের যক্ষের কোমরবন্ধ (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)
III—সাঁচী উত্তর-তোরণে বৃক্ষিকার পায়ের মল (ঐ)
IV—অজন্তা দশমগুহায় রাজার শিরোভূষণ (ঐ)
V—ঐ বিষাদগ্রস্তা কাশীরাজ মহিষী, ছদ্দন্তজাতক (ঐ)
VI—ঐ রাজা কর্তৃক রানীকে সান্ত্বনাদান, (ঐ) (ঐ)

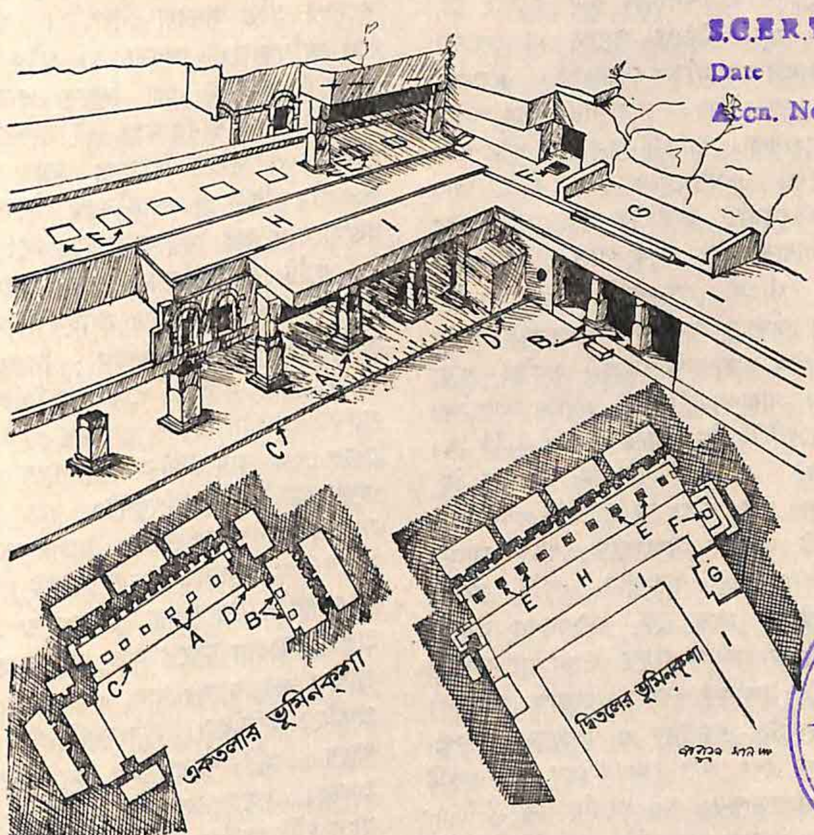
বিশ্বান্তর কী সান্ত্বনা দেবেন ভেবে পান না। এ কাহিনীটি আমার 'অজন্তা-অপরূপা' গ্রন্থে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি। আলোচ্য শিল্পকর্মটি যদি বিশ্বান্তর জাতক কাহিনী হয় তাহলে বলব, প্রথম দৃশ্যে দেখছি, কলিঙ্গবাসী কর্তৃক রাজহস্তীর অপ-হরণ। দ্বিতীয় দৃশ্যে পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী সমভি-ব্যাহারে বিশ্বান্তরের বনযাত্রা। তৃতীয় দৃশ্যে কাহ্ন-

চিত্র এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন তাদের পরস্পরের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আলোচ্য প্যানেলের পুরুষ মূর্তি—তিনি উদয়নই হন অথবা বিশ্বান্তরই হন—যে ডিজাইনের শিরোভূষণ ধারণ করেছেন ঠিক ঐ ধরনের শিরস্ত্রাণ পরতেন ভারহুতের যক্ষ অথবা অজন্তা দশম গুহায় কাশীরাজ। এখানকার মেয়ে-টির পায়ের মল যে স্যাঁকরা বানিয়েছিল সেই যেন

কপিলাবস্তু-মহিষীর (সাঁচী উত্তর-তোরণে তৃতীয় প্যানেলে, যেখানে শুদ্ধোধন ও মহাগৌতমী এসেছেন নগ্রোধারাম বিহারে তথাগত দর্শনে) পায়ের মলটি বানিয়েছিল এবং বানিয়েছিল কাশীরাজমহিষীর চরণ নূপুর (অজন্তা দশমগুহা, ষড়দন্ত জাতক)। উদয়গিরির রাজপুরুষ আর ভারহুতের কুবের যক্ষ কি একই ভঙ্গিতে কোমরবন্ধ বাঁধতেন? অজন্তা দশমগুহায় ষড়দন্ত জাতকে কাশীরাজ যে ভঙ্গিতে মূর্ছাতুরা মহিষীকে ধরতে চেয়েছিলেন, এখানেও শেষ দৃশ্যে নায়কের হুবহু সেই ভঙ্গি। অজন্তা সপ্তদশগুহায় (অনেক পরবর্তী যুগে) বিশ্বান্তর জাতকে বিষাদগ্রস্তা মাদ্রীর ভঙ্গিমার সঙ্গে এবং দশমগুহায় (সমসময়ে) মহিষীর ভঙ্গিমায় সঙ্গে এই প্যানেলের শেষদৃশ্যে নায়িকার ভঙ্গিটিও তুলনীয় (চিত্র—3.4)।

না। অথচ সাদৃশ্যগুলিও একেবারে কাকতালীয় বলে মনে হয় না। কেমন করে এমনটা হল?

রানী-গুম্ফা : অজন্তাতে আমরা দেখেছি, প্রথম যুগে বৌদ্ধ শ্রমণেরা একটি মাত্র চৈত্য এবং একটি মাত্র বিহার তৈরী করেছিলেন ; কিন্তু কালে যখন ক্রমাগত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল ওখানে আসতে শুরু করেন তখন ওঁরা আরও চৈত্য, আরও বিহার নির্মাণ করতে বাধ্য হন। উদয়গিরিতেও মনে হয় সেই একই কারণে রানী-গুম্ফাটিকে খনন করতে হয়েছিল। চিত্র—3.1-তে দেখতে পাচ্ছি ইতিপূর্বে খোদাই করা গুম্ফাগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে যেন রানী-গুম্ফাকে ঘিরে রেখেছে। অর্থাৎ ওদের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত এই গুহাটি ছিল বিশেষ প্রয়োজনে শ্রমণ-



চিত্র—3.5 রানী গুম্ফার বাস্তুনকশা।

এই শিল্পনিদর্শনগুলি প্রায় সমসাময়িক হলেও এদের ভৌগোলিক দূরত্ব এত বেশী যে, সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক শিল্পী অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায়

দের সম্মিলিত হবার স্থান। বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে যেমন চৈত্যে শ্রমণরা পূজা করতে আসতেন এবং বিহারে বাস করতেন, বোধকরি তেমনিভাবে এই জৈন সন্ন্যাসীরা অর্ধচন্দ্রাকার গুহাগুলিতে বাস করতেন

এবং রানী-গুম্ফাতে সমবেত হতেন সম্মিলিত উপাসনার উদ্দেশ্যে। সেজন্যই এই রানী-গুম্ফার মাঝখানে একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। স্বর্গপুরী অথবা জয়বিজয় গুহাতেও এ রকম প্রাঙ্গণ ছিল ; মনে হয়, শ্রমণদের সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়ার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রাঙ্গণের প্রয়োজন অনুভূত হল—এবং সেজন্যই রানী-গুম্ফার এই প্রাঙ্গণ-কেন্দ্রিক বিচিত্র রূপ।

গুহামন্দিরটি দ্বিতল। উপরতলার বারান্দাটি প্রায় 19 মিটার লম্বা। এতে ছিল নয়টি স্তম্ভ। পশ্চিমদিকের দুটি স্তম্ভ ছাড়া সবগুলিকেই ভগ্নাবস্থায় পাওয়া যায় ; পুরাতত্ত্ব-বিভাগ সেগুলিকে নূতন করে তৈরী করেছেন। অজন্তাতে বা বুদ্ধগয়াতে যে ভুল করা হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে এখানে পুরাতত্ত্ববিভাগ সে ভুল করেননি। উপরোক্ত দুই স্থানে মেরামতের কাজ এমনভাবে করা হয়েছে যে, সাধারণ দর্শক বুঝে উঠতে পারেন না—কোনটা আদিমরূপ, কোনটা মেরামতির কেরামতি। এ-ক্ষেত্রে সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বারান্দার পরে পাশাপাশি চারটি গুহাকক্ষ। প্রতিটি ঘরে দুটি করে দ্বার —বারান্দার দিকে। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার নেই। বস্তুতঃ কোনও ভারতীয় গুহাতেই এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার দ্বার, যাকে বলি intercommunicating door, সে-জাতীয় দ্বার নেই। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়, অজন্তায়, ইলোরাতে অমন অসংখ্য পাশাপাশি গুহা-কক্ষ আছে ; সর্বত্রই শুধু একদিকে দরজা—বারান্দার দিকে। এখানে ঘরগুলির মাপ 4.57 মি×2.75 মি, উচ্চতাও মাত্র 1.34 মি। দরজাগুলি ছোট ; প্রায় 120 সে. মি.×60 সে. মি., ঐ টানা বারান্দার দুই প্রান্তে আরও দুটি কক্ষ আছে এবং বারান্দাটি দুদিকে সমকোণে বেঁকে গেছে। দ্বিতলে পূর্ব-প্রান্তের বারান্দায় একটি প্রশস্ত প্রস্তরাসন আছে। মনে হয়, মাঝখানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যখন কোন অনুষ্ঠান হত তখন প্রধান শ্রমণ প্রস্তরাসনে (G) উপবিষ্ট হয়ে তা প্রত্যক্ষ করতেন।

গুহামন্দিরটির একতলা ও দ্বিতলের বাস্তু-নক্শা (প্ল্যান) এবং 'ক-খ' রেখায় ছেদ করা একটি সেক্শানাল এলিভেশানও যুক্ত করেছি চিত্র—3·5-এ।

মাঝখানের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির মাপ 15 মি×7.3 মি। আগেই বলেছি, একতলার খোলা ছাদ ও স্তম্ভগুলি কালে ভেঙে যায়। তখন ঐ বিধ্বস্ত অংশটি কাঠের কড়ি-বরগা, স্তম্ভ দিয়ে মেরামত করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে কাজের অবশ্য চিহ্ন-মাত্র অবশিষ্ট নেই, না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ কাঠ দু-হাজার বছর ধরে অবিকৃত থাকে না। কিন্তু কাঠের কড়ি একতলার যে অংশে নিজভার ন্যস্ত করত সেখানে পাথরে যে গর্তগুলি করা হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও আছে। ফলে ঐ অংশের ভাস্কর্যও নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতলের ঐ অংশের ভাস্কর্য কিন্তু অক্ষত রয়েছে। এবার ঐ ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক।

অন্যান্য গুহায় যেমন ফুল-লতা-পাতা, রেলিং, নাগ-নাগিনী বা একক মূর্তি ইত্যাদি দেখেছি, এখানেও তা আছে—এ ছাড়াও কতকগুলি ভাস্কর্য-বিন্যাসে বেশ বোঝা যায়, শিল্পী কী-যেন একটা কাহিনী বলতে চান। অজন্তা-ম্যুরালে যেমন দেখেছি বুদ্ধের জীবনী অথবা জাতকের কাহিনী।

কাহিনীগুলির বক্তব্য যাই হোক না কেন এ গুহা এবং গণেশ-গুম্ফার ভাস্কর্যগুলি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের অতি অনবদ্য নিদর্শন। যাকে ইংরেজিতে বলে ক্লাসিকাল। পারস্য বা গ্রীক শিল্পের ছাপ এদের উপর নেই—এরা নিছক ভারতীয় শিল্পের নমুনা। ফার্গুসনের মতে এই ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলি ভারহুত ও সাঁচী শিল্পের অগ্রজ এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।[13] যদিও বর্তমানে এ মত আর মানা চলে না।

দুটি বাস-রিলিফ বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। শিল্পীর কথিত কাহিনীটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা নানা পণ্ডিত করেছেন ; কিন্তু সে-কথা বলার পূর্বে আরও বলি, এ-দুটি বাস-রিলিফ ছাড়া রানী-গুম্ফায় তৃতীয় একটি ভাস্কর্যের নমুনা আছে যা থেকে বোঝা যায় খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেও কলিঙ্গের এই একান্তবাসী গুহা-শিল্পীর দল বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। তাঁদের সমসময়ে এবং কিছুকাল পূর্ব থেকেই গ্রীক, ব্যাক্ট্রিয়ান ও পারসীক শিল্পধারা উত্তরখণ্ডে গান্ধার শিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। সেই উত্তর-পশ্চিম বায়ুকোণের বায়ু এই সুদূর কলিঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়েছিল। সিংহবাহিনী নারী মূর্তিটির পাশে একটি দ্বারপালের মূর্তিতে দেখছি সেই প্রভাব। দ্বারপালের পায়ে জুতা ও মোজা, পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক-জাতীয় কুর্তা, মাজায় কোমরবন্ধ এবং বাম কটিবন্ধে যে তরবারি ঝুলছে তা ভারতীয় বঙ্কিম কৃপাণ নয়, ঋজু রোমক তরবারি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্রাট অশোক তাঁর বেতনভুক্ত সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রীক ও ব্যাক্ট্রিয়ান সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের সময় নিঃসন্দেহে এ

জাতীয় বিদেশী সৈন্য হাজারে হাজারে কলিঙ্গদেশে এসেছিল এবং হয়তো তোশলীতে মগধরাজ-প্রতিনিধির সেনাবাহিনীতেও ছিল। ফলে পূর্ব-প্রান্তবাসী কলিঙ্গ শিল্পীর পক্ষে ঐ বিজাতীয় সৈনিকের আকৃতি বা সাজ পোশাক অজানা ছিল না।

এবার ঐ অর্ধোত্থিত (half relief) কাহিনী দুটির কী ব্যঞ্জনা তা বুঝে নেবার চেষ্টা করা যাক। প্রথমটিতে দেখতে পাচ্ছি একটি সিংহবাহিনী নারী মূর্তি, রাজা খারবেল ও তাঁর পত্নী ও কতকগুলি হাতীর ভাস্কর্য। এ-ছাড়াও বারান্দার 'ফ্রিজ' অংশে শিল্পী কী যেন একটা কাহিনী বলতে চান, যার অর্থ স্পষ্ট নয়—ইঙ্গিতটা মর্মভেদী! একই কাহিনী দুটি বিভিন্ন অংশে খোদাই করা। প্রথমে দেখছি, একজন পুরুষ নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছেন এবং একজন রমণী তাঁর চরণপ্রান্তে সেবারতা। এ-দুটি মূর্তির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন—নিতান্ত একটি মামুলী দাম্পত্য চিত্র। ইচ্ছামত আপনি ঐ পুরুষ-রমণীর নামকরণ করতে পারেন—বলতে পারেন, ওরা দুজন চিত্রকূট পর্বতে শ্রীরামচন্দ্র-সীতা অথবা 'গৃহদাহে' অচলা-মহিম ; কিম্বা 'ঘরে বাইরে'র ঘরে বিমলা-মহেন্দ্র। এরপরই দেখছি, 'শাশ্বত-ত্রিকোণ' নাটকে তৃতীয় চরিত্রের আবির্ভাব—দ্বিতীয় একজন পুরুষ। নায়িকাই তাকে হাতে ধরে নিয়ে আসছে—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে নিশ্চিন্ত-নির্ভর স্বামীর সঙ্গে। অচলা অথবা বিমলা যেমন স্বামীর বন্ধুর প্রতি আতিথেয়তায় কার্পণ্য করেনি। তার পরের দৃশ্যটাকে আমি যদি প্রতীকী বলে মনে করি তাহলে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। চাক্ষুষ দেখছি—একটি নারী ও একটি পুরুষ মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ করছে। আমার তো মনে হয়েছে, এ দৃশ্যে নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রস্ফুটিত। নবাগত নায়কের আকর্ষণে ওই ভাবেই কি অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়নি 'গৃহদাহের' অচলা অথবা 'ঘরে বাইরে'-র মক্ষিরানী? এ দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনিবার্য পরিণামটি খোদাই করা হয়েছে পরবর্তী দৃশ্যে—যেখানে দেখছি, নবাগত পুরুষটি সবলে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাহিরে আমাদের হতভাগিনী নায়িকাকে।

অতি ক্ষুদ্র একাঙ্ক নাটিকা—কিন্তু নিঃসন্দেহে সে বিয়োগান্ত নাটক স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ চিত্র-কাহিনীর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। এক-এক পণ্ডিত এক-এক অনুমান-নির্ভর ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'আর্তবল্লভ-মহান্তি' বক্তৃতায় যা বলছেন তার বঙ্গানুবাদ :

"গল্পটিকে কি এভাবে সাজানো যায়? সিংহল দ্বীপে যক্ষিণীদের একটা বদনাম ছিল যে, তারা পথহারা নাবিকদের আহ্বান করে নিজ আবাসে নিয়ে যেত এবং অতিথি সৎকারের নামে তাদের আপ্যায়ন করে ঘুম পাড়িয়ে হত্যা করত। অতিথির নরমাংসে রাক্ষসীরা উদরপূর্তি করত! প্রথম দৃশ্যটি মনে করা যেতে পারে তারই একটি প্রতিচ্ছবি। সুখসুপ্ত নাবিকের পাশে তার রক্তলোলুপ নায়িকার প্রতীক্ষা! দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখছি, দ্বিতীয় একজন নাবিক ঐ একইভাবে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে আসছে রাক্ষসী গৃহস্বামিনীর হাত ধরে! কিন্তু এই দ্বিতীয় নাবিক সহসা যক্ষিণীর চাতুরী ধরে ফেলে এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। শেষ দৃশ্যে দেখছি, মায়াবিনী রাক্ষসীকে পরাভূত করে নাবিক তাকে অপহরণ করছে—নিয়ে যাচ্ছে নিজ রাজ্যে। এ জাতীয় কাহিনী বৌদ্ধ শাস্ত্রে একাধিক আছে—যথা : মহাবংশে সিংহল বিজয় অথবা জাতকের 196 নং কাহিনীটি।

"সে যাই হোক, স্বীকার করতেই হবে, এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর।"[14]

কেউ কেউ বলছেন, এ চিত্র-কাহিনীর বিষয়বস্তু হচ্ছে কলিঙ্গের যবনরাজ কর্তৃক প্রভাবতীদেবীর অপহরণ এবং ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ কর্তৃক বন্দিনী দশা থেকে তাঁর উদ্ধার কার্য[15]।

আমরা গবেষক নই, রসপিপাসু ; তাই আমাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন খাতে বইতে পারে।

দেখছি, মূর্তিগুলি দু-হাজার বৎসরের প্রাচীন—মহাকালের নির্মম কশাঘাতে মূর্তিগুলির সৌন্দর্য, তাদের কমনীয়তা, মাধুর্য ম্লান হয়ে গেছে, ক্ষয়িত হয়ে গেছে। তবু যেন ঐ অবহেলিত প্রাচীর-গাত্রে তিনটি কুশীলব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতীক্ষা করে আছে আপনার দু-ফোঁটা চোখের জলের প্রত্যাশায়। আমাদের তো মনে হয়েছে এ কাহিনীর বক্তব্য বিনা ব্যাখ্যাতেই সোচ্চার :

"স্পষ্ট করে দেখিনে আজ, ছবিটা তার ফিকে।
মনের মধ্যে বেঁধে না তার ছুরি,
সময় তাহার ব্যথার মূল্য সব করেছে চুরি।
বিয়ের পরে ডাকাত এসে হরণ করল মেয়ে,
এই বারতা ধুলোয়-পড়া শুকনো পাতার চেয়ে
উত্তাপহীন, ঝেঁটিয়ে-ফেলা আবর্জনার মতো।"[16]

আমার তো মনে হয়েছে, ঐ মূর্তিগুলি খোদাই হবার দু-হাজার বছর পরে এক কবি যেমন কোন এক বামুনমারা দিঘির ঘাটে পাকুড়তলির মাঠে বসে আদি-বিশ্ব ঠাকুরমায়ের ঝিম্‌ঝিমানি সুরে শুনতে পেয়েছিলেন অনাদিকালের সেই গ্রাম্য ছড়াটিতে—'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে, সুন্দরীকে বিয়ে দিলেম ডাকাত দলের মেলে।'—ঠিক তেমনি দু-হাজার বছর আগের কোন শিল্পী অমনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন আজকের দুনিয়ার একটি মর্মান্তিক সামান্য ঘটনা। ছেনি-হাতুড়ি হাতে তিনিও অনুভব করেছিলেন 'হঠাৎ দেখি বুকে বাজে টন্‌টনানি, পাঁজরগুলোর তলায়-তলায় ব্যথা হানি।' তাই আমি মেনে নিতে পারিনি যে, ঐ মেয়েটি সিংহলের কোন মায়াবিনী রাক্ষসী। আমার চোখে ও এ-যুগের আমাদের 'পাড়ার কালো মেয়ে'—'ঝুড়ি ভ'রে মুড়ি আনত, আনত পাকা জাম, সামান্য তার দাম, ঘরের গাছের আম আনত কাঁচামিঠা' কবি যাকে 'আনির বদলে ভুলে চার-আনিটা' দিয়ে বসতেন! দেখছি, অন্ধ কলু-বুড়ির সমর্থ নাতনীটিকে কোন্ গোঁয়ার খুনি কেড়ে নিয়ে ভাগছে! বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় অধ্যাপকের শাস্ত্রীয়-ব্যাখ্যা আমরা মানতে না পারলেও নিশ্চয় তিনি ক্ষুব্ধ হবেন না—কারণ তাঁর গুরুই তো বলে গেছেন :

"শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে,—
উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার, বাজে আকাশ জুড়ে।
অনেক কালের শব্দ আসে ছড়ার ছন্দে মিলে—
ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে॥"

দু-হাজার বছর ধরে খালে-বিলে ঢাকিরা এই আসুরিক ক্ষমতার জয়ঢাক বাজিয়েই চলেছে—আর রাজশক্তির বুড়ো হাতী গলার ঘণ্টা ঢনঢনিয়ে অন্যমনস্কভাবে তার পাশ দিয়ে চলে গেছে! হয়তো সেই শাশ্বত নারীর চিরন্তন অবমাননার একটি দলিল ঐ পাথরের গায়ে আঁকা হয়ে আছে মহাকালের খাতায়!

□



কলিঙ্গ-স্থাপত্যের মৌল-পরিচয়

কলিঙ্গ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য :

নাগর-স্থাপত্যের আদিগুরু বাস্তুশাস্ত্রম্-প্রণেতা বিশ্বকর্মার যে উত্তরসূরী কলিঙ্গ-স্থাপত্যের আদি-রূপকার তাঁর নাম আমরা জানি না। আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মতো এটিও গুরুমুখী-বিদ্যা ; এক-এক অঞ্চলে এক-এক 'ঘরাণা' বংশানুক্রমিকভাবে অনুসৃত। পুরী-ভুবনেশ্বর-কোনার্কের ত্রিকোণ-ভূখণ্ডে প্রায় সহস্রাব্দিকাল যে শিল্পগুরুর দল যুগে যুগে নাগর-স্থাপত্যে কলিঙ্গ-রীতির বিশেষ ধারাটি রূপায়িত করলেন—'রেখ-পীড়-কাখর' শিখরের পরিকল্পনা করলেন, ত্রিরথ-পঞ্চরথ-সপ্তরথ বাস্তু-নক্শার আমদানী করলেন, মন্দির 'ফাসাদ'-এ পাগ-ভাগের সুষমছন্দ আরোপ করলেন, তাঁদের পরিচয় ইতিহাস ধরে রাখেনি। ইতিহাস যেন শুধু রাজ-বংশের কীর্তি-অপকীর্তির সূচী। তাই পুরী-মন্দিরের তালপাতায় লেখা মাদলাপঞ্জীতে শুধু রাজন্যবর্গের ক্লান্তিকর দীর্ঘ-তালিকা। সুপণ্ডিত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (1901—1972) বহু পরিশ্রমে খান-ছয়েক হাতে-লেখা পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন, যাতে কলিঙ্গ-স্থাপত্যের কিছু কিছু নির্দেশ আছে। তার ভিতর 'ভুবন-প্রদীপ'ই প্রধান। এই ছয়খানি পুঁথি থেকে সার সঙ্কলন করে তিনি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন[1]। তাঁর পূর্ববর্তী বাঙালী বাস্তুকার শ্রীমনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় উড়িষ্যা-স্থাপত্য বিষয়ে যেসব সূত্র লিপিবদ্ধ করে যান[2], তার সঙ্গে নির্মলবাবুর সঙ্কলিত তথ্যের স্থানে স্থানে প্রভেদ আছে। অপরপক্ষে আদিসূরী রাজেন্দ্রলালের[3] সূত্রগুলির সঙ্গে এই দুই পণ্ডিতের নির্দেশেও যথেষ্ট পার্থক্য। বিস্তারিত আলোচনা শুধুমাত্র ভারতীয়-স্থাপত্যের ছাত্রদের প্রয়োজন হতে পারে। আমরা ঐসব প্রামাণ্য গ্রন্থে যেখানে বিরোধ নেই, এবং মোটামুটি 'ভুবন-প্রদীপ' অনুসরণ করে উড়িষ্যা-স্থাপত্যের মৌলসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ করতে পারি।

রেখ ও পীড়-দেউল :

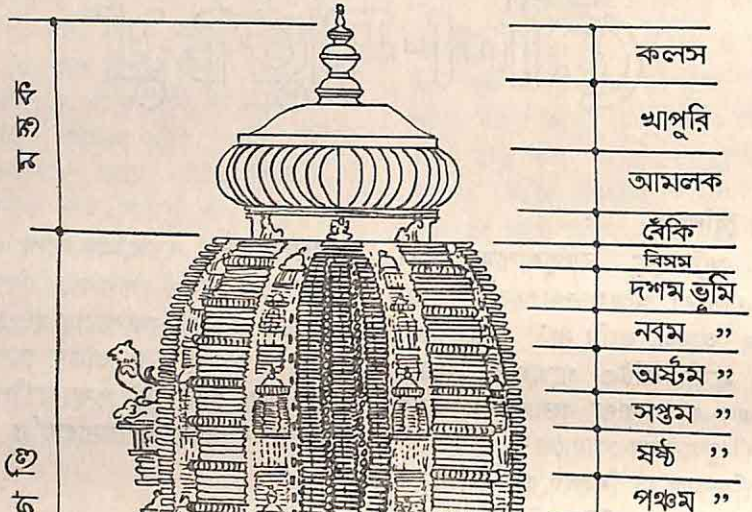
মন্দিরের প্রাণকেন্দ্রটি হচ্ছে গর্ভগৃহ অর্থাৎ যে ক্ষুদ্র কক্ষে দেববিগ্রহটি প্রতিষ্ঠিত। প্রথম যুগে ঐ কক্ষের সম্মুখে একটি দ্বার এবং উপরে মন্দির-চূড়ার গঠন-শৈলীর ভিতরেই মন্দির-স্থাপত্য সীমিত ছিল। ভুবনেশ্বরের আদিম মন্দিরগুলি—আবশ্যিকভাবে শিবমন্দির—শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং (বর্তমানে অবলুপ্ত) রামেশ্বর ছিল এমনই একক দেউল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই দেখা গেল তীর্থযাত্রী সমাগম এত বেশী হচ্ছে যে, ঐ ক্ষুদ্রায়তন মন্দিরে যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব। প্রথমে গর্ভগৃহের সম্মুখে সামান্য একটা কক্ষ বানানোর চেষ্টা হল, যেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী দেবদর্শন করতে পারে—তাকে বলে 'অন্তরাল' ; কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হল না। ফলে, প্রথম জাতের বড় দেউলে—পরশুরামেশ্বরে—যাত্রীদের জন্য একটি পৃথক মণ্ডপ নির্মিত হল। তার ছাদ শিখর-মণ্ডিত বা ঢালু নয় ; সমতল। বস্তুত এ পরিকল্পনা শেষ

চালুক্য বা আদি গুপ্তযুগের অনুকরণ। আইহওল-এর লাদখান অথবা দুর্গা মন্দিরের অনুসরণে। কিন্তু আগেই বলেছি, কলিঙ্গ-শিল্পী অনুকরণে বিশ্বাসী নন ; তাই অনতিবিলম্বে তিনি ঐ গর্ভগৃহ-সংলগ্ন মণ্ডপটির জন্য এক বিশেষ-রীতির দেউল পরিকল্পনা করলেন। 'মণ্ডপ' হয়ে গেল 'জগমোহন' ; গর্ভগৃহ-সমন্বিত মূল-দেউলকে সনাক্ত করতে আমদানী করা হল নূতন একটি শব্দ : 'বিমান'। 'বিমান' অর্থ 'আকাশ'; মূল মন্দিরটি যেহেতু উচ্চতায় বৃহত্তম তাই এই আকাশচুম্বী মন্দিরটির নাম 'বিমান' হওয়া অযৌক্তিক নয়। সাধারণের ভাষায় তা 'বড়-দেউল'। বিমান এবং জগমোহনের স্থাপত্য পৃথক রূপ নিল। এই স্থাপত্য-পরিকল্পনার পশ্চাৎপটে একটি অপূর্ব কবিকল্পনা আছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার পঞ্চান্ন পরিচ্ছেদে একটি নির্দেশ আছে :

"শেষং মঙ্গল্যবিহগৈঃ শ্রীবৃক্ষৈঃ স্বস্তিকৈর্ঘটৈঃ।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লিভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ ॥"

অর্থাৎ শিবমন্দিরে শোভাবর্ধনের আঙ্গিক হিসাবে নিম্নলিখিত নক্শাগুলি থাকা চাই : সর্প, মঙ্গল-চিহ্ন, বিহগ, শ্রীবৃক্ষ, স্বস্তিক-চিহ্ন, ঘট, মিথুন এবং পত্রবল্লভ। এই নির্দেশ অনুসারেই শিব-



চিত্র—4.1 পুরুষ-প্রতীকী বড় দেউল (লিঙ্গরাজ)।

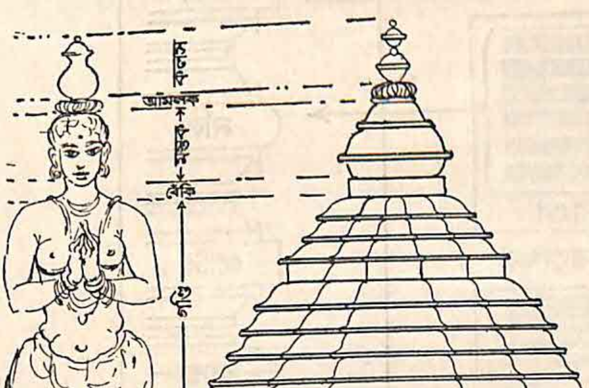
মন্দিরে মিথুন-মূর্তির আবির্ভাব। মিথুন-তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই ; আপাতত বলি মন্দির-স্থপতি একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা করলেন। তিনি মানস নেত্রে দেখলেন, শিবলিঙ্গ সমন্বিত 'বিমান' একটি পুরুষ-দেউল এবং তার সম্মুখস্থ যাত্রীদের গর্ভে ধারণ করার প্রয়োজনে নির্মিত 'জগমোহন' একটি স্ত্রী-দেউল। এই যে গোটা মন্দিরকে পুরুষ-প্রতীকী ও স্ত্রী-প্রতীকীরূপে চিন্তা করা হল তার প্রমাণ রয়ে গেছে তাদের বিভিন্ন অঙ্গের নামকরণে। সম্মুখদৃশ্যে নিচের দিক থেকে বিভিন্ন অঙ্গের নাম পা-ভাগ, তল-জঙ্ঘা, বন্ধন (হাঁটু), উপর-জঙ্ঘা (জানু), বরণ্ডি (কোমর), গণ্ডী (ঊর্ধ্বাঙ্গ—নাভি থেকে স্কন্ধ), বেঁকি (কণ্ঠ), মস্তক, খাপুরি (করোটি)।

রেখ ও পীড়-দেউল :

গর্ভগৃহের উপর পুরুষ-প্রতীকী বিমান-দেউলটির অপর নাম রেখ-দেউল (চিত্র—4·1) ; জগমোহনের নাম পীড়-দেউল (চিত্র—4·2)। ওদের পার্থক্য মূলতঃ একটি কর্তিত-পিরামিড। পীড়-দেউল উচ্চতায় কিছু ছোট। পাশ থেকে দেখলে মনে হয়, যেন সদ্যবিবাহিত দম্পতি কুশণ্ডিকার সময় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে (চিত্র—4·3)।

চিত্রে বিভিন্ন অংশের নাম উল্লিখিত হয়েছে। উচ্চতার দিক থেকে উভয় দেউলকেই চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয়েছে : পিষ্ঠ (পাদপীঠ), বাড় (নিম্নাঙ্গ), গণ্ডী (ঊর্ধ্বাঙ্গ ; ভাষান্তরে রথক বা ছাপর) এবং মস্তক। মস্তকের উপর উভয় ক্ষেত্রেই আছে আমলক ও কলস। আমলক অলঙ্করণটি খাঁজকাটা। মনে হয়, এটি দড়ির তৈরী বিঁড়ার প্রতীক। অর্থাৎ মাথায় ঘট বসাতে হলে একটা কার্পাস বা দড়ির ধারক চাই—সেটাই আমলকের রূপ নিয়েছে। কলসের উপরে থাকে ধ্বজা ; শিবমন্দিরে তা ত্রিশূল। পরবর্তী যুগে বিষ্ণুমন্দিরে তা 'চক্র'রূপ নিয়েছিল।

শাস্ত্রের নির্দেশ—বাস্তু-নক্শায় (প্ল্যানে) রেখ এবং পীড় (কোনও কোনও শাস্ত্রে একে ভদ্র-দেউলও বলা হয়েছে) হবে আবশ্যিকভাগে বর্গক্ষেত্র। এবার



চিত্র—4·2 স্ত্রী-প্রতীকী জগমোহন (লিঙ্গরাজ)।



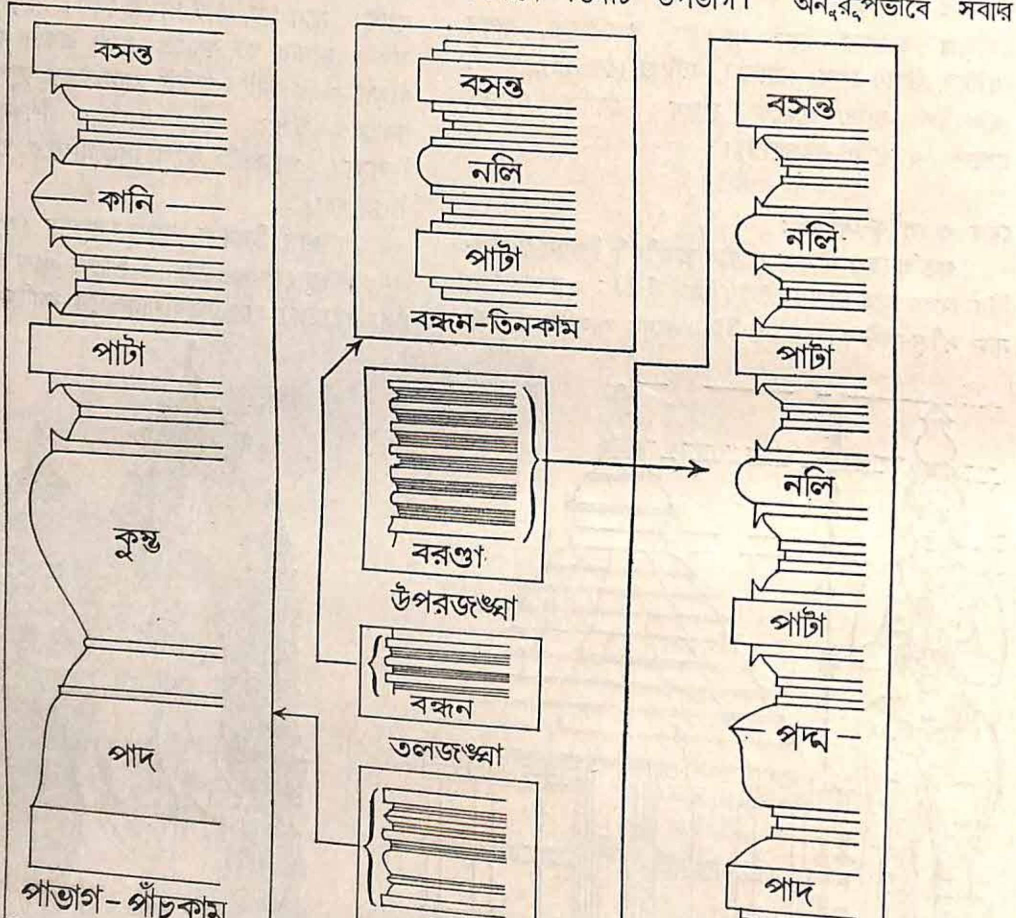
চিত্র—4·3 রেখ-পীড় মিথুন।

ঊর্ধ্বাঙ্গেই সীমিত। রেখ-দেউলের ছন্দটি দেখে মনে হয়, যেন দুটি বংশদণ্ডকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে উপর অংশের ডগা দুটিকে পরস্পরের দিকে টেনে আনা হয়েছে। অপরপক্ষে পীড়-দেউল সম্মুখদৃশ্যে দৃষ্ট বিভিন্ন অংশের বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে :

I ॥ **পিষ্ঠ** (রেখ এবং পীড়) : শিলপশাস্ত্র অনুসারে পিষ্ঠ আট রকমের হতে পারে। তাদের নামও

পাওয়া যাচ্ছে : পদ্ম, সিংহ, ভদ্র, বেদী, সুথীর, খুর, কুম্ভ (অথবা কূর্ম) এবং পরিজঙ্ঘা। ভুবন-প্রদীপের নির্দেশানুসারে অধ্যাপক বসু এই বিভিন্ন প্রকার পিষ্ঠের স্বরূপ চিত্রসহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অত বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমরা গবেষক নই, রসপিপাসু।

II ॥ **বাড়** (রেখ ও পীড়) : মন্দিরের যে অংশের নাম 'বাড়' অর্থাৎ মনুষ্য দেহে যা-নাকি পায়ের পাতা থেকে নাভিদেশ, তাকে আবার পাঁচভাগে অথবা তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিন ভাগ মন্দিরকে জঙ্ঘা এবং বরণ্ডি। মনুষ্য দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের সঙ্গে এই পাঁচ অংশের সাদৃশ্যটা (চিত্র—4.1 এবং 4.2-তে) বোঝানোর চেষ্টা করেছি। মন্দির-ভাস্কর্যের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূর্তিগুলি দুটি জঙ্ঘা অংশে সচরাচর শোভিত হয়। অপরপক্ষে পা-ভাগ, বন্ধন ও বরণ্ডিতে থাকে জমির সমান্তরাল কতকগুলি উপভাগ। সবার নিচে, পা-ভাগে থাকে এই রকম পাঁচটি উপভাগ, তাই পা-ভাগের চল্‌তি নাম 'পাঁচকাম'। তেমনি বন্ধনের নাম 'তিনকাম', যেহেতু সেখানে তিনটি উপভাগ। অনুরূপভাবে সবার



চিত্র—4.4 'বাড়' অংশের শাস্ত্রসম্মত উপভাগ (সিদ্ধেশ্বর দেউল অনুসরণে)।

বলে ত্রি-অঙ্গ—কিন্তু কলিঙ্গে যেহেতু পঞ্চঅঙ্গ মন্দিরের সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী তাই আমরা এখানে পাঁচভাগের কথাই বিস্তারিতভাবে বলছি। এই পাঁচটি ভাগ হল—পা-ভাগ, তল-জঙ্ঘা, বন্ধন, উপর-উপরের ভাগ অর্থাৎ বরণ্ডির নাম 'সাতকাম', সেখানে সাধারণতঃ সাতটি উপভাগ।

এই উপভাগগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে হলে বাড় অংশটা একটু বড় করে এঁকে দেখাতে হয়। সিদ্ধে-

শ্বর মন্দিরে আমি যে মাপগুলি পেয়েছি সেটাকেই উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে (চিত্র—4·4)।

সারাটা বছর কেঁদেই কাটাই বা হেসেই কাটাই বছরটা অনিবার্যভাবে শেষ হয় বসন্তে। তেমনি পাঁচকাম, তিনকাম এবং সাতকাম—তিনটি ক্ষেত্রেই দেখছি শেষ উপভাগটির নাম 'বসন্ত'। যে বর্ডারের শেষপ্রান্ত কোণাযুক্ত অথবা গোলাকার নয় তাকেই দেখছি, বলা হচ্ছে 'পাটা'। আর কোণাযুক্ত বর্ডারের নাম 'কাণি'; গোলাকৃতি হলে বলা হয় 'নলি'। কুম্ভ, পদ্ম অথবা পাদের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—তাদের আকৃতিতেই তাদের পরিচয়।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপভাগের মাপ কত হবে তাও নির্দেশ করেছেন শিল্পশাস্ত্রকারেরা—কিন্তু তাই বলে শিল্পীর স্বাধীনতাকে কোথাও খর্ব করা হয়নি। কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও বেশ নজরে পড়ে। যেমন মুক্তেশ্বর মন্দিরে বিমানের বরণ্ডিতে কাণি নেই, তার পরিবর্তে আছে পাটা। পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে আবার পাটা কাণি দুটিই অনুপস্থিত—পরিবর্তে আছে পাদ-কুম্ভ-বসন্ত। তা হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ একই ছাঁচে ঢালা।

কবন্ধ-মূর্তি বাস্তবে দেখতে না পাওয়ার জন্য কোনও ক্ষোভ কারও আছে কি?

বাড় অংশের বিভিন্ন ভাগের যে আনুপাতিক হিসাব ও মৌল ছন্দ তার সূত্রটি আবিষ্কার করতে হলে কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে যাচাই করতে হবে। ছয়টি উদাহরণ তালিকাকারে সাজিয়ে দেওয়া গেল [প্রতিটি মাপ সেণ্টিমিটারে প্রকাশিত]।

এভাবে অনেকগুলি উদাহরণ তালিকাকারে সাজিয়ে আমরা কয়েকটি সাধারণ সূত্র আন্দাজ করতে পারি। যেমন:

(ক) পা-ভাগ ও বরণ্ডি উচ্চতায় প্রায় সমান।

(খ) তল-জঙ্ঘা ও উপর-জঙ্ঘার উচ্চতা প্রায় সমান।

(গ) পা-ভাগ ও বরণ্ডির সম্মিলিত উচ্চতা অপর তিনটি অংশের উচ্চতার যোগফলের সমান।

(ঘ) বন্ধন-অংশ উচ্চতায় পা-ভাগ বা বরণ্ডির এক-তৃতীয়াংশ।

উপভাগগুলি মাপ নিয়ে বিচার করলে দেখি তাদের অনুপাতের মধ্যেও একটা ছন্দ আছে। সে

	পা-ভাগ বা পঞ্চকাম	তল-জঙ্ঘা	বন্ধন বা তিনকাম	উপর-জঙ্ঘা	বরণ্ডি বা সাতকাম
সিদ্ধেশ্বর ...	120	104	38	104	117
অনন্ত বাসুদেব					
জগমোহন ...	91	76	30	76	91
বিমান ...	122	101	41	101	122
লিঙ্গরাজ নাটমন্দির ...	150	125	33	125	150
জগমোহন ...	213	198	61	188	216
বিমান ...	317	300	91	282	335

প্রশ্ন হতে পারে, ক্রমাগত যদি প্রতিটি ভাগ-উপভাগ একই ছন্দে, একই মাপে তৈরী হয় তাহলে বৈচিত্র্য কোথায়? মন্দিরগুলো তো সবই একঘেয়ে লাগবে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এ কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। চিত্র—4·2-তে ভদ্র-দেউলের পাশে যে মানুষ্য মূর্তিটি আছে ওর কথাই বিবেচনা করুন। ওর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপের একটা অনুপাত আছে। এই পৃথিবীর প্রায় চারশ' কোটি মানুষের দেহে বিশ্বনিয়ন্তা মোটামুটি সেই ছন্দের নিয়ম মেনে চলেছেন; কিন্তু সেজন্য কি এই দুনিয়ার বৈচিত্র্যের কোনো অভাব ঘটেছে?

অনুপাতটি এভাবে বলা যায়:—পাদ : কুম্ভ : পাটা : কাণি : বসন্ত = 4 : 4 : 2 : 1 : 1।

কিন্তু উপভাগ নিয়ে অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার আমাদের না করলেও চলবে। ঐ সূত্র অনুসারে কোন মন্দির নির্মাণে তো আমরা ব্রতী হইনি—আমাদের উদ্দেশ্য মূল ছন্দটা মোটামুটি জেনে নেওয়া, যাতে সৌন্দর্য উপলব্ধিতে আমাদের সুবিধা হয়।

IIIA ॥ গণ্ডী (রেখ-দেউল) : বাড় অংশের সর্বোচ্চ উপভাগ বসন্তের উপরের অংশ হচ্ছে গণ্ডী

এবং তার শেষ 'বিসমে'। প্রথম খানিকটা অংশ যেন খাড়া উঠে গেছে, তারপর ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে বেঁকেছে। একটা শক্ত বাঁশকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে পুঁতে যদি তার আগায় দড়ি বেঁধে টানতে থাকি তাহলে সেটা বোধকরি ঐ ছন্দেই বাঁকবে। এ-ভাবে বাঁকার জন্য উপরের অংশের বিস্তার যখন বাড়ের বিস্তারের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায় তখনই গণ্ডীর শেষ। এই গণ্ডী অংশটিকে কয়েকটি ভূমিতে ভাগ করা হয়। চিত্র—4·1-তে রেখ-দেউলটি লিঙ্গ-রাজের বিমানের অনুকরণে আঁকা—ওখানে দেখছি, সর্বসমেত দশটি ভূমি আছে। প্রতিটি ভূমির সমাপ্তি-সূচক একটি খাঁজকাটা আমলকি ফলের চ্যাপ্টা সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি, যাকে বলে ভূমি-আমলক।

IIIB ॥ **গণ্ডী** (ভদ্র-দেউল) : ভদ্র-দেউল বা পীড়-দেউলের গণ্ডী অংশ যেন একটি কর্তিত-পিরামিড, যার মাথাটা জমির সমান্তরালে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এর ধারগুলি বক্র-রেখা নয়, সরল-রেখা, জমির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কোণ রচনা করে উঠে গেছে। চিত্র—4·2-এ পীড়-দেউলের গণ্ডী অংশটি লক্ষ করলে দেখব সেটি যেন দ্বিতল—নিচের দিকে পাঁচটি জমির সমান্তরাল ধাপ (এগুলি-কেই বলে 'পীড়') তারপর খানিকটা 'ল্যাণ্ডিং' বা সিঁড়ির চাতালের মত ফাঁক (তার নাম 'পায়রা-ঘর'), এর পর উপর অংশের তিনটি পীড়। ঐ দুটি পৃথক অংশের নাম তল-পোতাল ও উপর-পোতাল। ক্ষেত্র বিশেষে পোতালের সংখ্যা দুইয়ের বেশীও হতে পারে। যেমন কোনার্ক মন্দিরের জগমোহন ; সে-ক্ষেত্রে মাঝের পোতালটির নাম হবে 'মাঝ-পোতাল'। দুটি পীড়ের মাঝখানের ফাঁকটুকুর নাম কান্তি।

IVA ॥ **মস্তক** (রেখ-দেউল) : মস্তক-অংশের সর্বনিম্ন ভাগ 'বেঁকি' যেন বস্তুতঃ মস্তকের 'কণ্ঠ', যার উপর আমলক ও 'খাপুরি' বা মুণ্ডটা বসান। আমলক অলঙ্করণটি কলিঙ্গ স্থাপত্যে শুধু নয় নাগর স্থাপত্যের অন্যান্য শাখাতেও পরিদৃশ্যমান। আমার ব্যক্তিগত অনুমান—কোন পণ্ডিতের উক্তি আমার অনুমানের স্বপক্ষে দেখাতে পারছি না যদিও —এই 'আমলক'-অলঙ্করণটি নাগর-স্থাপত্যে অনু-প্রবেশ করেছে 'বিঁড়া'-র প্রতীক থেকে (যদিও বিঁড়ার উপরে খাপুরি)। মন্দির যেহেতু মনুষ্য প্রতীকী তাই মাথায় 'খাপুরি' ও 'কলস'—অর্থাৎ কিনা 'মস্তক' ও 'কলসী', তার মাঝখানে একটি 'বিঁড়া' অনিবার্য মনে করা হয়েছে। কলসবাহী রমণীর মূর্তি কল্পনা করে। যদিও নামটা 'বিঁড়ার' কোনও সংস্কৃত প্রতি-শব্দ না হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে 'আমলক'-এ। যেহেতু বাহ্যত এর রূপ খাঁজকাটা আমলকীর মতো। আমলকী ফলের মত খাঁজ-কাটা এই অলঙ্করণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গণ্ডী অংশে ভূমি-আমলক রূপে ইতি-পূর্বেই আমরা দেখেছি। এই প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডটি বস্তুতঃ চার-ছয়খানি প্রস্তরখণ্ডের সমাহার। শুধু-মাত্র অলঙ্করণের জন্যই নয়, কলসীমাথায় ঠাকুরঝি-গয়লানীর প্রতীক হিসাবেই নয়, একটি স্থূল পার্থিব প্রয়োজন সাধনের জন্যই এটির আমদানি। মন্দিরের গণ্ডী বা ছাপর-অংশের নির্মাণ-কৌশলটা হচ্ছে ধাপে ধাপে একটু একটু করে বাড়িয়ে দেওয়ার কায়দায়—ইংরেজীতে যাকে বলে 'কর্বেলিঙ'। ভারতীয় স্থপতিবিদেরা আর্চের ব্যবহার করেননি, কারণ প্রাক মুসলমান যুগে ভারতীয় স্থপতি আর্চ বা খিলানের মৌল সূত্রটা জানতেন না। প্রতিটি রদ্দায় পাথরকে নিচের রদ্দা থেকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে বসানো হত। এই কর্বেলিঙ-এর কায়দায়—মশলার কোন জোড়াই থাকত না বটে তবে লোহার অথবা তামার গজালের সাহায্যে একটি পাথরের সঙ্গে অপরটি যুক্ত থাকত। সবার উপরে ঐ প্রকাণ্ড 'আমলক' এবং তদুপরি 'খাপুরি' পাথর দুটি বসান হলে ভারসাম্য রক্ষিত হত। অর্থাৎ কোনভাবে উপর থেকে কেউ যদি আলতো-ভাবে ঐ প্রকাণ্ড পাথরখানি তুলে নেয় তবে অন্যান্য রদ্দার ঝুঁকে থাকা পাথরগুলি হুড়মুড়িয়ে গর্ভ-গৃহে পড়ে যাবার কথা। এই আমলকটি যেন কল্পিত মন্দির-মনুষ্যের মুখমণ্ডল যার উপর বসেছে 'খাপুরি' অর্থাৎ মাথার খুলি। খাপুরি ও আমলকের মিলন স্থল যেন ললাট অংশ—ত্রিপথধারা। এর উপরে কলসি—যার তিনটি ভাগ ; কলস-পাদ, কলস-হাঁড়ি ও কলস-গাড়ি (কলসির গলা)। কলস-গাড়ির উপরে সর্বোচ্চ স্থানে আছে আয়ুধ—বা দেববিগ্রহের অস্ত্র। শিবমন্দিরে ত্রিশূল এবং বিষ্ণুমন্দিরে চক্র।

IVB ॥ **মস্তক** (ভদ্র-দেউল) : ভদ্র বা পীড়-দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশে সামান্য প্রভেদ হয়। চিত্র—4·2-এ বিভিন্ন অংশের নামগুলি উল্লিখিত হয়েছে। রেখ-দেউলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখব কলস ও আয়ুধ অংশে বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নেই ;

আমলকটি আকারে অনেক ছোট। কারণ আমলকের নিচে এবং বেঁকির উপরে যোজিত হয়েছে একটি নূতন অলংকার—ঘণ্টা বা শ্রী। ঐ ঘণ্টার আবার নিজস্ব খাপুরি আছে, ত্রিপথধারার পরিবর্তে এসেছে 'সিজুপত্র-পাখুড়' ; এবং ঘণ্টার জন্য দ্বিতীয় একটি বেঁকি এসেছে, যার নাম আমল-বেঁকি।

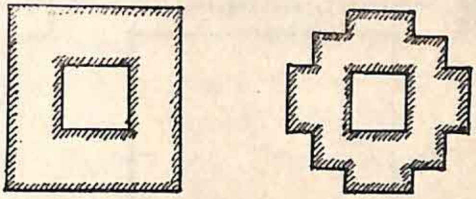
ভদ্র-দেউলের ক্ষেত্রে মস্তকাংশের উচ্চতা সাধারণতঃ এমন হয় যাতে গণ্ডী অংশের মূল কর্তিত-পিরামিডের শীর্ষবিন্দু যেখানে হওয়ার কথা সেখানেই মস্তকের সমাপ্তি হবে।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বলি, পার্সি ব্রাউন বলেছেন, রেখ-দেউলের গণ্ডী-অংশে ভিতরের দিকে ঐ যে কর্বেল করা অংশটা, ঐখানেই উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের নাকি দুর্বলতা। বিভিন্ন উচ্চতায় যদি পাথরগুলি বীম বা কড়ির সাহায্যে যুক্ত হত তাহলে তাদের ভারসাম্য রক্ষিত হত আরও ভালভাবে। একটি চিত্রে (Plate LXXIV) তিনি লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিমানের ফাঁপা গণ্ডীটি দেখিয়েছেন কিন্তু আমার মনে হয় পার্সি ব্রাউন সাহেবের ধারণা ঠিক নয়।[4] কোনার্কে ভেঙে-পড়া রেখ-দেউলের লোহার বীম প্রমাণ দেয় যে, 'ওই অংশটা পাতকুয়ার মত বরাবর ফাঁপা ছিল না। দু' একটি অর্ধভগ্ন মন্দিরে আমি লক্ষ্য করেছি গণ্ডীর মাঝে মাঝে চাতাল তৈরী করা হত। লিঙ্গরাজেও যে তা আছে এটা অনুমান করা যায়। ঐ চাতালে উঠবার পথটিও ভুবনেশ্বরের পাণ্ডা আমাকে দেখিয়েছিলেন—সময় সংক্ষেপ থাকায় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতে দেরী হবে ভেবে আমি নিজে গিয়ে সেটি অবশ্য দেখিনি।

এতক্ষণ পর্যন্ত মন্দিরের ফাসাদ বা সম্মুখ-দৃশ্যের দিকেই আমরা নিবন্ধদৃষ্টি ছিলাম, এবার তার বাস্তু-নক্শা বা প্ল্যানের প্রসঙ্গে আসি।

মন্দিরের বাস্তু-নক্শা বিচার করে প্রথমেই নজরে পড়ছে যে, মূল মন্দিরই হোক অথবা জগমোহন, নাটমন্দির, ভোগমণ্ডপ যাই হোক—ভিতরের অংশটা চতুষ্কোণ,—কোনও খাঁজ-কাটা নয়। কাখর-দেউলে সেটি আয়তক্ষেত্র, অন্যান্য দেউলে বর্গক্ষেত্র। ভিতরের দেওয়ালে খাঁজও নেই, কারুকার্যও নেই। অপরপক্ষে বাইরের প্রাচীরে অসংখ্য খাঁজকাটা। বস্তুতঃ ঐ খাঁজের সংখ্যার উপরেই মন্দিরের বাস্তু-নক্শায় প্রকার ভেদ।

ভিতরের প্রাচীরের অনুকরণে বাহিরের প্রাচীরেও যদি কোন খাঁজ-কাটা না হয় অর্থাৎ চতুষ্কোণ হয় তবে তাকে বলি **একরথ-দেউল** (চিত্র—4·5)। বৈতাল-মন্দিরের জগমোহন ও বড়-দেউল (যার অপর নাম বিমান) অথবা পরশুরামেশ্বরের জগমোহন এক-রথ দেউলের উদাহরণ। কিন্তু চারিদিকের প্রাচীরে যদি মাঝের খানিকটা অংশ এমনভাবে বাইরে বেরিয়ে থাকে যে, যে-কোন দিক থেকে আমরা তিনটি তল দেখতে পাব তা হলে সে ক্ষেত্রে ঐ মন্দিরকে বলব **ত্রিরথ-দেউল** (চিত্র—4·5)। মাঝের বেরিয়ে-থাকা



চিত্র—4·5 একরথ ও ত্রিরথ দেউলের বাস্তু-নক্শা।

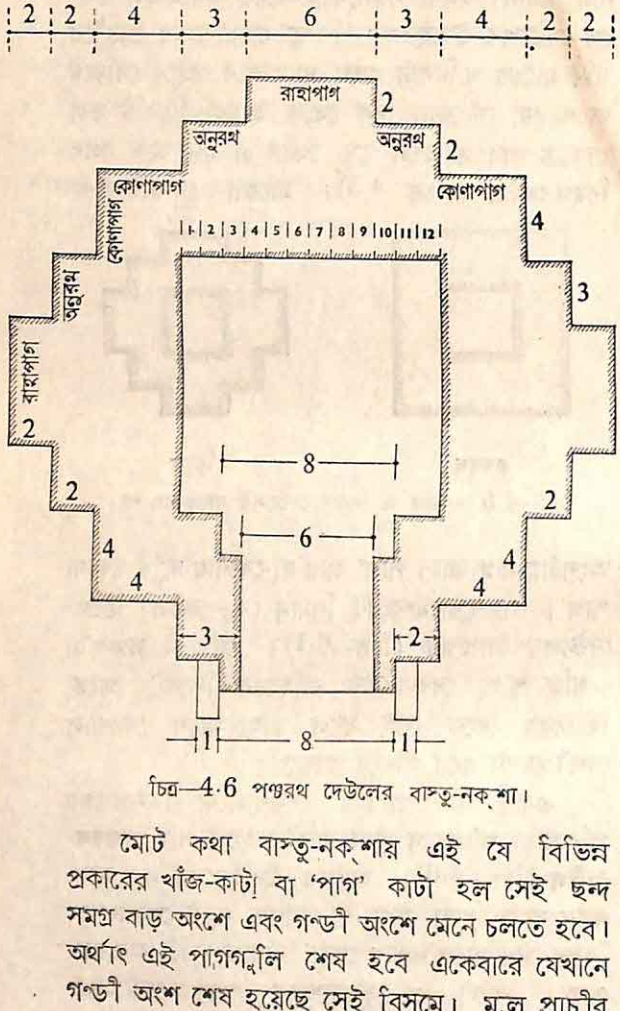
অংশটার নাম 'রাহা পাগ' আর দু-কোণায় দুটি 'কোণা পাগ'। পরশুরামেশ্বরের বিমান (বড়-দেউল) ত্রিরথ-দেউলের উদাহরণ (চিত্র—6·1)। সেখানে লক্ষণীয় —খাঁজ শুধু দেওয়ালের বাহিরের দিকেই আছে, ভিতরের দিকে নেই—ফলে রাহা-অংশে দেওয়াল বেশী মোটা করে গাঁথতে হয়েছে।

এবার যদি প্রতিটি দেওয়ালকে তিনভাগের পরিবর্তে পাঁচভাগে ভাগ করি তাহলে পাব **পঞ্চরথ-দেউল** (চিত্র—4·6)। আগের উদাহরণের মত মাঝখানে আছে রাহা পাগ, দু-কোণায় দুটি কোণা-পাগ কিন্তু তার মাঝে এবার দেখা দিয়েছে দুটি 'অনুরথ-পাগ'। পুরী ও ভুবনেশ্বরে পঞ্চরথ-দেউলেরই প্রাধান্য। অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় ; যথা—লিঙ্গরাজ, অনন্ত-বাসুদেব, ব্রহ্মেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, মঘেশ্বর, রামেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর প্রভৃতির বিমান।

শাস্ত্রকার **সপ্তরথ** এবং **নবরথ** দেউলের কথাও বলেছেন। সপ্তরথ দেউলের একটি মাত্র উদাহরণ আমার নজরে পড়েছে—রাজারাণী মন্দিরের বিমান। তাও সেটা শাস্ত্রসম্মতভাবে খাঁজ-কাটা নয়। নবরথ দেউল আমি বাস্তবে দেখিনি।

শাস্ত্রে যদিচ বলা হয়েছে যে, মন্দির-প্রাচীরের ভিতরের দিকে কোন খাঁজ-কাটা হবে না কিন্তু সে-আইনও যে সর্বত্র মেনে চলা হয়েছে তাও বলতে

পারি না। রাজারাণী বা মুক্তেশ্বরের জগমোহন, এমন কি রাজারাণীর বিমানেও দেখছি খাঁজ-কাটা হয়েছে। শিল্পীর স্বাধীনতা শুধু ভাস্কর্যেই নয়, স্থাপত্যেও সমভাবে স্বীকৃত।



চিত্র—4·6 পঞ্চরথ দেউলের বাস্তু-নক্‌শা।

মোট কথা বাস্তু-নক্‌শায় এই যে বিভিন্ন প্রকারের খাঁজ-কাটা বা 'পাগ' কাটা হল সেই ছন্দ সমগ্র বাড় অংশে এবং গণ্ডী অংশে মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ এই পাগগুলি শেষ হবে একেবারে যেখানে গণ্ডী অংশ শেষ হয়েছে সেই বিসমে। মূল প্রাচীর অর্থাৎ রাহা-পাগ যে-উচ্চতায় খাঁজ কেটে বাইরে বেরিয়েছে বা ভিতরে ঢুকেছে অন্যান্য পাগকে সেই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে ততখানিই বাইরে বার হতে হবে অথবা ভিতরে ঢুকতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, বিভিন্ন অংশের এই যে এত নাম এগুলি আমাদের জানবার কি দরকার? প্রয়োজন আছে। এখন আমি যদি বলি 'পরশুরামেশ্বরের বিমানে দক্ষিণ রাহা-পাগের তল-জঙ্ঘায় একটি গণেশ মূর্তি আছে', তাহলে নক্‌শা ছাড়াই আপনারা সেটি মন্দির-দর্শনকালে খুঁজে পাবেন।

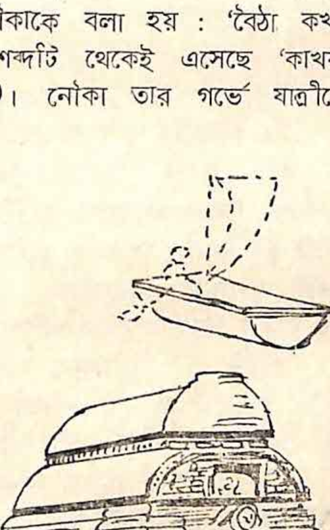
এ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি কথা বলব। বাস্তুশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা পড়াশুনা করেন তাঁরা জানেন যে, স্থাপত্য-শিল্পে একটি 'বিশেষ একক' আছে যার নাম 'মডুল' (module)। কলিঙ্গের মন্দির-স্থাপত্যের সেই মূল 'একক'টি হচ্ছে সমচতুষ্কোণ গর্ভগৃহে বাহুর যে দৈর্ঘ্য তার ষোড়শাংশ, দ্বাদশাংশ অথবা অষ্টমাংশ। মন্দিরের যে-কোন অংশের (তা সে বাস্তু-নক্‌শাতেই হোক অথবা সম্মুখদৃশ্যেই হোক) মাপ বোঝাতে শাস্ত্রকার এই বিশেষ এককের উল্লেখ করেছেন। সূক্ষ্ম মাপের সে বিড়ম্বনা আমরা সাধারণভাবে এড়িয়ে গেছি কিন্তু (চিত্র—4·6-এ) পঞ্চরথ দেউলের ক্ষেত্রে সংখ্যা দিয়ে আমরা সেটা দেখিয়েছি। চিত্র—4·6-এ ঐ একক বা মডুলটি হচ্ছে গর্ভগৃহের বিস্তারের দ্বাদশাংশ।

মন্দির-স্থাপত্যের বিচারে কলিঙ্গের দেব-দেউল চার জাতের। রেখ, পীড়, কাখর এবং গৌড়ীয়। প্রথম যুগে শুধুমাত্র বিমানের উপর রেখ-দেউল নির্মিত হত। পরশুরামেশ্বরে প্রথম যুক্ত হল একটি মণ্ডপ; এবং পরে এই মণ্ডপটি স্ত্রী-জাতীয় পীড়-দেউলের রূপ নিল। এসব কথা আমরা আলোচনা করেছি। তৃতীয় জাতের মন্দির হচ্ছে কাখর-দেউল। তার পরিকল্পনা কীভাবে এসেছে এ বিষয়ে আমাদের যা অনুমান তা নিবেদন করি:

কাখর-দেউল: পীড়-দেউল এসেছিল পার্থিব প্রয়োজনের তাগিদে; যাত্রীসাধারণের স্থান সঙ্কুলানের নিমিত্ত। অপরপক্ষে কাখর-দেউলের পরিকল্পনা ধর্মীয় কারণে। এতদিন শুধু শিবমন্দিরই নির্মিত হচ্ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যে শক্তিপূজার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। শক্তিপূজারী এবার শক্তিমূর্তির উপর দেব-দেউল নির্মাণ করতে চাইলেন। স্থপতি-বিদ পড়লেন মহা-সমস্যায়। শক্তি বিগ্রহের উপর পুরুষ-প্রতীকী রেখ-দেউল নির্মাণ করায় বুঝি তাঁর রুচিতে বাধল—অপরপক্ষে দেবীমূর্তির উপর নির্মিত বড়-দেউলের উপর পীড়-দেউলের চূড়া নির্মাণেও সঙ্কোচ জাগে। সেটা যেন দেবীর প্রতি অপমান। কারণ এযাবৎকাল পীড়-দেউল কোনও দেববিগ্রহের উপর নির্মিত হয়নি; তার ভূমিকা নিতান্ত পার্থিব প্রয়োজনে। কলিঙ্গ বাস্তুকার তাই, এ-ক্ষেত্রে আর একটি নতুন জাতের দেউল উদ্ভাবন করলেন—যা স্ত্রী-জাতীয়া কিন্তু পীড় দেউল নয়।

বেশ কিছু পরিবর্তন করা হল। রেখ এবং পীড়-দেউল বাস্তু-নক্‌শায় (প্ল্যানে) বর্গক্ষেত্র। তিন দিক থেকে তার 'এলিভেশান' একই রকম দেখতে। নব-পরিকল্পিত দেবী-মন্দিরের মূল-দেউলটির বাস্তু-নক্‌শা হল আয়তক্ষেত্র—বর্গক্ষেত্র নয়। প্রবেশদ্বারটি স্থাপন করা হল দীর্ঘতর এক-দিকে। এই পরিকল্পনা প্রথম কার্যকরী করা হল বৈতাল-দেউলে। পা-ভাগে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হল না বটে ; কিন্তু বাড় অংশে তল-জংঘা, বন্ধন এবং উপর-জংঘার ছন্দটি বদলে গেল। সব-চেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হল মস্তক অংশে। এবার আর আমলক-কলস নেই। মন্দির-চূড়া দেখতে হল একের উপর আর একটি উবুড়-করা নৌকার মতো। এই নৌকা-প্রতীকী বলেই এর নাম কাখর-দেউল।

শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচার্য সুনীতিকুমারকে। তিনি বলেছিলেন, ওড়িয়া-ভাষায় নৌকাকে বলা হয় : 'বৈঠা কখারু'। ঐ 'কখারু' শব্দটি থেকেই এসেছে 'কাখর' শব্দটি (চিত্র—4·7)। নৌকা তার গর্ভে যাত্রীদের ধারণ

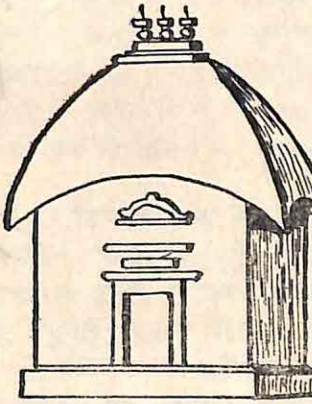


চিত্র—4·7 কাখর-দেউল।

করে, তার পরিকল্পনা স্ত্রী-লিঙ্গের। অথবা হয়তো স্থপতি বলতে চেয়েছেন—যাত্রীদের বৈতরণীর ওপারে অমর্ত্যলোকে পোঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে বলেই মন্দিরের এ জাতীয় পরিকল্পনা।

অনধিকারী হিসাবে আমার বোধহয় স্বীকার করে যাওয়া শোভন হবে যে, কাখর-দেউলের এই বিবর্তন এবং তার নামরূপের যাথার্থ্য—যা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি, তা আমার স্বকীয় চিন্তায়। পুরাতত্ত্ব বিভাগের স্বীকৃত তথ্য নয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে শ্রীমতী দেবলা মিত্র শুধু লিখেছেন, "There are only five 'Kakhara deul's at Bhubaneswara all of which are dedicated to Sakti worship, a fact difficult to explain away as a mere coincidence."[5] [ভুবনেশ্বরে মাত্র পাঁচটি কাখর-দেউল আছে। প্রত্যেকটিই শাক্ত-মন্দির ; এটাকে নিছক কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন মনে হয়।]

গৌড়ীয়-দেউল : নামেই বোঝা যায় এটি বঙ্গদেশ থেকে আমদানী করা। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যে গৌড়ের দান সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরবর্তী যুগে



চিত্র—4·8 গৌড়ীয়-দেউল।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ গত দুই-দশক ধরে বঙ্গদেশে যে-সব খননকার্য চালিয়েছেন তাতে বেশ বোঝা যায় সমতট, গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে কলিঙ্গের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান প্রাক-মৌর্য যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত, আট-ঘড়া, বাণগড়, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানে যে-সব পোড়ামাটির শিল্প-নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সঙ্গে

উড়িষ্যা শৈলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বঙ্গদেশের গোলাকৃতি বাঁশের কাঠামোর উপর খড়ের চালার যে নয়নাভিরাম রূপ তা উড়িষ্যা-স্থপতিকে মুগ্ধ করবে এটা এমন কি আশ্চর্যের? উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যে বঙ্গের দান সম্বন্ধে ডঃ নীহার-রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বস্তুত মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার সীমান্তে এ-জাতীয় মন্দির যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হলেও ভুবনেশ্বরে বা উড়িষ্যার গভীরে এ ধরনের মন্দির বিশেষ নজরে পড়ে না। আমার তো মাত্র দুটি নজরে পড়েছে—পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরের পাশে একটি এবং উত্তর পার্শ্ব সংঘারামের তোরণ পার্শ্বে একটি। □



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের মৌল-পরিচয়

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যেমন কলিঙ্গ-স্থপতি আদিসূরী বিশ্বকর্মা-প্রবর্তিত নাগর-স্থাপত্যের পরিধির ভিতরে থেকেই কলিঙ্গ-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যটুকু রূপায়িত করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই কলিঙ্গ-ভাস্করাচার্য ভারতীয় মূর্তিশিল্পের মৌল পরিধি অস্বীকার না করেও স্বকীয় বিশিষ্টতার ছাপ রেখেছেন। ফলে, এই পরিচ্ছেদে আমরা বস্তুত ভারতীয় ভাস্কর্য-রীতির কথাই আলোচনা করছি ; কিন্তু শুধুমাত্র যেটুকু কলিঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটুকুই।

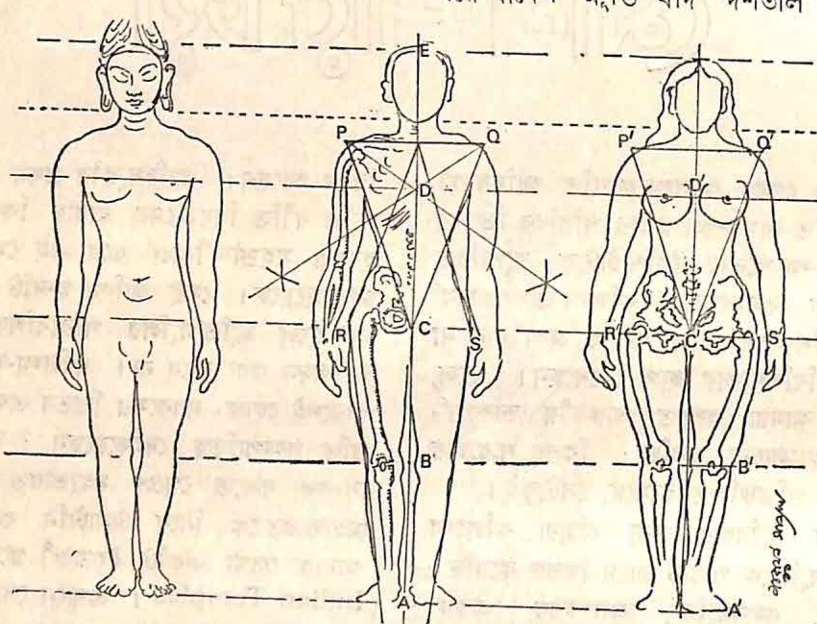
আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা কলিঙ্গে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছি ; যথা—দেবমূর্তি, কল্পমূর্তি, অলঙ্করণ, একক-নায়িকামূর্তি এবং মিথুন। কিন্তু তার পূর্বে সামগ্রিকভাবে মূর্তি-ভাস্কর্যের কয়েকটি মৌল-তত্ত্ব জেনে নেওয়া ভালো।

সুধীজনমাত্রেই জানেন, ভারত-শিল্পী দৃশ্যমান এই প্রপঞ্চময় জগতের হুবহু অনুকরণ—যাকে বলে 'ফটোগ্রাফিক' বা বাস্তবানুগ প্রতিচ্ছবি—তা কোনদিনই করতে চাননি। শিল্পীর দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান বস্তুর অন্তর্নিহিত 'সত্য'-টিকে উদ্ঘাটন করার আগ্রহই অধিক। বিশেষ, যদি সেই সত্য 'মঙ্গল' ও 'সুন্দরে'র সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। তাঁর মৌল লক্ষ্য শিল্পস্বীকৃত নবরসের এক বা একাধিক রসের পরিবেশন। শিল্প বাস্তবানুগ হলে কোনও আপত্তি নেই, তাকে সজ্ঞানে বিকৃত করতে হবে না ; আবার না হলেও ক্ষতি নেই, যদি না রসের পরিবেশনে কোনও ব্যত্যয় হয়। তাঁর দৃঢ় প্রতীতী 'সত্য-শিব-সুন্দরে'র অধিষ্ঠান ঐ রসেই : রসঃ বৈ স। 'রস'-এই তিনি আছেন। আদিসূরীর প্রথম প্রবর্তিত কতকগুলি রীতি বিবর্তনের ধারায় কিছুটা পরিবর্তিত হলেও সহস্রাব্দীকাল ধরে এই মৌলসূত্রটি মেনে চলা হয়েছে। সেই আদিম ছন্দটি সম্বন্ধে অবহিত না হলে মূর্তিগুলির পরিবেশিত রসের সম্যক আস্বাদন করা যাবে না। কলিঙ্গ-ভাস্কর—যে কোন কারণেই হোক—নবরসের ভিতর একটি বিশেষ রসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন : আদিরস। কেন, সে-কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে 'মহাভারত'কে নিয়ে টানাটানি করেছি ইতিপূর্বে আমার লেখা একটি ইংরেজী গ্রন্থে 'Erotica in Indian Temples'। এখানে সে-সব কথা থাক।

মূর্তির ভঙ্গ বা ঠাম : শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "ভারতীয় মূর্তিগুলিতে সচরাচর চারিপ্রকারের ভঙ্গি বা 'ভঙ্গ' দৃষ্ট হয়। যথা : সমভঙ্গ বা সমপাদ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ এবং অতিভঙ্গ।"[1]

(i) সমভঙ্গে মূর্তিটি দুই পায়ের উপর সমানভাবে ভর দিয়ে, ডাইনে বা বাঁয়ে কিছুমাত্র না হেলে, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দুপাশে 'ভর' সমান হয় (চিত্র—5·1) ; যদিও হাতের মুদ্রা পৃথক হতে পারে। উপবিষ্ট অবস্থায় পদদ্বয় সমভঙ্গিতে না থাকলেও মূর্তি সমভঙ্গ হতে পারে। যেমন, চিত্র—5·10-এর কার্ত্তিকেয় মূর্তি। সূর্য, বুদ্ধ, বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্তি সমভঙ্গে নির্মাণ করা বিধেয়। চিত্র—5·1-এর বামদিকে আঁকা প্রথম চিত্রটি সমভঙ্গে দণ্ডায়মান জনৈক জৈন তীর্থঙ্করের। মাঝের স্কেচটিতে তার মূল ছন্দটি বিধৃত। লক্ষ-

ণীয় সমগ্র উচ্চতাকে (AE) সমান চারিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচে থেকে প্রথম ভাগের B-বিন্দু জানুসন্ধিতে ; দ্বিতীয় ভাগের C-বিন্দু যৌনাঙ্গ-মূলে অবস্থিত। D-বিন্দু কেন্দ্রীয় রেখায় স্তন-বৃন্তদ্বয়ের সংযোগ-রেখাটির অবস্থান সূচীত করছে। উপরার্ধের শেষ চতুর্থাংশ DE সরলরেখার মধ্যবিন্দু চিবুকের নিম্নতম বিন্দু। স্কন্ধের অব-স্থান-সূচক PQ এমন অবস্থানে আছে যে, $<PQC$ অথবা $<QPC$ দ্বিখণ্ডিত করলে ছেদ-রেখাদ্বয় ঐ D-বিন্দুতে এসে মিশবে। এইমাত্র যে-কথা বললাম



চিত্র—5.1 সমভঙ্গ মূর্তিতে 'প্রমাণ' বা শিল্পশাস্ত্রসম্মত মাপ।

সেটি কোন শাস্ত্র-মত অনুসরণে নয়। Acharekar-এর রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ 'রূপদর্শিনী'-তে দেখছি ঐ-ভাবেই P এবং Q বিন্দুকে পাওয়া যায়। সূত্রটি যে কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়নি তার প্রমাণ ডানদিকে আচারেকারের গ্রন্থ থেকে আঁকা নারীমূর্তিটিতেও সমভাবে প্রযোজ্য।

আরও লক্ষণীয়, পুরুষ-মূর্তির ক্ষেত্রে QS সরলরেখা আলম্ব অর্থাৎ কেন্দ্রীয়-রেখা AE-র সমান্তরাল, অথচ নারী-মূর্তির ক্ষেত্রে Q'S'-রেখাটি আলম্ব নয়। ভাষান্তরে, পুরুষের ক্ষেত্রে স্কন্ধের বিস্তার (PQ) নিতম্বের বিস্তারের (RS) সমান ; অপরপক্ষে গুরুনিতম্বিনী নারীর ক্ষেত্রে P'Q' মাপ R'S'-এর চেয়ে কম।

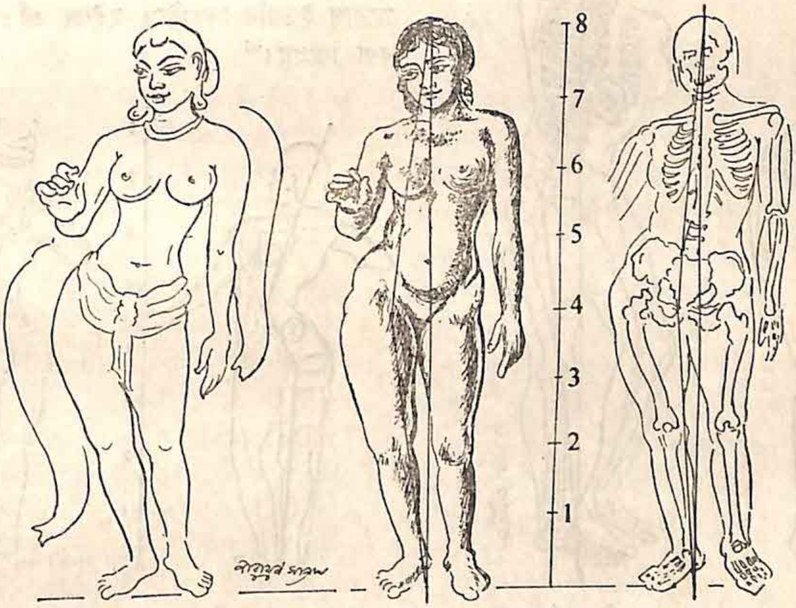
যে মাপজোখগুলি উল্লেখ করলাম তা ঠিক হিন্দু শাস্ত্রানুসারে নয়। এই সূত্রটি লেওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত নোটবুকে লিখেছিলেন এবং পশ্চিমখণ্ড এই সূত্রটি (সাধারণভাবে Figure of Eight Heads বলা হয়) মেনে নিয়েই নরনারীর মূর্তি গড়েছে আর এঁকেছে। ভারতীয় শাস্ত্রকার যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা বিভিন্ন হলেও সামগ্রিক-ভাবে মূর্তির এই কাঠামোকে অস্বীকার করা হয়নি।

(ii) আভঙ্গঠামে মূর্তির কটিদেশ কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা থেকে এক অংশ (অর্থাৎ তালের চতুর্থাংশ) সরে থাকে। মূর্তি যদি 'দশতাল' হয় তাহলে এক অংশ হবে $(\frac{1}{4}\times{}^{1}/_{10}={}^{1}/_{40})$ চল্লিশভাগের এক ভাগ। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, আভঙ্গঠামে শান্তভাব ফুটে ওঠে—বোধিসত্ত্ব, অধিকাংশ সাধুসন্ত, পার্বতী-মূর্তি আভঙ্গঠামে তৈরী করা বিধেয়। চিত্র—5.2-তে আমরা তিনটি চিত্রের মাধ্যমে এই আভঙ্গঠামের প্রয়োগকৌশলটুকু ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি। বামে একটি হিন্দু শিল্পশাস্ত্রসম্মত নায়িকামূর্তি, কেন্দ্র-স্থলে তার বাস্তবানুগ রূপ এবং দক্ষিণে ঐ মূর্তির অস্থি-সংস্থাপন বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ${}^{1}/_{15}$ অংশ হেলে আছে। পশ্চিমখণ্ডের Figure of Eight Heads আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় অক্ষরেখাটিকে আটভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে যে, ভারতীয় শিল্পের 'প্রমাণ' অর্থাৎ মাপজোখ মোটামুটি বাস্তবানুগ। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে

বহিরঙ্গরেখা বাস্তবকে অস্বীকার করে স্থান-বিশেষে বক্ররেখা আশ্রয়ী। তার আপাত হেতু মূর্তিটিকে অধিকতর পেলব ও নয়নাভিরাম করে তোলা। আরও একটি হেতু আছে : কাব্য সাহিত্যের প্রভাব। ভারতীয় ভাস্কর, অন্ততঃ কলিঙ্গে, কাজ করেছেন গুপ্তযুগের পরে। কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রভৃতি কবির বর্ণনা তাঁর অস্থিমজ্জায়। নারীর ভুজদ্বয় এবং জানু গজশুণ্ডের উপমানরূপে লিখিত হয়েছে বারে বারে। ভাস্কর তাঁর রমণীমূর্তির ভুজদ্বয় এবং জঙ্ঘা রূপায়ণের সময় সেই মনশ্চক্ষে-দেখা 'সাদৃশ্য'টুকু অস্বীকার করতে পারেননি। কাব্যের উপমা কীভাবে শিল্পীর দৃষ্টিকে প্রভাবান্বিত করেছে, সেটুকু বুঝতে সুবিধা হবে মনে করে এখানে উপমান ও উপমেয়কে পাশাপাশি বিস্তারিত আলোচনা করা গেছে ; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(iii) ত্রিভঙ্গঠাম আমাদের অপরিচিত নয়, 'কেষ্টঠাকুরে'র দয়ায়। এখানে মূর্তি তিনবার বাঁক খায়। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "মৃণালদণ্ডের মতো অথবা অগ্নিশিখার মতো পদতল হইতে কটিদেশ পর্যন্ত একদিকে, কটিদেশ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত তার বিপরীত দিকে এবং কণ্ঠ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত পুনরায় অন্যদিকে বাঁক নেয়।" যেমন দেখতে পাচ্ছি চিত্র—5.3-তে।

শিল্পাচার্যের ঐ নির্দেশ কিন্তু মূলতঃ চিত্রের প্রসঙ্গে এবং মন্দিরগাত্রে অর্ধোৎকীর্ণ (অল্‌টো-রিলিভো) মূর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিরবলম্ব অর্থাৎ 'ফ্রি-স্ট্যান্ডিং' মূর্তির ক্ষেত্রে কিন্তু ত্রিভঙ্গ মূর্তি

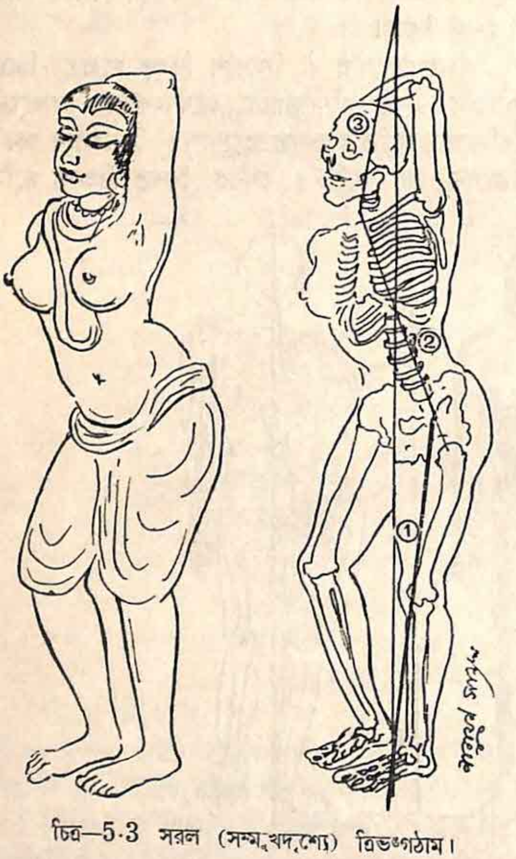


চিত্র—5.2 আভঙ্গ-মূর্তিতে 'প্রমাণ'
(বামে 'করিভুজ' 'সাদৃশ্য')।

স্থাপন করা গেছে। এই যে ললিতকলার দুই সহোদর—শিল্প ও সাহিত্য কীভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে তা প্রণিধান না করলে রসোপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না। আমরা সজ্ঞানে ঐ সাদৃশ্যটা উপলব্ধি করি না ; কিন্তু ভারতীয় শিল্প দেখার চোখ আপনিই তৈরী হয়ে যায়। কাব্যের উপরোধে এই যে বাস্তব থেকে স্বজ্ঞানবিচ্যুতি, এটি ভারতশিল্পের এক অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। 'অজন্তা-অপরূপা' গ্রন্থে এ বিষয়ে ওভাবে বাঁক না-ও নিতে পারে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার।

চিত্রের ক্ষেত্রে এবং মন্দিরগাত্রে অর্ধোৎকীর্ণ মূর্তির ক্ষেত্রে আমরা শুধু সম্মুখদৃশ্যই দেখতে পাই। সুতরাং 'বাঁক নেওয়া' বলতে সেখানে শুধু ডাইনে অথবা বামে। এগুলি 'সরল ত্রিভঙ্গঠাম'। নিরবলম্ব মূর্তির ক্ষেত্রে তা সামনে-পিছনেও হতে পারে। সম্মুখদৃশ্যে তেমন মূর্তিকে আভঙ্গ বা

সমভঙ্গ মনে হতে পারে ; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, তা তিনবার বঙ্কিমতা লাভ করেছে। সে-ক্ষেত্রে মূর্তির ভাঁজ অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারী না হওয়ারই সম্ভাবনা। আমাদের যুক্তির সপক্ষে চিত্র—5.4-এ একটি উদাহরণ পেশ করা গেল। এটি 'জটিল ত্রিভঙ্গঠাম'। পাশ থেকে অথবা প্রায় পিছন থেকে দেখলে বেশ বোঝা যায় মূর্তিটি ত্রিভঙ্গ-জাতের। প্রথম বাঁক কটিদেশে বটে, কিন্তু

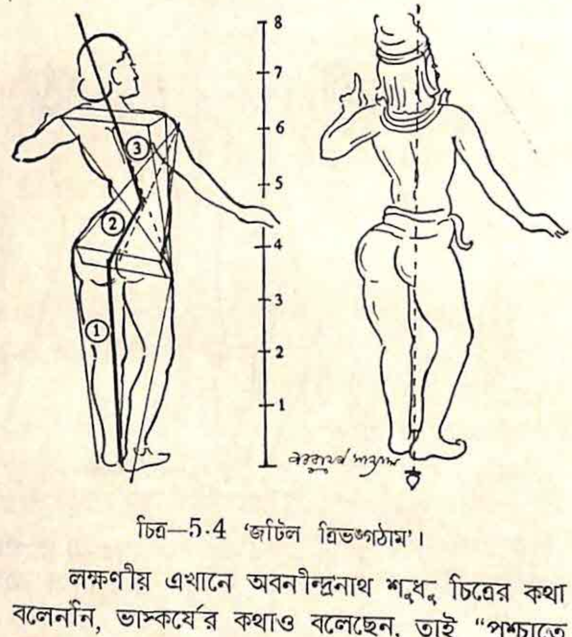


চিত্র—5.3 সরল (সম্মুখদৃশ্যে) ত্রিভঙ্গঠাম।

দ্বিতীয় বাঁক কণ্ঠে নয়, নাভিস্থলে। এ মূর্তিটি সম্মুখদৃশ্যে আভঙ্গ বলে মনে হবে ; কারণ কটিদেশ থেকে নাভিমন্ডল পর্যন্ত দ্বিতীয় বাঁকটা সম্মুখদৃশ্যে আদৌ বোঝা যাবে না।

যেহেতু যুগল মূর্তিতে স্ত্রী থাকে পুরুষের বামে তাই মিলন বা সখ্যভাব বোঝাতে স্ত্রী-মূর্তি আভঙ্গ অথবা ত্রিভঙ্গঠামে নির্মিত হলে তা বাম দিকে (অর্থাৎ শিল্পীর দক্ষিণ দিকে) হেলে থাকে। অপরপক্ষে খেদ বা অভিমান প্রকাশ করতে অর্থাৎ কলহান্তরিতা, খন্ডিতা প্রভৃতি নায়িকার ক্ষেত্রে স্ত্রী-মস্তক তার নিজের বামদিকে অর্থাৎ পুরুষ-মূর্তির বিপরীতে বাঁক নেয়। কেন্দ্রীয় সমভঙ্গমূর্তির দু-পাশে দুটি ত্রিভঙ্গমূর্তি গঠনের সময় "দুই পার্শ্ব-দেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্তির সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে এবং দুই পার্শ্বদেবতার একটি প্রধান দেবতা হইতে বিপরীতমুখী হইয়া অবস্থান করেন।"[2]

(iv) অতিভঙ্গঠামে "ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিরই অধিকতর বঙ্কিমতা দিয়া রচিত হয় এবং ঝড়ে যেরূপ গাছ তেমনি মূর্তির কটিদেশ হইতে ঊর্ধ্বদেহ কিম্বা কটি হইতে পদতল পর্যন্ত অংশ বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে অথবা সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। অতিভঙ্গঠাম শিবতান্ডব, দেবাসুরযুদ্ধ প্রভৃতি মূর্তিতেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মূর্তিতে গতিবেগ, নর্তনশক্তি-প্রয়োগ ইত্যাদি দেখাইতে হইলে অতিভঙ্গঠামে গঠন করা বিধেয়।"[3]



চিত্র—5.4 'জটিল ত্রিভঙ্গঠাম'।

লক্ষণীয় এখানে অবনীন্দ্রনাথ শুধু চিত্রের কথা বলেননি, ভাস্কর্যের কথাও বলেছেন, তাই "পশ্চাতে অথবা সম্মুখে" শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।

দাক্ষিণাত্যের চোলশৈলীতে নির্মিত তান্ডব নটরাজ একটি বিশ্ববিখ্যাত উদাহরণ। পরশুরামেশ্বর মন্দিরে অতিভঙ্গ-জাতের একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আমরা পরে দেখব এবং খিচিঙেশ্বরী মন্দিরে দক্ষিণ-পার্শ্বদেবতা নৃত্যরত গণেশ অতিভঙ্গ মূর্ছনার এক অতি অনবদ্য উদাহরণ।

শিল্পের ষড়-অঙ্গ : বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্রের টীকায় যশোধর প্রসঙ্গক্রমে একটি শ্লোক সংকলন করে বলেছিলেন :

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যম্ বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্ ॥"

অর্থাৎ চিত্রের ছয়টি অঙ্গ, যথা রূপভেদ (পরিদৃশ্যমান জগত সম্বন্ধে জ্ঞান), প্রমাণ (মাপজোখ), ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। চিত্রের প্রসঙ্গে ছয়টি অঙ্গই গুরুত্বপূর্ণ ; কিন্তু, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অঙ্গটি, অর্থাৎ 'প্রমাণ' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপরিহার্য। আগেই বলেছি, পশ্চিমখণ্ড মানবদেহকে আটভাগে বিভক্ত করে মূলসূত্র গ্রহণ করেছিল লেঅনার্দোর বিখ্যাত স্কেচ অনুসরণে। "আমাদের প্রাচীন শিল্পসাধকেরা সেভাবে ভাবেননি। তাঁরা শিল্পমূর্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন ; যথা : নর, ক্রূর, আসুর, বালা ও কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরমূর্তি—দশতাল ; ক্রূরমূর্তি—দ্বাদশতাল ; আসুরমূর্তি—ষোড়শতাল ; বালামূর্তি—পঞ্চতাল ; কুমারমূর্তি—ষট্‌তাল। শিল্পীর নিজমুষ্টির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙুল ; এইরকম দ্বাদশ অঙ্গুলিতে বা তিন মুষ্টিতে হয় এক তাল। শিল্পাচার্যরা বলছেন, রাম, নৃসিংহ, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি হবে নরমূর্তি অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ প্রভৃতি হবে দ্বাদশতালের ক্রূরমূর্তি। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহিষাসুর প্রভৃতি হবে ষোড়শতালের আসুরমূর্তি। বালামূর্তি হবে বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারমূর্তি হবে বামন কৃষ্ণসখা প্রভৃতি।"[4]

কলিঙ্গ-ভাস্কর অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এ নির্দেশ মেনে চলেননি। মন্দির-ভাস্কর্যে তা মেনে চলা সম্ভবও নয় ; কারণ মন্দিরের আয়তনের উপর, কোনাপাগ, রাহাপাগ ইত্যাদির বিস্তার নির্দিষ্ট ; ফলে যে কুলুঙ্গির খোপে মূর্তিটি বসবে তার মাপ পূর্বনির্ধারিত এবং তার সঙ্গে শিল্পীর মুষ্টির মাপের কোনও সম্পর্ক নাই। মনে হয়, শিল্পাচার্যদের মৌল নির্দেশ বিচ্ছিন্ন মূর্তির (free-standing) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; মন্দির-ভাস্কর্যে নয়। এমন কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ আমি অবশ্য কোথাও খুঁজে পাইনি ; কিন্তু উপরে লিখিত যুক্তির ভিত্তিতে সেটাই অনুমান করা স্বাভাবিক। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মূর্তির উচ্চতার অনুপাত ঐসব নির্দেশের অনুসারী।

শিল্পের ষড়-অঙ্গের পঞ্চমটি হচ্ছে 'সাদৃশ্য'। চিত্রের ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ বেশি দেখা যায় ; কিন্তু ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পী ঐ অলঙ্কারটির ব্যবহার করে শিল্পবস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বাটি প্রকাশ করেছেন। চিত্র—5·2-তে আমরা ইতিপূর্বেই তার প্রয়োগ দেখেছি। এভাবে পুরুষের দেহকাণ্ড গোমুখের মতো অথবা সিংহের মতো, রমণীর পদযুগলে পদপল্লব বা চরণকমলের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু কলিঙ্গের নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের।

1· দেবমূর্তি :

দেবমূর্তি-নির্মাণের শিল্পরীতি, যাকে ইংরাজিতে বলে 'আইকনোগ্রাফি', সেটি একটি অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল বিষয়। এ বিষয়ে যাঁরা অধিকারী তাঁরা দেবমূর্তির আয়ুধ, মুদ্রা, ভঙ্গি, বাহন, অলঙ্কার দেখে বলে দিতে পারেন মূর্তিটি কোন যুগের অথবা কোন ঘরানার। কিন্তু সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। তাই কলিঙ্গের দেব-দেউলে আমরা বারে বারে যে দেবমূর্তিগুলিকে দেখব এখানে শুধু তাদের বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

একটা কথা। শুধু কলিঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে দেবমূর্তির ভাস্কর্যে একটা জিনিস আমার নজরে পড়েছে যে-কথাটা আলোচিত হতে দেখি না। কথাটা এই : ভারতীয় ভাস্কর কেন ভারতীয় কবির মতো সচ্ছন্দবিহারী, স্বাধিকারপ্রমত্ত হতে পারলেন না? একটু বিশদ করে বলি :

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর যে ভাবরূপ, তার সঙ্গে পুরাণ অথবা মহাকাব্য-বর্ণিত দেবদেবীর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। ধরুন ইন্দ্রের কথা। বেদ ও উপনিষদে ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, মৃত্যুঞ্জয়ী, জিতেন্দ্রিয়, অসীম ক্ষমতাধর। পুরোপুরি দেবগুণমণ্ডিত। কিন্তু পুরাণ ও মহাকাব্যে ইন্দ্র-দেবতাটি মোটেই তা নন। তিনি প্রায়-মানব! ইন্দ্রিয়াসক্ত, ষড়রিপুর দাস, এবং আধুনিককালের শাসকের মতো গদি-খোয়ানোর আতঙ্কে সর্বদা সশঙ্কচিত্ত। কোথায় কোন 'অপোজিশান-লীডার'

একান্তে বসে তপস্যা করছে সংবাদ পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন—হয় তাকে খতম করতে, অথবা প্রলোভনে লক্ষ্যচ্যুত করতে। ঠিক এই জিনিসটি ঘটেছে গ্রীক-সভ্যতাতেও। আদি দার্শনিক ক্লিয়েন্থেস্-এর পরিকল্পনায় জিউস্—যিনি নাকি গ্রীক-সংস্কৃতিতে ইন্দ্রর প্রতিরূপ—হচ্ছেন স্বর্গরাজ্যের অধিপতি, মৃত্যুঞ্জয়ী, জিতেন্দ্রিয়, অসীম ক্ষমতাধর। কিন্তু পরবর্তীযুগের কবিদের পাল্লায় পড়ে—ইউরিপেডিস্, সফোক্লিসের কলমে জিউস্ হয়ে পড়লেন নিতান্ত একজন পার্থিব মহারাজ! নানা ছদ্মবেশ ধারণ করে দেখছি ঐ লম্পট মহারাজটি ইউরোপা, গ্যানিমিড, অথবা লীডা-র কৌমার্য হরণ করেছেন! ঠিক যেভাবে আমাদের ইন্দ্র কুন্তীদেবীর কৌমার্য অথবা ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যাদেবীর সতীত্বহরণে কামাতুর! মজা হল ইউরোপে—গ্রীক ও রোমক শিল্পীর দল জিউস্-এর এই অবক্ষয় অথবা মানবিকরণ মেনে নিয়ে মূর্তি ও চিত্র রচনা করতে পারলেন; কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর (চিত্রশিল্পের কথা সে-যুগে ওঠে না) সেটা পারলেন না। ক্লাসিকাল যুগ পাড়ি দিয়ে রেনেসাঁর আদি যুগেও দেখছি সেই চিন্তাধারাটি অব্যাহত—লেঅনার্দো 'লীডা ও হংস' চিত্রে অনায়াসে আঁকতে পারলেন জিউস্-এর সেই আদিম-রিপুর প্রতি আসক্তির চিত্র। কিন্তু কোনও ভারতীয় ভাস্কর আসমুদ্র-হিমাচলে কোন যুগেই গড়তে পারলেন না ইন্দ্র-অহল্যা, সূর্য-কুন্তির অবৈধ প্রণয়দৃশ্য! সহস্রাব্দি অতিবাহিত হবার পরে বোধকরি রাজা রবিবর্মাই প্রথম ভারত-শিল্পে সেই ভাবনাটি রূপায়িত করলেন!

কিম্বা ধরুন শিবের কথা। আদিযুগে—ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে দেবাদিদেব ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্যময় পরমপুরুষ। কিন্তু মহাকাব্য ও পুরাণযুগে সেই দেবাদিদেব নিতান্ত মরমানব। এমনকি গুপ্ত-যুগেও দেখছি, কালিদাস প্রথম যুগে তাঁর রঘুবংশের প্রথম শ্লোকে শিব ও পার্বতীর প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে বলছেন, ওঁদের পৃথকরূপে চিন্তাই করা যায় না। বাক্য ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ যেমন পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে 'সম্পৃক্ত', তেমনি এই পরমপুরুষ ও পরমা-প্রকৃতি অবিভাজ্য। শকুন্তলা কাব্যেও মহাকবি হর-পার্বতীকে অপার্থিব করে এঁকেছেন, যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে। অথচ 'কুমারসম্ভবে' কবি হর-পার্বতীর এই দেবভাব রক্ষা করতে পারেননি। কাব্যের অষ্টম সর্গে। সেখানে গন্ধমাদন পর্বতে হর ও পার্বতীর মধুযামিনী যাপনের বর্ণনায় দেবাদিদেব ও আদ্যাশক্তি নেমে এসেছেন মর্ত্যভূমে—সেখানে তাঁরা নিতান্তই রোমাণ্টিক কাব্যের নায়ক-নায়িকা, মানব-মানবী। আরও পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্রের হাতে পড়ে হর-পার্বতীর অবস্থা আরও কাহিল! 'অন্নদামঙ্গলে' শিব ও পার্বতী নিতান্ত আমাদের ছা-পোষা হা-ঘরে ঘরের বর-বউ! বিবাহ-বাসরে বরণের সময় যে শিবের লাজবস্ত্র-বাঘছাল খুলে পড়ে, মেনকাদি পৌর-ললনার দল যাঁকে দিগম্বর অবস্থায় দেখে সলজ্জে ছুটে পালান সে শিব আমাদের অতি-পরিচিত ব্যোম ভোলানাথ! অবশ্য শিব-পার্বতীর এ বিবর্তন ঘটেছে অনেক পরে—আমাদের আলোচ্য যুগের অনেক পরে; তা হোক, আমাদের মূল বক্তব্য : কবি ও পুরাণকারদের হাতে পড়ে দেবদেবীদের যুগে যুগে রূপান্তর ঘটেছে এবং আসমুদ্র-হিমাচল তা মেনে নিয়েছে।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। মুদ্রা-আসন-বাহন-ভঙ্গ ইত্যাদি বাহ্যিকরূপে সামান্য আঞ্চলিক পরিবর্তন ঘটলেও কোন দেবদেবীর চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেনি। যদি বলেন, তার হেতু: ভাস্করদলের কোনও উপায় ছিল না, তাঁরা শিল্প-শাস্ত্রীয় নির্দেশের বাহিরে যাবার অনুমোদন পাননি—তাহলে বলব, ওটা কিন্তু আমাদের উপস্থাপিত মৌলপ্রশ্নের ঠিক প্রত্যুত্তর হল না। আমাদের মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : ভারতভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে অবস্থিত পরস্পরের প্রভাবমুক্ত কবির দল যখন স্বকীয়চিন্তায় দেবদেবীর নানান কাহিনী রচনা করতে পারলেন, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে এনে তাঁদের মানবিক সুখ-দুঃখের ভাগিদার করতে পারলেন—তাদের কাঁদালেন, হাসালেন, ভালোবাসালেন, তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে দ্বারকা, তক্ষশীলা থেকে রামেশ্বরের কোন ভাস্কর্য-শিল্পগুরু কেন সহস্রাব্দিকালের ভিতর এ জাতীয় পরিকল্পনা একবারও অনুমোদন করতে পারলেন না? কেন?—কেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী কেন গড়বার নির্দেশ দিয়ে গেলেন—সূর্যের বুট-জুতো, অগ্নির শ্মশ্রু, কুবেরের স্ফীতোদর, আর গণেশের গজমুণ্ড? আমার অভিযোগ সেই শিল্প-গুরুদের বিরুদ্ধে যাঁরা আঞ্চলিক শৈলীর মূলসূত্রগুলি রচনা করেছেন, বিভিন্ন 'স্কুল'-কে জন্ম দিয়েছেন।

স্বীকার্য—চারিত্রিক বা আঙ্গিক পরিবর্তন অনুমোদন না করলেও দেবদেবীর ঐ মানবীকরণের

প্রবণতা—কবি, নাট্যকার বা লোক-সংস্কৃতির মাধ্যমে যা জনমানসে স্থান পাচ্ছে সে সম্বন্ধে ভাস্করদল উদাসীন ছিলেন না। কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে দেবতাদের মানবিক পরিবেশে আরোপ করেছেন ভাস্করেরা। এদিক থেকে আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ যে উদাহরণটির কথা মনে পড়ছে তা তামিলনাড়ুর মীনাক্ষীমন্দিরে একটি অর্ধোৎকীর্ণ প্যানেল—নারায়ণ শিব ও পার্বতীর বিবাহ দিচ্ছেন। পার্বতীর মুখে নববধূর সলজ্জ কুণ্ঠা, তাঁর মেদিনীনিবদ্ধ-দৃষ্টিতে তৃপ্তি ও আনন্দের আভাস অনবদ্য ; সব চেয়ে সুন্দর সম্প্রদানরত নারায়ণের ভাব। তিনি পার্বতীর ঐ কুণ্ঠাজড়িত হৃদয়াবেগটুকু সকৌতুকে উপভোগ করছেন। শিব-পার্বতীর বিবাহদৃশ্য ভারতের অগণিত মন্দিরেই দেখতে পাওয়া যায় ; কলিঙ্গেও আছে—যেমন পরশুরামেশ্বরে—কিন্তু অন্য কোথাও এই নাটকীয় ভাবব্যঞ্জনা আমার নজরে পড়েনি।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটি কথা বলি। আমার মনে হয় ভারতীয় ভাস্কর এ বিষয়ে যতটা সনাতন পন্থী, ভারতীয় চিত্রশিল্পী বোধকরি কোন যুগেই তা ছিলেন না। চিত্রগুলি দুর্ভাগ্য-বশতঃ কালের কবলে অন্তর্হৃত ; কিন্তু নানাসূত্র থেকে এটা অনুমান করা যায়। যেমন ধরুন—শ্রীহর্ষের 'উত্তরনিষাদচরিতে'র অষ্টাদশ সর্গের বিংশতি শ্লোকের বর্ণনাটি। কবি লিখলেন—'মহারাজা নলের প্রমোদভবনে ছিল একটি বিশা-লায়তন প্রাচীরচিত্র যার বিষয়বস্তু পদ্মসম্ভব (ব্রহ্মা)-এর রমণীরমণ!' ঠিক তার পরের শ্লোকেই কবি বর্ণনা দিচ্ছেন—'বিপরীত প্রাচীরে অপর একটি চিত্রে দেখা যায় ইন্দ্র কর্তৃক গৌতমপত্নী অহল্যার সতীত্ব-হরণ।' কবি নিজেই ব্যাখ্যা করছেন—এ দুটি চিত্রের ঐ স্থানে উপস্থিতির হেতু : 'কামোদ্দীপনার্থং'! আরও গভীরে প্রবেশ করলে, আমরা আন্দাজ করতে পারি রাজা নল তাঁর প্রমোদভবনে ব্যভিচারে রত হবার সময় নরনারীর স্বাভাবিক সম্ভোগদৃশ্য দেখতে চাননি, এমন কি দেবদেবীর স্বাভাবিক রমণদৃশ্যও নয়—তাঁর পাপকার্যের সমর্থনে দেবদেবীর ব্যভি-চার দৃশ্যই ওখানে বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন! সে যাই হোক, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দেখছি সেই ধারাটি অব্যাহত। রাজা রবিবর্মা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ থেকে অহল্যার সতীত্বহরণকে তাঁর চিত্রশিল্পের উপ-জীব্য করতে পেরেছেন। আমাদের কালিঘাটের পটেও দেখছি (চিত্র—5·5) ভারতচন্দ্রের পরিকল্পনায় ঘরোয়া শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্যচিত্র। শিব এখানে দেবাদিদেব নন, ভিক্ষুক। তাঁর ভিক্ষার ঝোলাটি গাছের ডালে আটকানো, আর ক্লান্ত পার্বতী স্বামীর জানুতে দেহভার ন্যস্ত করে পথপ্রান্তে শায়িতা। এমন দৃশ্য ভারতীয় ভাস্কর্যে—শুধু কলিঙ্গে নয়, বৃহত্তর ভারতবর্ষে আমার নজরে পড়েনি।



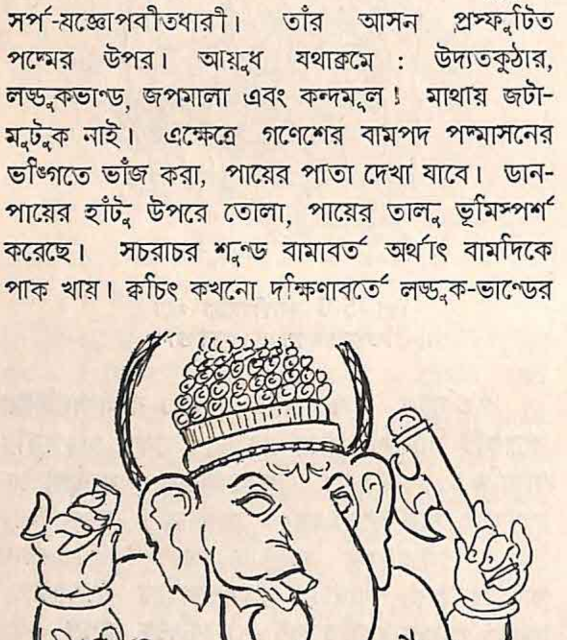
চিত্র—5·5 কালীঘাটের পটে
ভিক্ষুকরূপে হর-পার্বতী।

গর্ভগৃহে মূলবিগ্রহটি ছাড়াও কলিঙ্গমন্দিরে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর 'সংরক্ষিত আসন'। মূলমন্দিরে সম্মুখদিকে (সচরাচর পূর্বদিকে) তো প্রবেশদ্বার ; বাকি তিন-দিকের রাহাপাগের কেন্দ্রীয় অবস্থানে তিনজন পার্শ্বদেবতার আসন। প্রবেশদ্বারের বিপরীতে, অর্থাৎ পশ্চিমে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণদিকে গণেশ এবং উত্তরদিকে পার্বতী। ঐ ঐ অবস্থানে কলিঙ্গ-মন্দিরে ভগ্ন-অবস্থায় কোনও মূর্তি দেখলে বুঝবেন তারা অনিবার্যভাবে কার্ত্তিক, গণেশ ও পার্বতী। সমতারক্ষা বা 'সিমেট্রি'র খাতিরে মনে হতে পারে যে, শিবলিঙ্গের বিপরীতে, পিছনে অর্থাৎ পশ্চিম-কুলুঙ্গিতে যদি পার্বতীর আসন পাতা হত, তাহলে দুই-ছেলে কার্ত্তিক ও গণেশ দিব্যি দু-পাশে থাকতে পারতেন। কিন্তু তা হবার যো নেই! কারণ দেবী-মূর্তি কেন্দ্রীয় গর্ভগৃহস্থিত শিবলিঙ্গের বামে (উত্তরে) থাকতে বাধ্য!

এবার বিভিন্ন দেবমূর্তির গঠনবৈচিত্র্যের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। কিন্তু তার পূর্বে দুটি কথা বলে রাখি। প্রথম কথা : মূর্তি আলো-চনা প্রসঙ্গে আমি যখন বাম বা দক্ষিণ বলব, তখন বুঝতে হবে মূর্তির বাম বা দক্ষিণ, দর্শকের নয়। দ্বিতীয় কথা : আয়ুধগুলির বর্ণনাকালে আমি

প্রতিটি ক্ষেত্রে শুরু করব বামদিকের ঊর্ধ্বতম হস্ত থেকে দক্ষিণাবর্তে বা 'ক্লকওয়াইজ' পদ্ধতিতে। যেমন ধরুন, ষড়ভুজ মূর্তির থেকে আয়ুধগুলির নাম উল্লিখিত হবে এই পর্যায়ে : বাম-ঊর্ধ্ব, বাম-মধ্যম, বাম-নিম্ন, দক্ষিণ-নিম্ন, দক্ষিণ-মধ্যম, দক্ষিণ-ঊর্ধ্ব।

ক ॥ গণেশ : গণেশের দুটি ধ্যানমূর্তি। প্রথমটি বাহনহীন, দ্বিতীয়টি বাহনযুক্ত। প্রথম পরিকল্পনায় গণেশ সচরাচর উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ, সর্প-যজ্ঞোপবীতধারী। তাঁর আসন প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। আয়ুধ যথাক্রমে : উদ্যতকুঠার, লড্ডুকভাণ্ড, জপমালা এবং কন্দমূল! মাথায় জটামুটুক নাই। এক্ষেত্রে গণেশের বামপদ পদ্মাসনের ভঙ্গিতে ভাঁজ করা, পায়ের পাতা দেখা যাবে। ডানপায়ের হাঁটু উপরে তোলা, পায়ের তালু ভূমিস্পর্শ করেছে। সচরাচর শুণ্ড বামাবর্ত অর্থাৎ বামদিকে পাক খায়। ক্বচিৎ কখনো দক্ষিণাবর্তে লড্ডুক-ভাণ্ডের



চিত্র—5·6 উপবিষ্ট, মূষিকহীন গণেশ (শিশিরেশ্বর)।

দিকে প্রসারিত। গণেশের ধ্যান যাই হোক, আমাদের কল্পনায় গদিয়াল সিদ্ধিদাতা গণেশের ব্যঞ্জনা এ মূর্তিতে বেশ পরিস্ফুট। শিশিরেশ্বর মন্দিরের একটি গণেশমূর্তি এখানে দেওয়া গেল (চিত্র—5·6)।

এই জাতের অর্থাৎ বাহনহীন গণেশ স্থাণক বা দণ্ডায়মান অবস্থাতেও গড়া হয়। যেমন চিত্র—5·7। এক্ষেত্রে গণেশ দণ্ডায়মান এবং তাঁর বাহন অনুপস্থিত ; কিন্তু আয়ুধগুলি একই পর্যায়ে সাজানো। শুণ্ডাগ্রভাগ এক্ষেত্রেও বামাবর্তে।

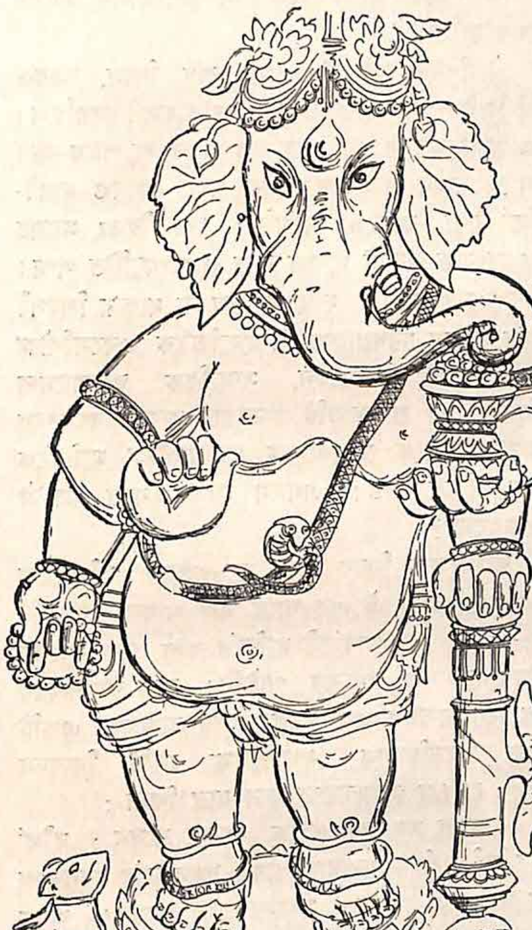
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গণেশ স-মূষিক। আয়ুধগুলির বিন্যাস : লড্ডুক-থালিকা, ভূমিস্পর্শ-কুঠার, জপমালা ও খণ্ডিত দন্তাগ্রভাগ। এই শ্রেণীর গণেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ লিঙ্গরাজের পার্শ্বদেবতা (চিত্র—5·8)। লক্ষ্য করা যাবে এবার মূষিক উপস্থিত, শুণ্ডটি দক্ষিণাবর্তে লড্ডুক-থালিকার দিকে প্রসারিত। কুঠারটি উদ্যত নয়, ভূমিস্পর্শ করেছে। কণ্ঠে সর্প-যজ্ঞোপবীত এবং মাথায় জটামুকুট। ক্ষেত্রবিশেষে এই জাতের গণেশের হাতে কখনো কখনো মূলক বা লেখনীও দেখা যায়।



চিত্র—5·7 স্থাণক গণেশ।

খ ॥ কার্তিকেয় : পঞ্চোপাসনার অন্যতম দেবতা কার্তিকেয়র পূজা ভারতবর্ষে অতি আদিম যুগ থেকে প্রচলিত। সম্ভবত গণপতির পূজার পূর্বযুগ থেকে। বৃহৎসংহিতায় দ্বিভুজ বালক কার্তিকেয়র উল্লেখ আছে ; 'বিষ্ণুধর্মোত্তরে' কুমার

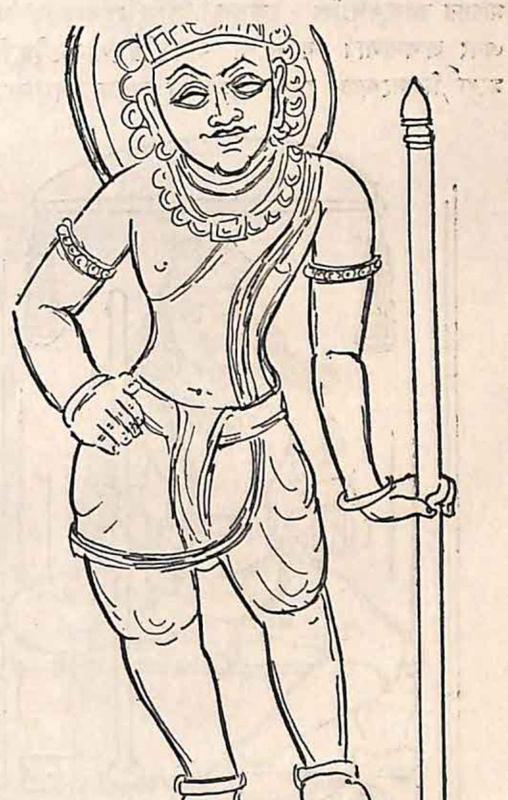
কার্ত্তিকেয় ষড়াননরূপে বর্ণিত। স্কন্দ, কুমার বিশাখা, ষড়ানন, মহাসেন, গুহ, শুভ্রমন্য ইত্যাদি নামেও তিনি পরিচিত। গুপ্তযুগের বহু মুদ্রায় কালিদাসকীর্তিত 'কুমার'-এর মূর্তি উৎকীর্ণ। তিনি রক্তাম্বর, ময়ূরবাহন ; তাঁর আয়ুধ : কুক্কুট, ঘণ্টা, বৈজয়ন্তী-পতাকা, বর্শা ইত্যাদি। অংশু-



চিত্র—5·8 স্থানক গণেশ (লিঙ্গরাজ পার্শ্বদেবতা)।

মন্দেভদাগম, পূর্বকারণাগম, কুমারতন্ত্র প্রভৃতি মূর্তি-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদিতে কার্ত্তিকেয়কে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ এমনকি দ্বাদশভুজ রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি দেবসেনাপতি এবং গণেশের অনুজ।

পণ্ডিতদের চোখে কলিঙ্গ-ভাস্কর্যে কার্ত্তিকেয় মূর্তির আটটি শ্রেণীবিভাগ, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে পারি, কলিঙ্গ-ভাস্কর তাঁর ধ্যানে কার্ত্তিকেয়র দুটি রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের সহজ শ্রেণী-বিন্যাস কুক্কুট-শোভিত এবং কুক্কুটবিহীন। কলিঙ্গে সচরাচর তিনি দ্বিভুজ। বর্শা বা বল্লম তাঁর অনিবার্য আয়ুধ। প্রথম পর্যায়ের মূর্তিগুলিতে কার্ত্তিক দ্বিভুজ, কুক্কুটবিহীন—যেমন দেখছি ভরতেশ্বর, পরশু-রামেশ্বর, শিশিরেশ্বরে। তাতে গুপ্তশিল্পের প্রভাব লক্ষণীয়! কলিঙ্গে শেষ গুপ্তযুগ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই রীতি সচরাচর দেখা যায়। তার পরবর্তীযুগে কুক্কুটযুক্ত মূর্তির আমদানী হয়েছিল দশম শতাব্দী থেকে। আমরা এখানে দুটি কার্ত্তিকেয়



চিত্র—5·9 স্থানক কার্ত্তিকেয় (উত্তরেশ্বর)।

মূর্তি সংযোজন করেছি। প্রথমটি (চিত্র—5·9) উত্তরেশ্বর-দেউল থেকে—স্থানক মূর্তি, আভঙ্গঠাম। এই মূর্তিটির স্টাইলের সঙ্গে কার্লে চৈত্যের দ্বার-পাল মূর্তির এমন সাদৃশ্য কী-করে হল জানি না! দ্বিতীয় মূর্তিটি (চিত্র—5·10) পরশুরামেশ্বরে বসে এঁকেছি। সিংহাসনে আরূঢ় দ্বিভুজমূর্তি। লক্ষ্য করে দেখুন, মূর্তির বাঁ-হাতে বল্লম থাকায় সমভঙ্গ-

মূর্তির বামদিক ভারী হয়ে গেছে ; এ-জন্য শিল্পী ময়ূরের বিকচকলাপে ভারসাম্য রচনা করেছেন।

গ ॥ পার্বতী : কলিঙ্গের শিবমন্দিরে পার্বতী আবশ্যিকভাবে উত্তর পার্শ্বদেবী। স্থাণকমূর্তি, সচরাচর আভঙ্গঠামে ; ক্বচিৎ কখনও সমভঙ্গঠামেও। বিশেষজ্ঞরা পার্বতীমূর্তিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে,—পরশুরামেশ্বর, বৈতাল, স্বর্ণজালেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে মায়ের হাতে কেতকী পুষ্প ; দ্বিতীয় পর্যায়ে—কেদারেশ্বর, রাজারাণী, লিঙ্গরাজ প্রভৃতিতে তাঁর হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম। চতুর্ভুজা মায়ের আয়ুধগুলি : কেতকী/পদ্ম, সুধাভাণ্ড, বরদা এবং জপমালা। কলিঙ্গে যাবতীয় পার্বতীমূর্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মূর্তিটি আছে লিঙ্গরাজের



চিত্র—5·10 উপবিষ্ট কার্ত্তিকেয় (পরশুরামেশ্বর)।

উত্তর রাহাপাগের কেন্দ্রস্থলে (চিত্র—5·11)। মায়ের চারটি হাতই ভেঙ্গে গেছে। এঁর নাম নিশা-পার্বতী। কেন এই অদ্ভুত নাম তার কোনও কারণ উদ্ধার করতে পারিনি। একবার আমি যখন উড়িষ্যা পরিক্রমাতে যাই তখন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি সারাটা অপরাহ্ন-কাল নিশা-পার্বতীর একটি ছবি এঁকেছিলেন। বারে বারে তাগাদা দিয়েও তাঁকে ওঠাতে পারিনি। সূর্যালোক অপসৃত হলে বাধ্য হয়ে কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'ধরতে পারলুম না।'

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি—'কী' ?

অপ্রস্তুতের হাসি হেসে উনি বলেছিলেন, 'মায়ের মুখের হাসিটি।'

ঐ বিচিত্র হাসিটির কথা বাদ দিলে, আরও দুটি জিনিস আমাদের মুগ্ধ ও কৌতূহলী করেছিল। প্রথম কথা, মায়ের এক পায়ে মল আছে, দু পায়ে নয়। কেন ? এমন এক পায়ে 'মল'-পরা কোনও নারীমূর্তি তো কখনও দেখিনি। দ্বিতীয়তঃ, মায়ের বামে প্রকাণ্ড একটি মৃণাল দণ্ড ও প্রস্ফুটিত পদ্ম। দুদিকে নেই কেন ? দক্ষিণে পদ্ম না থাকায় শিল্পী মায়ের দক্ষিণ চরণপ্রান্তে সিংহমূর্তিকে 'একসেন্ট্রিক' করে খোদাই করেছেন, সামূহিক ভারসাম্যের খাতিরে। ঐ পদ্মদণ্ডটি অজন্তার অবলোকিতেশ্বর পদ্মপানি থেকে চীনখণ্ডের 'ক্বোয়াংইন্' মূর্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে কেমন করে এল ঐ পরিকল্পনা ?

কলকাতায় ফিরে এসে দু-একজন পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেছিলাম ঐ এক-পায়ে 'মল' থাকার ব্যঞ্জনাটি কী ; এবং নিশাপার্বতী মূর্তির কথা তাঁরা জানেন কিনা। কোনও সদুত্তর পাইনি। বেশ কয়েকবছর পরে লিঙ্গরাজের এক বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। যদ্ শ্রুতম্ সেটি নিবেদন করি : দেখুন আপনাদের মনে ধরে কিনা :

একবার মহাদেব নাকি ধ্যানে বসেন ; দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও যখন তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল না তখন দেবকুল সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। অথচ শিবের ধ্যানভঙ্গ করার সাহস কারও নেই—অনঙ্গদেবের ভস্ম হয়ে যাবার পরের ঘটনা এটি। ফলে উর্বশী-মেনকা-রম্ভা প্রভৃতি কোনও নৃত্যপটিয়সীই আর এগিয়ে আসে না। তখন পার্বতী স্বয়ং সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গভীর পূর্ণিমারাত্রে তিনি ধ্যানস্থ মহাদেবের সম্মুখে নৃত্যারম্ভ করেন। শিবের ধ্যান ভাঙে ; চোখ চেয়েই পার্বতীকে দেখে তিনি খুশিয়াল হয়ে ওঠেন। তৃতীয় নয়নের অগ্নি নয়, অপর দুটি নয়নেই ফুটে ওঠে প্রেমের প্রতিচ্ছবি। নিশাকালে নৃত্যরতা এই পার্বতীর নাম—নিশা-পার্বতী। শিল্পী প্রচলিত অলঙ্কারশাস্ত্রকে (উভয়-

অর্থে) অস্বীকার করে মায়ের এক পায়ে একটিমাত্র মল পরিয়েছেন। বোঝাতে—ইনি নৃত্যরতা হওয়া সত্ত্বেও নর্তকী নন। ভুল করে 'ভেনাস' ভেব না, ইনি ভবভাবিনী—ভবতারিণী!

মাতৃস্বরূপিনী : 'ভেনাস-কাম-মাদোনা'।

অন্যত্রও ইনি মন্দিরের নানান অংশে উপস্থিত। মহিষমর্দিনীর দুটি ধ্যানমূর্তি লক্ষ্য করা যায়, মূর্তিদ্বয়ের পার্থক্য মহিষাসুরের আকৃতিতে। প্রথম পর্যায়ে, যেমন বৈতালে—মহিষাসুরের মস্তক মহিষের, দেহ মানুষের। দ্বিতীয় পর্যায়ে—তারা



চিত্র—5·11 নিশাপার্বতী (লিঙ্গরাজ, উত্তর পার্শ্বদেবতা)।

ঘ ॥ মহিষমর্দিনী : বৈতাল ও শিশিরেশ্বর মন্দিরে পার্শ্বদেবতা হিসাবে আছেন মহিষমর্দিনী।

সংখ্যায় অল্প—মহিষাসুরের মুণ্ড মানুষের, দেহ মহিষের ; কর্তিত মহিষদেহ থেকে মনুষ্যাকৃতি মুণ্ড

নির্গত। মহিষমর্দিনীমূর্তি আবশ্যিকভাবে স্থাণক, অতিভঙ্গ মূর্ছনায়। মায়ের আট হাত। ভুবনেশ্বরে বোধকরি শ্রেষ্ঠ উদাহরণটি আছে বৈতালে। আয়ুধ-নিচয় : ঢালিকা, কার্মুক, সর্প, অসুরমুণ্ডে-স্থাপিত ; শায়ক বল্লম (অসুরবক্ষে প্রোথিত), বজ্র ও কৃপাণ। সিংহ আবশ্যিকভাবে উপস্থিত। ব্যক্তিগত রুচির মূল্যায়নে বলতে পারি, সারা কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহিষমর্দিনীমূর্তিটি দেখেছি খিচিঙ-এ মূল মন্দিরের উত্তর-পার্শ্বদেবী হিসাবে। কুলুঙ্গিতে থাকলেও সেটি অর্ধোৎকীর্ণ (অল্টো-রিলিভো) নয় ; একেবারে 'ফ্রি-স্ট্যান্ডিং'।

ঙ ॥ **হরপার্বতী** : একটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে বলা যায় ভুবনেশ্বরে দু-জাতের হরপার্বতী মূর্তি নজরে পড়ে। প্রথম শৈলীতে হর ও পার্বতী পৃথগাসনে উপবিষ্ট। তাঁদের বাহনদ্বয়—ষণ্ড ও সিংহ আসনের তলে উপস্থিত। শিব চতুর্ভুজ। উপর দিকের দুটি হাতে ত্রিশূল ও জপমালা ; নিচের হাত দুটির সংস্থাপনে শিল্পাচার্য কলিঙ্গ-ভাস্করকে স্বাধীনতা দিয়েছেন দেখছি। কোথাও সেদুটি হাতে শিব বীণা বাজাচ্ছেন, কোথাও মাতৃমূর্তিকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করেছেন। পার্বতীর দুটি হাতের ব্যঞ্জনাতেও নানান বৈচিত্র্য। একটি বিশেষ হর-পার্বতী মূর্তিতে মায়ের হাত দুটি মিনতির ভঙ্গিতে জড়াজড়ি করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পার্বতী শিবের বাম-জানুর উপর উপবিষ্ট। তাঁর বাম হস্তে একটি দর্পণ, দক্ষিণহস্ত শিবকে বেষ্টন করে। শিবের আয়ুধ, এক্ষেত্রে : ত্রিশূল, জপমালা ; জননী মূর্তির বাম স্তন এবং বরদা।

বলাবাহুল্য প্রথম জাতের মূর্তি 'যুগল' পর্যায়ের মিথুন এবং দ্বিতীয় জাতের মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে যখন কলিঙ্গে মিথুনাচারের ভাবনা আরও গভীরতা লাভ করেছে।

ব্যতিক্রম মূর্তিটি আছে মেঘেশ্বর মন্দিরে, প্রায় ভগ্নদশায়। সেখানে শিবের তিনটি মুখ দেখা যায়, এলিফান্টা-গুহার সুবিখ্যাত ত্রিমূর্তির পরিকল্পনায়। তিনি ষড়ভুজ।

খিচিঙ-এ হর-পার্বতী মূর্তিতে একটি নূতন চিন্তাধারা বিবর্তিত হয়েছিল, যেকথা খিচিঙ অধ্যায়ে আলোচনা করা যাবে।

চ ॥ **লাকুলীশ** : পাশুপত-ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশের উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি প্রায়শই চতুর্ভুজ, কখনও বজ্রাসনে কখনও বা প্রলম্বিতপদ। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সত্ত্বেও তাঁকে মাঝে মাঝে ধর্মচক্র-প্রবর্তনমুদ্রায় দেখতে পাওয়া যায় ; এবং সাধারণ যাত্রী তাঁকে বুদ্ধমূর্তি বলেই মেনে নেয়। লাকুলীশের কোন কোনও মূর্তির নিচে পাশুপতধর্মের পরবর্তী যুগাচার্যদের মূর্তি খোদিত।

ছ ॥ **দিকপাল** : মন্দিরের তিনটি প্রধান কুলুঙ্গিতে যেমন তিন দেবদেবীর আসন সুনির্দিষ্ট তেমনি মন্দিরের চার-দুকুনে আটকোণায় আটজন দিকপালের আসন চিহ্নিত। তাঁদের আয়ুধ, বাহন এবং অবস্থান কোথায় হবে তা অগ্নিপুরাণে 'দিক-পতিযাগো' নামক ষটপঞ্চাশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। একেবারে প্রথম পর্যায়ের কলিঙ্গ-দেউলে কিছু হের-ফের থাকলেও পরবর্তী যুগে প্রতিটি দিকপালের সুচিহ্নিত আসন। তারা হলেন যথাক্রমে :

উত্তরে—কুবের ;
উত্তর-পূর্বে—ঈশাণ ;
পূর্বে—ইন্দ্র ;
দক্ষিণ-পূর্বে—অগ্নি ;
দক্ষিণে—যম ;
দক্ষিণ-পশ্চিমে—নৈঋত ;
পশ্চিমে—বরুণ ;
উত্তর-পশ্চিমে—বায়ু।

কলিঙ্গ ভ্রমণকালে আপনারা যাতে মূর্তি-গুলিকে সহজে সনাক্ত করতে পারেন তাই দুটি সহজ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করি। একটা তাত্ত্বিক, একটা যান্ত্রিক। তাত্ত্বিক পদ্ধতি হচ্ছে মূর্তিগুলিকে এভাবে সনাক্ত করতে হবে :

(1) কুবের স্ফীতোদর, তাঁর সম্মুখে ধনভাণ্ড, কখনওবা পশ্চাতপটে কল্পতরু।

(2) ঈশাণ হচ্ছেন শিব, ফলে ত্রিশূল ও তৃতীয় নেত্র পাবেন।

(3) হস্তধৃত বজ্র নজরে না পড়লেও ইন্দ্রকে চেনা যাবে তাঁর বাহন দেখে : ঐরাবৎ।

(4) অগ্নি শ্মশ্রুমণ্ডিত, তাঁর বাহন মেষ ; তাঁর পশ্চাতে সচরাচর অগ্নিশিখা।

(5) যম—মহিষবাহন, দণ্ডধারী।

(6) নৈঋত—তাঁর এক হস্তে কর্তিত মনুষ্য-মুণ্ড, এবং তাঁর পদতলে শায়িত একটি মানুষ।

(7) বরুণের হাতে পাশ ; তিনি মকরের পিঠে আরূঢ়।

(8) বায়ুর হাতে পতাকা ; তাঁর বাহন হরিণ অথবা শশক।

যান্ত্রিক পদ্ধতিটি আরও সরল : পকেট থেকে কম্পাস বার করে দেখে নিন মূর্তিটি মন্দিরের কোন কোণে অবস্থিত! তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে 'পার্সোনাল এরর' হবার আশঙ্কা, যান্ত্রিক পদ্ধতি : অমোঘ।

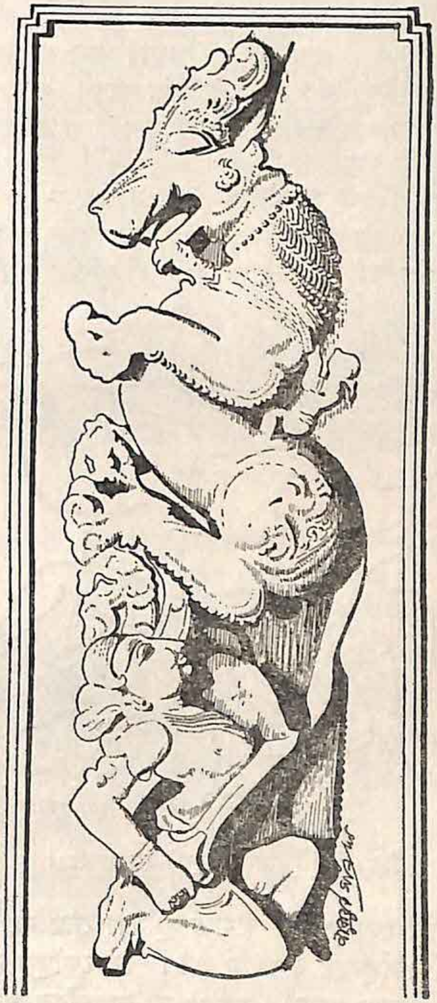
এ-ছাড়াও কলিঙ্গে অনেক অনেক দেবদেবীর মূর্তি আছে। নটরাজ, সপ্তমাতৃকা, বরাহ, নৃসিংহ, অর্ধনারীশ্বর, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সকলের কথা লিখতে হলে এ মহাভারত শেষ হবে না।

2· কল্পমূর্তি :

অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধর্ব, নাগদম্পতি ইত্যাদি কল্পমূর্তির কথা এখানে আলোচনা না করলেও চলবে, কারণ তারা স্থানকাল নির্বিশেষে ভারত-শিল্পের সুপরিচিত সম্পদ। আমরা এখানে বিশেষ কয়েকজাতের কল্পমূর্তির কথা জেনে নেব, যা কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের নিজস্ব অবদান। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্দির-স্থাপত্যে তাদের আসনও সুনির্দিষ্ট।

ক ॥ ব্যাল বা বিরাল : কলিঙ্গ-ভাস্করের এ-এক অনবদ্য অবদান। কমলাকান্ত এবং প্রসন্ন গোয়ালিনীর স্নেহধন্য আমাদের চিরপরিচিত চতুষ্পদের সঙ্গে এর নাম সাদৃশ্য থাকলেও আকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর। তাই আমরা বিড়ালে 'ড়'-র পরিবর্তে 'র' দিয়ে, এ জীবটিকে উল্লেখ করব। এই 'বিরালের' মুখ হাতীর মত হতে পারে—তখন তিনি গজ-ব্যাল বা গজ-বিরাল ; আবার রাক্ষস বা সিংহের মতও হতে পারে, তখন তিনি সিংহ-বিরাল। সচরাচর এর পদতলে দেখা যাবে পদদলিত কোন হতভাগ্য মানুষ অথবা একটি হস্তী। এ'র ব্যঞ্জনা হচ্ছে—বীরত্ব! এবম্বিধ বীর বিরালের সাক্ষাৎ বাস্তব জগতে না পেলেও উড়িষ্যার মন্দিরে আপনি বারে বারে পাবেন। তাই এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকা ভালো (চিত্র—5·12)।

খ ॥ গজ-সিংহ : শায়িত হস্তীর উপর সিংহ-মূর্তি একটি বিচিত্র পরিকল্পনা। তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কোনার্কের পূর্বদ্বারে, বস্তুত প্রবেশমুখে। কারও কারও মতে এটি বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়ের প্রতীক। আবার কেউ বলেন, এ মূর্তি আমদানী করেছেন কেশরী বংশ। সিংহটি কেশরী বংশের প্রতীক। এ-ছাড়া মন্দির-চূড়ায় দু-জাতের সিংহমূর্তি দেখা যায়। কখনও সিংহ একটি-মাত্র থাবা উঁচু করে রেখেছে। তাকে পাণ্ডারা 'উড়গজ-সিংহ' নামে পরিচয় করিয়ে দিলেন।



চিত্র—5·12 সিংহ-বিরাল।

দ্বিতীয় জাতের সিংহ দুটি থাবাই শূন্যে তুলে যেন সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় ; তার নাম 'ঝাম্পান-সিংহ'। সেটি বিমানের বাড় অংশের শেষ-প্রান্তে পূর্বদিকে ঝুঁকে থাকে।

গ ॥ কীর্তিমুখ : এ অলঙ্করণটি বহুল প্রচলিত। ব্যাদিত-বদন সিংহের মুখ থেকে যেন মুক্তার

মালা ঝরে পড়ছে। বৈতাল-দেউলে মহিষমর্দিনী-মূর্তির দু-পাশে যে দুটি মিথুন আছে তাদের মাথার উপরের প্যানেল দুটি লক্ষ্য করুন। দু-পাশে দুটি সিংহ-ব্যাল, তাদের পিঠে সওয়ার এবং পদতলে একটি পলায়নপর মানুষ ; কিন্তু উল্লম্ফনরত সিংহের মুখ দিয়ে মুক্তা ঝরছে। কেন্দ্রীয় সিংহটির মুখ দিয়েও অনুরূপ মুক্তার শতনরী। এই অলঙ্করণটিই কীর্তিমুখ। শিল্পী বলতে চান : রাজার কীর্তি নাকি এভাবেই ঝরে পড়ে। মুক্তেশ্বর দেউলেও অনুরূপ একটি কীর্তিমুখ দেখা যাচ্ছে।

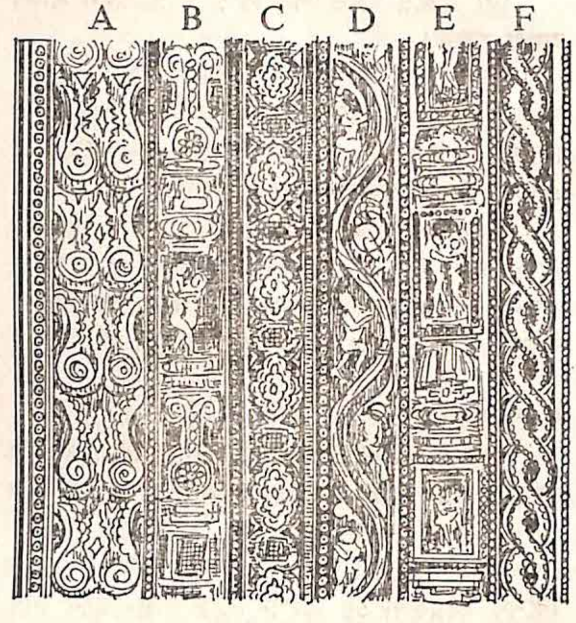
ঘ ॥ **মনুষ্যকৌতুকী** : নরদেহকে একটি অলঙ্করণরূপে দেখার বিচিত্র প্রবণতা কলিঙ্গ-শিল্পীর এক বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে নর বা নারীমূর্তির মানবিক



চিত্র—5·13 বাল-কৌতুকী (মুক্তেশ্বর)।

আবেদন কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় না, তারা একটা কৌতুকের উপাদান মাত্র। সে কৌতুক নানান জাতের হতে পারে। কখনও তা ভেল্‌কির পর্যায়ে, কখনও আলিম্পনচাতুর্যের বিষয়বস্তু। প্রথমটির উদাহরণ মুক্তেশ্বর মন্দিরের বাহির-প্রাচীরে একটি ভাস্কর্য। এখানে দুটি মাথা অথচ চারটি দেহ। প্রতিটি মাথাকে দুটি ধড়ের সঙ্গে কল্পনা করে চারটি কৌতুকমণ্ডিত শিশুমূর্তি কল্পনা করা যায় (চিত্র—5·13)।

দ্বিতীয় জাতের মনুষ্য কৌতুকীর একটি উদাহরণ কোনার্ক জগমোহনের পূর্বদ্বার থেকে সঙ্কলন করা গেল। দ্বারের যে অংশটিকে 'জ্যাম্' বলে সেখানে পর পর কতকগুলি আলিম্পনরেখা (চিত্র—5·14)। তার ভিতর D-চিহ্নিত অলঙ্করণটি বর্ধিত



চিত্র—5·14 কোনার্ক পূর্বদ্বারের 'জ্যাম'-অংশের নক্‌শা।

আকারে এঁকে দেখানো হল (চিত্র—5·15)। বালকের দল লতা বেয়ে উঠ্‌ছে ; কিন্তু তাদের মুখ্য আবেদন অলঙ্করণের ; যেন প্রতিটি ডালে এক-একটি ফুল ফুটেছে।

3· অলঙ্করণ-নক্‌শা :

পদ্মলতা, শঙ্খলতা, গোমূত্র-রেখা ইত্যাদি প্রচলিত আলিম্পনরীতির নানা-চাতুর্য স্বাভাবিকভাবেই কলিঙ্গ-দেউলে দৃষ্ট হয়। পীড়-দেউলের পীড়মুণ্ডি এবং ক্ষুদ্রামলকমুণ্ডি দিয়েও মন্দির-প্রাচীরের শোভাবর্ধন প্রয়াসের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষণীয়। যেখানেই মিথুন বা ভাস্কর্য আছে, সেখানেই তার চারপাশে নানান নক্‌শায় 'ফ্রেমিং' করা হয়েছে। এ চাতুর্য সবজাতের ভারতীয় মন্দিরেই দৃষ্ট হয়। আমরা এখানে কলিঙ্গরীতির বিশেষ জাতের কয়েকটি নক্‌শার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি।

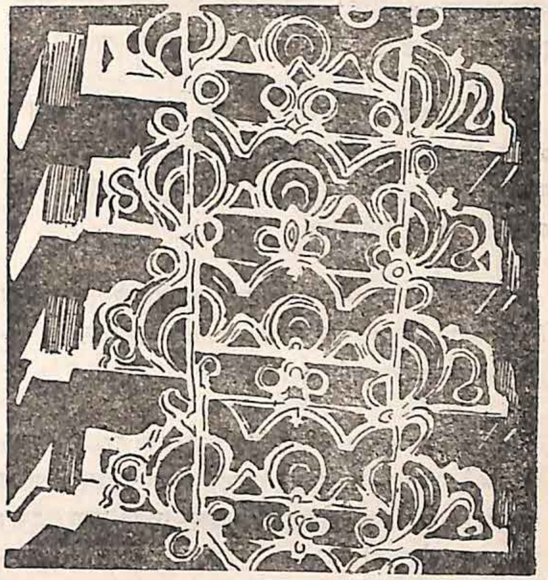
ক ॥ **ফাঁদগ্রন্থী** : ফতেপুর-সিক্রির সেলিম চিস্তির দরগা বা দেওয়ান-ই-আমে, তাজে বা লাল্‌-কিললায় মার্বেলের উপর জালিকাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হই ; কিন্তু তার কয়েক শতাব্দী পূর্বে কলিঙ্গ-ভাস্কর জালিকাজে যে নিপুণতা দেখিয়েছেন

তাও বিস্ময়কর। আরও বড় কথা এ-কাজ করা হয়েছে বালি-পাথরে, স্যান্ডস্টোনে—অর্থাৎ মার্বেলে নয়। বালি-পাথরের গ্রেনগুলি বড় দানার, তাতে সূক্ষ্মকাজ তোলা তুলনামূলকভাবে কঠিন ; কারণ ছেনির আঘাতে বড় বড় চাক্‌লা ছুটে বেরিয়ে যাবার

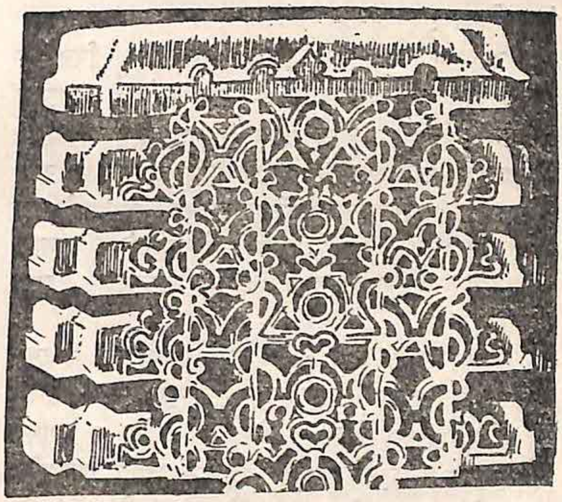


চিত্র—5·15 কোনার্ক পূর্বদ্বারের 'D'-চিহ্নিত নক্‌শায় মনুষ্য-কৌতুকী।

আশঙ্কা সেখানে বেশি। কলিঙ্গে এই পাথরের জালিকাজের নাম ফাঁদগ্রন্থী। আমরা এখানে মুক্তেশ্বর-দেউলের দুটি ফাঁদগ্রন্থীর স্কেচ যুক্ত করে দিলাম। লক্ষ্য করে দেখুন, গণ্ডী-অংশের কারুকার্য একটু মোটা ধরনের, কারণ তা দর্শকের দৃষ্টিপথে বেশি দূরে অবস্থিত ; অপরপক্ষে বাড়-অংশে—



চিত্র—5·16 গণ্ডী-অংশের ফাঁদগ্রন্থী (মুক্তেশ্বর)।



চিত্র—5·17 বাড়-অংশের ফাঁদগ্রন্থী (মুক্তেশ্বর)।

যেখানে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আছে—সেখানে অনেক সূক্ষ্মধরনের কারুকৃতি।

খ ॥ ভো : খিলানের উপরে লিণ্টেল-অংশের কেন্দ্রীয় অবস্থানে গোলাকার একটি নক্‌শা। ভারতীয় মন্দিরে এর বহুল ব্যবহার। কলিঙ্গ-স্থাপত্যে এর নাম : ভো। 'ভো'-এর মাঝখানে যে

মূর্তি থাকে তার নামানুসারে ভো-এর নামকরণ করা হয়। যেমন নারায়ণ-ভো, সূর্য-ভো, গজলক্ষ্মী-ভো, নটরাজ-ভো প্রভৃতি। মুক্তেশ্বর দেউলে সম্মুখস্থ তোরণের কেন্দ্রীয় অবস্থানটি লক্ষ্য করে দেখুন।

গ ॥ রত্নহার : কখনো-কখনো সারি সারি মালার মতো রত্নহার সাজিয়ে কোনো স্থাপত্যের অলংকরণ করা হয়। দুই-তিন-পাঁচ সারি মুক্তার মালা, তার মাঝে মাঝে মুক্তার নলি।

ঘ ॥ পীড়মুণ্ডি : মন্দিরগাত্রে কোন ভাস্কর্যের উপর সারি সারি পীড়মুণ্ডি অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন পীড়-দেউল-মস্তক খোদাই করা হয়।

ঙ ॥ মকরমুখ : লিণ্টেল, ছজ্জা বা কোনো জল-নিকাশী নালার বাইরের দিকে ঝুঁকে-থাকা অংশে মকরমুখ বা কুম্ভীরমুখ অলংকরণ করা হয়। রোমক, বাইজেণ্টাইন বা বারোক-স্থাপত্যের 'গার-গয়েল' অলংকরণটির সংগে এর তুলনা করা চলে।

4· নায়িকা :

কলিংগ ও খাজুরাহো শিল্পীর বিরুদ্ধে একটি প্রচলিত অভিযোগ এই যে, তাঁরা নবরসের সন্ধানে অভিযাত্রা করে প্রথম রসপানেই আত্মহারা হয়েছেন। অভিযোগটা পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। আদিরসের প্রতি তাঁদের পক্ষপাতিত্বটা অনস্বীকার্য ! ওঁরা যেন কিছুতেই ভুলতে পারেননি আদিকবি-সৃষ্ট প্রথম শ্লোকের শেষ শব্দটি !

শুধু তাই নয়, এই দুই শৈলীতে নরদেহ রূপায়ণের চেয়ে নারীদেহ রূপায়ণের দিকেই শিল্পীর পক্ষপাতিত্ব দৃষ্টিকটু। গ্রীক ও রোমক যুগ থেকে রেনেসাঁ পর্যন্ত পশ্চিমখণ্ডের শিল্পীরা এ-জাতীয় পক্ষপাতিত্ব মোটেই দেখাননি। আদি গ্রীক-ভাস্করের ছেনি-হাতুড়ি শুধু 'ভেনাস-ডি-মিলো' বা 'কনিডিয়ান-ভেনাস' গড়েই ক্ষান্ত হয়নি, গড়েছে 'ডিস্‌কোবোলাস্‌' অথবা 'লাকুন-গ্রুপ'। নারীর সুডৌল দেহচ্ছন্দ এবং পুরুষের পেশীমণ্ডিত পৌরষ দুদিকেই ছিল গ্রীকশিল্পীর দ্বিবিধ আকর্ষণ। মিকেলাঞ্জেলোর হাতে তো পুরুষমূর্তিই বেশি খুলেছে : ডেভিড, ব্যাক্কাস, মোজেস্‌, বন্দী প্রভৃতি। অথচ কোনার্কের মূর্তিগুলি থেকে দশটি শ্রেষ্ঠ একক মূর্তি যদি কেউ বেছে নিতে চান দেখবেন তিনি অন্তত আটটি নারীমূর্তি বেছে নিয়েছেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, নির্বাচনকারী রমণী হলেও !

এই একক নারীমূর্তিগুলিকে বিভিন্ন শাস্ত্রকার বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন : নায়িকামূর্তি, কন্যামূর্তি, সুরসুন্দরী, প্রভৃতি। ভাব ও রসের বিচারে এদের শ্রেণীবিন্যাস চলতে পারে ; কিন্তু বেশ বোঝা যায় শিল্পীর মূল উদ্দেশ্য নারীরূপের প্রতি অর্ঘ্যদান। এমনকি সন্তানক্রোড়ে জননী-মূর্তিতেও যেন শিল্পী গণেশজননীর পরিবর্তে উর্বশীকে খুঁজেছেন, মাদোনার বদলে ভেনাস-কে।

নায়িকামূর্তিগুলির মাপজোখ, ভঙ্গিমা, রূপা-রোপ প্রভৃতি বিষয়ে শিল্পশাস্ত্রে নানান নির্দেশ আছে, কিন্তু তাদের শ্রেণীভুক্ত কোথাও করা হয়নি। অন্তত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অথবা নির্মলচন্দ্র সংকলিত শিল্পশাস্ত্রে এই জাতের শ্রেণীবিন্যাস আমার নজরে পড়েনি। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীবিদ্যা দেহিজার একটি গ্রন্থে কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেল :

গত দশকে নাকি একটি প্রাচীন ওড়িয়া শিল্প-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'শিল্প প্রকাশ' ; লেখক জনৈক রামচন্দ্র কৌলাচার—একজন কলিংগ-স্থপতি—যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুশলী নদীতীরে বাস করতেন। তিনি তাঁর এক পূর্ব-সুরীর রচিত 'সৌধিকগম' নামক এক প্রাচীন পুঁথি থেকে নাকি শিল্পশাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্র সংকলন করেছেন। রামচন্দ্রের লেখা 'শিল্প-প্রকাশ' সংস্কৃতে লেখা। এই পাণ্ডুলিপিটির আবিষ্কারক অ্যালিস বনার (Alice Boner) এবং সদাশিব নাথ রথ। তাঁরা যৌথভাবে এটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছেন। সে গ্রন্থে ভূমিকায় বলা হয়েছে পাণ্ডুলিপির তিনটি পুঁথি ওঁরা পেয়েছেন—ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু ওড়িয়া লিপিতে। প্রথমটি পাওয়া গেছে পুরীতে, দ্বিতীয়টি অন্ধ্রের 'মঞ্জুষা' জনপদে এবং তৃতীয়টি অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামে। আবিষ্কারকের দাবী মূল পুঁথিটি অনন্তবর্মন চোড়গংগ দেবের সিংহাসন আরোহণের সময়ে (আঃ 1077 খ্রীঃ) রচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে—যখন ঐ শিল্পশাস্ত্র অনু-সারে ওড়িষ্যা বা অন্ধ্রে কোন মন্দির নির্মিত হত না—অর্থাৎ ঐ শিল্পশাস্ত্রের কোনও ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল না—তখন কেন যে তিন তিনজন অনু-বাদক তিন স্থানে বসে এ গ্রন্থের কপি করে পুঁথি

রচনা করেছেন তার কোন জবাবদিহি আবিষ্কারকেরা লিপিবদ্ধ করে যাননি।

আমি মূল পুঁথি তো দেখিইনি এমনকি বোনার-কৃত ইংরাজি অনুবাদটিও সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা দেহিজা দশ পৃষ্ঠায় যে চুম্বকসারটি তাঁর গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টে যোগ করেছেন সেটি পড়েছি। মূল যখন দেখিনি, তখন মতামত দেওয়া যায় না, তবে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ ঐ 'শিল্প প্রকাশ'কে মৌলিক গ্রন্থ বলে মেনে নিয়েছেন বলেও শুনিনি।

যাই হোক, সেই গ্রন্থে নায়িকাদের একটি শ্রেণী-বিভাগের চেষ্টা করা হয়েছে। নায়িকা বা অলস-কন্যার মূর্তি গঠনের জন্য একটি 'অলস-যন্ত্র' চিত্র-সহকারে বিশ্লেষণও করা হয়েছে। চিত্র ও বিশ্লেষণ-সূত্রের নির্দেশ স্থানে স্থানে বোধগম্য নয় ; যেটুকু বোঝা যাচ্ছে--দেখা যায় তা কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের বাস্তবমূর্তির সঙ্গে মেলে না। ফলে আমরা ঐ 'অলস-যন্ত্র' চিত্রটির বিস্তারিত আলোচনা করছি না। অপরপক্ষে শিল্পপ্রকাশে নির্দেশিত চৌদ্দ প্রকারের নায়িকামূর্তির তালিকাটি এখানে সংযুক্ত করা গেল :

1· তোরণ—নায়িকামূর্তির পশ্চাদপটে একটি তোরণদ্বার
2· মুগ্ধা—অপাপবিদ্ধা কিশোরীর মুগ্ধরূপ
3· মানিনী-দায়িতের প্রতি অভিমান করেছে
4· দলমালিকা—পুষ্পমাল্য হাতে নায়িকা
5· পদ্মগন্ধা--পদ্মফুল আঘ্রাণ করছে
6· দর্পণা—দর্পণহস্তা
7· বিন্যাস—আপন চিন্তায় বিভোর
8· কেতকীভরণা—কেতকীপুষ্পে সজ্জিতা
9· মাতৃমূর্তি—স্তনদায়িনী, অথবা শিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারতা
10· চামর—চামরহস্তা
11· গুণ্ঠন - গুণ্ঠনাবৃতা
12· নর্তকী—নৃত্যরতা
13· সুকসারিকা—সুকসারীর সঙ্গে
14· নূপুরপাদিকা—নূপুর পরিধান করছে
15· মর্দলা--ঢোলক বাজাচ্ছে

শ্রেণী-বিন্যাসটি আমাদের আদৌ পছন্দ হয়নি। কতকগুলি অনুষঙ্গ ধরে এ শ্রেণী-বিন্যাসে কোন পারম্পর্য নেই। আমরা তাই আমাদের বিবেচনামত পুনরায় শ্রেণী-বিন্যাস করছি :

A. **অনুষঙ্গ-ভিত্তিক** (based on association) :

1· **ভাবানুষঙ্গ** : প্রসাধনরতা, অভিসারিকা, কুসুমপ্রিয়া,
2· ক্রিয়া-অনুষঙ্গ : পত্রলেখিকা, নৃত্যগীতরতা।

B. **ভাব-ভিত্তিক** (based on mood) :

1· **প্রিয়া-ভাব** : অলসকন্যা—মুগ্ধা, মালিনী, প্রতীক্ষারতা, আশ্লেষশয়না ;
2· **মাতৃ-ভাব** : সন্তানবৎসলা, স্তনদায়িনী।

এইভাবে শ্রেণী-বিন্যাস করলে—আমাদের মতে —বিভিন্ন যুগে শিল্পমানস কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল তা অনুধাবন করা যায়। এক-এক মন্দিরে, অর্থাৎ এক-এক যুগে এক-একটি অনুভাবনা প্রাধান্য লাভ করেছে। বিস্তারিত আলোচনা গবেষকদের জন্য মুলতুবি রেখে দু-একটি ইঙ্গিত দিয়ে যাই বরং :

কলিঙ্গের প্রথম যুগে মাতৃমূর্তি বিশেষ নজরে পড়ে না, অথচ মধ্য ও শেষ যুগে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অপরপক্ষে খাজুরাহোতে এ জাতীয় মূর্তি খুবই কম। তার কারণটা কী? রমণী-মূর্তির পরিণত সৌন্দর্য যে তার ফলভারনম্র রূপ, এটা বুঝতে যতটা সময় লাগে তা কি দু-তিন শতাব্দীর স্ফুরণে প্রতিধান করার পূর্বেই খাজুরাহো শৈলী অস্তমিত হয়েছিল ?

আমরা এবার বিভিন্ন জাতের নায়িকামূর্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় ব্রতী হতে পারি :

I. **অনুষঙ্গ-ভিত্তিক** :

ক ॥ **প্রসাধনরতা** : দয়িত-মিলনের পূর্বে যে প্রস্তুতি পর্যায়--শৃঙ্গার বা সাজগোজের অন্তরালের ব্যাপারটা—তাই এখানে শিল্পীর মৌল উপজীব্য। এটি অনুষঙ্গ-ভিত্তিক—ভাবানুসঙ্গ : অর্থাৎ আসন্ন-মিলনের প্রস্তুতিপর্ব।

আমরা এখানে তিনটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছি—কবরীবন্ধনরতা (চিত্র—5·18) এবং সিন্দুর-দানরতা (চিত্র—5·19 এবং 5·20)। প্রথম উদাহরণে শিল্পী তাঁর নায়িকাকে প্রায় একশ আশি ডিগ্রি পাক খাইয়েছেন। যেন মেয়েটির ভঙ্গিমার মধ্যেই তার প্রসাধন-নৈপুণ্যের বিকাশ—অর্থাৎ আজানু-

লম্বিত বেণী ও দেহকাণ্ড যেন একে অপরের উপমান—একইভাবে পাক খাচ্ছে। মনে পড়ে যায় 'শ্যামলী'র সেই বর্ণনা—'বাঁধছিল চুল, বেণী পাকিয়ে পাকিয়ে, কাঁটা বিঁধে বিঁধে!' কাঁটা অবশ্য সবসময়েই বেঁধে পাঠক অথবা দর্শকের বুকে—কী কাব্যে, কী ভাস্কর্যে।

দ্বিতীয় উদাহরণে (চিত্র—5·19) নায়িকা একই ভঙ্গিমায় পিছন ফিরেছে, কিন্তু এখানে শিল্পী আছেন মডেলের পাশে, পিছনে নয়। প্রসঙ্গত বলি, দুটি উদাহরণই (চিত্র—5·18 ও 5·19) খাজুরাহো থেকে, কলিঙ্গ থেকে নয়। কলিঙ্গে শিল্পী কদাচিৎ এ জাতের সম্পূর্ণ পিছন থেকে 'ব্যাক-ভিয়ু' গড়েছেন। এ-দিক থেকে খাজুরাহো শিল্পী বৈশিষ্ট্য দাবী করতে পারেন।

এবং অহেতুক তার দেহকাণ্ড মোড় খায়। অহেতুক বাস্তবতার দিক থেকে, শিল্পের দিক থেকে নয়। অর্থাৎ বাস্তবে কেউ পত্ররচনাকালে দেহকাণ্ডকে ওভাবে মোচড়ায় না—কিন্তু তাতে একটি নয়নাভিরাম রূপ ফুটিয়ে তোলা যাবে এ বিশ্বাসেই শিল্পী ঐভাবে মূর্তি গড়েন।

গ ॥ অভিসারিকা : দুটি পরিকল্পনা বারে বারে কলিঙ্গ শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ করে দেখছি। আমি তার নামকরণ করেছি—'কণ্টকোন্মূলনরতা' আর 'নূপুরোন্মোচনরতা'। রসের ক্ষেত্রে আনন্দ পেতে হলে দৃশ্যমান শিল্পের পশ্চাদপটে যে গোপন কাহিনীটি আছে তাকে মনশ্চক্ষে দেখতে হবে। দুটি ক্ষেত্রেই আছে দুটি গোপনব্যঞ্জনা।



চিত্র—5·18 কবরীবন্ধনরতা।



চিত্র—5·19 সিন্দূরদানরতা।



চিত্র—5·20 প্রসাধনরতা।

তৃতীয় উদাহরণে (চিত্র—5·20) নায়িকার বামহস্তে দর্পণ—সে সিঁথিমূলে সিন্দূর লেপন করছে। বলাবাহুল্য এ নায়িকা পরকীয়া প্রেমে পাগলিনী নয়, স্বামীর সোহাগে গরবিনী।

খ ॥ পত্রলেখিকা : প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা গোপনে প্রেমপত্র রচনা করছে—এটিও একটি প্রিয় বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি নায়িকা দণ্ডায়মানা অবস্থায় পত্ররচনা করে (চিত্র—5·21)।

চিত্র—5·22-এর নায়িকা বামচরণে দেহভার ন্যস্ত করে ডানপায়ের পাতা থেকে একটি কাঁটাকে কাঁটা দিয়ে তুলছে—'কণ্টকেনৈবকণ্টকম্' আইনে। লক্ষ্য করে দেখুন, মেয়েটির মুখে দৈহিক যন্ত্রণার কোন অভিব্যক্তি নেই। কারণ গতরাত্রের সুখস্মৃতিতে এখনো সে বিভোর। এটি যে তার অভিসাররাত্রির পরের দিনের সকালের ঘটনা। অভিসারে যাবার পথে তার পায়ে যে কাঁটা ফুটেছিল তা সে টেরই পায়নি। আজ সকালেও ওর যৌবনের যুগ্মজয়-

স্তম্ভের উপর দুলছে গতরাত্রের বরণমালা, ওর ওষ্ঠপ্রান্তে সেই সুখস্মৃতির আবেশ!

আর অভিসার রজনীর প্রস্তুতি-পর্যায়ের রূপটি দেখতে পাচ্ছি 'নূপুরোন্মোচনরতার' (চিত্র—5·23) আলেখ্যে। এ পরিকল্পনাটি বৈষ্ণব-সাহিত্যে তো বটেই গুপ্তযুগের কাব্যেও আছে। প্রতিবেশিনী বা ননদিনী যেন মধ্যরাত্রে নূপুরের শব্দে জাগরিতা না হয়, তাই অভিসারিকার এই সাবধানতা। এটি যে কাঁটা তুলে ফেলার দৃশ্য নয়, তার একটি সূক্ষ্ম-ইঙ্গিত আছে। লক্ষ্য করে দেখুন, ঐ নায়িকার শুধু একপায়ে নূপুর আছে, বাঁ-পায়ে নেই। এ-ক্ষেত্রেও দেহকাণ্ড অস্বাভাবিক কিন্তু নয়নমনোহর রূপে মোচড়ানো হয়েছে। এটিও খাজুরাহো শৈলীর।

প্রসঙ্গত বলি, তথাকথিত শিল্পশাস্ত্রে, অর্থাৎ

এ থেকেই মনে হয় বোনারের ব্যানার সত্ত্বেও—'নহ তুমি খাঁটি!'

ঘ ॥ নৃত্যগীতরতা : কোনার্ক পোতালে মেয়েদের নানান বাদ্যযন্ত্র বাজাতে দেখা গেছে—ঢোল, মৃদঙ্গ, বাঁশী, কর্তাল, আড়বাঁশী, খঞ্জনী, প্রভৃতি। শিল্পপ্রকাশের শাস্ত্রকারের নজরে শুধু 'ঢোলকটাই পড়ল—এটা ভাবতে কষ্ট হয়।

আমরা দু-একটি উদাহরণ দিয়েছি এখানে। চিত্র—5·24-এর নায়িকা 'বংশীবাদনরতা'। এটিও খাজুরাহো থেকে সঙ্কলিত একটি দুর্লভ মূর্তি। দুর্লভ এ জন্য যে, এটি সম্পূর্ণ পশ্চাৎদৃশ্য বা 'ব্যাক-ভিয়ু'। অর্ধোৎকীর্ণ এ মূর্তিটি অর্থাৎ 'অল্টো-রিলিভো'। এমন সম্পূর্ণ পিছন থেকে দেখা



চিত্র—5·21 পত্রলেখিকা।



চিত্র—5·22 কণ্টকোন্মূলনরতা।



চিত্র—5·23 নূপুরোন্মচনরতা।



চিত্র—5·24 বংশীবাদনরতা।

অ্যালিস্ বোনার আবিষ্কৃত 'শিল্পপ্রকাশ' গ্রন্থে এ-জাতীয় মূর্তিকে বলা হয়েছে 'নূপুরপাদিকা'—ব্যাখ্যায়—'নায়িকা নূপুর পরিধান করছে।' কোন প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ 'নূপুর খুলে ফেলার' যে গোপন-ব্যঞ্জনা তা না বুঝে এমন ভুল করে বলবেন—'মেয়েটি নূপুর পরছে' তা মানতে পারছি না!

নায়িকামূর্তি আমার আর কোথাও নজরে পড়েনি। গ্রিফিথ সঙ্ঘপাল জাতকের একটি নারীর চিত্র-প্রসঙ্গে (চিত্র—5·25) একবার অজন্তা-চিত্রের বিশ্লেষণ বলেছিলেন, "ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টিকোণ কদাচ পিছন দিক থেকে হয়, এ দিক থেকে অজন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে, শিল্পী বহুক্ষেত্রেই 'ব্যাক ভিয়ু' এঁকেছেন।" এ

জন্যই এই বিরল-দৃশ্যটি এখানে সন্নিবেশিত করেছি। ভারতীয় ভাস্কর নারীমূর্তি পশ্চাৎ থেকে আঁকেন না, বা গড়েন না বোধকরি যৌবনের যুগ্মজয়স্তম্ভ রূপায়ণ থেকে বঞ্চিত হতে চান না বলে। এখানে শিল্পী তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন।

পরবর্তী উদাহরণটি অর্থাৎ চিত্র—5·26-ও নৃত্যরতা। এক্ষেত্রেও দেহকাণ্ডটি বিচিত্রভাবে পাক খেয়েছে। বলাবাহুল্য 'পুষ্পধন্যা'-র হস্তধৃত কার্মুকটি নিতান্তই ফুলধনু। অতনুর কাছ থেকে ধার করা। কারণ লক্ষ্যবস্তু যদি দয়িতের হৃদয় ভিন্ন



চিত্র—5·25 অজন্তা, সংঘপাল জাতক।

আর কিছু হয় তাহলে মেয়েটিকে ঐ নৃত্যরতার ভঙ্গিমায় শরসন্ধান করতে হত না।

ঙ ॥ **কুসুমপ্রিয়া** : নায়িকা পদ্ম, কেতকী, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পমাল্য রচনা করছে অথবা আঘ্রাণ করছে এ জাতীয় পরিকল্পনাও দেখা যায়। এ-গুলিকে ক্রিয়া-অনুষঙ্গ বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে।

II. **ভাব-ভিত্তিক** :

ভাব-ভিত্তিক পরিকল্পনায় বস্তুতান্ত্রিক অনুষঙ্গ থাকতেও পারে—যথা তোরণ, শালবৃক্ষ বা সন্তান। কিন্তু রসানুসন্ধানে ঐ অনুষঙ্গটির অবদান অপেক্ষাকৃতভাবে কম। তারা যেন ভাবকে ফুটিয়ে তুলতেই এসেছে। এই ভাব-প্রধান মূর্তিগুলিকে এভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা চলে :

প্রথমতঃ, প্রিয়া-ভাব, দ্বিতীয়তঃ, মাতৃ-ভাব।

প্রিয়া-ভাব :

ক ॥ **অলসকন্যা** : 'অলসকন্যা' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। ইংরাজিতে যাকে বলা যায় Lady-in-



চিত্র—5·26 পুষ্পধন্যা।



চিত্র—5·27 অলসকন্যা। (প্রতীক্ষারতা)।

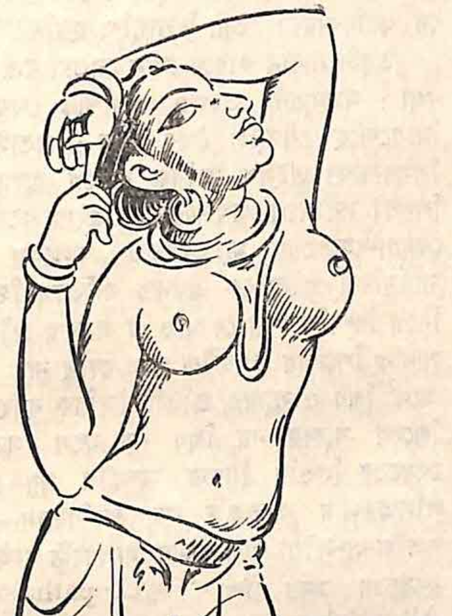
liesure ; এখন অবসর-যাপনের পশ্চাৎপটে নানান ভাব ও রসের দ্যোতনা থাকতে পারে—নায়িকার মুগ্ধভাব, অভিমান, প্রতীক্ষা, অথবা রতিক্লান্ত আশ্লেষ শয়নার প্রতিমূর্তি।

(i) **মুগ্ধা** : নায়িকা সচরাচর কিশোরী। প্রথম পুরুষ সম্ভাষণের মুগ্ধভাবটি শিল্পী ধরতে চান। যেন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ-মুহূর্ত! এ জাতের মূর্তি দুর্লভ। তবু দু-একটি দেখেছি।

(ii) **মানিনী** : অভিমানক্ষুব্ধার এ রূপটিও দুর্লভ। কিন্তু যদি কোন মন্দির গাত্রে খুঁজে পান তাহলে আপনি নিজেই 'মুগ্ধা' হয়ে যাবেন। খাম্বাজ-পিলুতে শুনতে পাবেন ঐ পাষাণমূর্তিতে অশ্রু-ঠুংরিতে অভিমানক্ষুব্ধার আর্তি :

"বোলো মোরে রাজা
কাঁহা গোঁয়ায়ি সারা রাতিয়া ?
সোতন্‌কে সঙ্‌ হাসত খেলত তু
হম্‌ সঙ্‌ করত রুঠি রুঠি বাতিয়া ॥"

(iii) **প্রতীক্ষারতা** : প্রিয়ের আগমন প্রতীক্ষায় নায়িকা যখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। অনু-



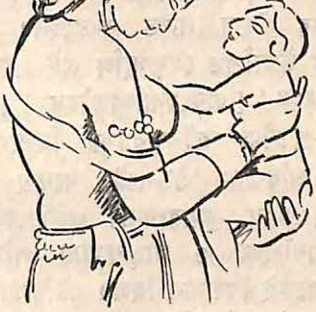
চিত্র—5·28 অলসকন্যা
(প্রতীক্ষারতা)।

ষঙ্গ অনেক কিছু হতে পারে ; অর্থাৎ প্রতীক্ষারতা গৃহকপাট আধেক খুলে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে ঘরে-ফেরা মরদের জন্য, তখন তার পশ্চাৎ-পটে হয়তো তোরণ, হয়তো দরজার কপাটে সে রেখেছে একটি হাত। কখনো বা নায়িকা ঘরে নয়, পুষ্প-বিতানে প্রতীক্ষারতা ; তখন তার একটি হাত আম্রপাদপে অথবা শালবৃক্ষের শাখায়। তাকে বলি 'শালভঞ্জিকা'। অনেক সময় 'বনদেবী' বা 'বৃক্ষিকা' মাতৃ-মূর্তিকেও আমরা 'শালভঞ্জিকা' বলে ভুল করি (সাঁচী তোরণের সুবিখ্যাত 'বৃক্ষিকা')। চিত্র—5·27-এর নায়িকা এমন একটি নায়িকামূর্তি। এরই সামান্য রকমফের চিত্র—5·28। কখনো বা নায়িকা আশ্লেষ-শয়নে শায়িতা (মুক্তেশ্বর তোরণের দু-পাশে এমন দুটি মূর্তি আছে)।

মাতৃ-ভাব :

ক ॥ স্তনদায়িনী।

খ ॥ শিশুর সঙ্গে ক্রীড়ারতা (চিত্র—5·29)।



চিত্র—5·29 সন্তানবৎসলা।

5· মিথুন :

কেন মিথুন : কলিঙ্গ দেব-দেউলে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়টি হচ্ছে মিথুন-মূর্তি। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে একটি বাংলা[5] ও একটি ইংরাজি-গ্রন্থ[6] ইতি-পূর্বেই রচনা করেছি ; এবং সেখানে মিথুন-তত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে এ-গ্রন্থে ঐ একই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অপরপক্ষে, কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কে কোন গ্রন্থে বিষয়টি অনালোচিতও থাকতে পারে না। ফলে অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা গেল।

আদিসূরী রাজেন্দ্রলাল বা ফার্গুসন বন্ধকাম মূর্তিগুলির কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে যাননি। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, "This is the most perplexing feature of Orissan Archi-

tecture." [উড়িষ্যা-স্থাপত্যে এইটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য বিষয়][7]। অধ্যাপক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বললেন, "The presence of indecent figures on religious edifices is still a puzzle." [ধর্মমন্দিরের বহির্গাত্রে ঐ নীতি-বিগর্হিত মূর্তি-গুলি আজও এক অমীমাংসিত প্রশ্ন][8]। পরবর্তী-কালে নানান ভারতবিদ নানারকম আলোচনা ও ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন ; যথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, আচার্য ব্রজেন্দ্রলাল শীল, মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক অথবা গবেষককে পরামর্শ দেব 'মানসী' পত্রি-কার ১৩২০ সালের আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন এবং ১৩২১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যাগুলি দেখতে।

একজন ফরাসী পর্যটক লীসন পূর্বসূরীদের বিভিন্ন মতামত একত্র করে তাঁর গ্রন্থে[9] আলোচনা করেছেন। মিথুন-মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করার আটটি সম্ভাব্য যুক্তি তিনি সংকলন করেছেন। এর ভিতর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য তা তিনি বলেননি। সে বিচার তিনি পাঠকের উপর ন্যস্ত করেছেন। বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক উত্থাপিত হেতুগুলি এই প্রকার :

I. ONENESS : [একমেবাদ্বিতীয়ম্] : মিথুন-গুলি শক্তির প্রতীক—স্ত্রী-পুরুষের মিলনে একই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান—'ওঁ'—এই মন্ত্রের মতো। হ্যাভেল অথবা ডক্টর কুমারস্বামী এইদিকেই জোর দিয়েছেন। শিবলিঙ্গ ও মাতৃপূজার পরিকল্পনা প্রাগার্য যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। উড়িষ্যা-মন্দিরে সেই চিন্তাধারাই বিকশিত—শুধুমাত্র প্রতীক-ব্যঞ্জনায় নয়, তদানীন্তন শৈল্পিক ও সামাজিক প্রের-ণায় আরও পরিষ্কারভাবে, আরও সুন্দর ও প্রত্যক্ষ-রূপে প্রস্ফুটিত।

II. BLISS : [আনন্দ] : এই মতের প্রবক্তারা উপনিষদের সেই অতি-বিখ্যাত শ্লোকটিকেই মূলমন্ত্র করতে চেয়েছেন :—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'। তাঁদের মতে মদনানন্দের পথেই ভূমানন্দের আস্বাদন সম্ভব।

III. TEMPTATION : [প্রলুব্ধিকরণ] : নিছক কামভাবের উদ্রেক করতেই মিথুন মূর্তিগুলি উপ-স্থাপিত করা হয়েছে—প্রকৃত সাধককে পরীক্ষা করাই মূল উদ্দেশ্য। এই মতের বক্তব্য বোঝা যাবে মিস্টার ব্রাউনের একটি উদ্ধৃতি থেকে। পুরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নাকি ঐ বিদেশী পর্যটককে বলেছিলেন, "জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশপথটি মানবজীবনের সঙ্গে তুলনীয়। পথের দুধারে ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার নানান উপকরণ নির্বিচারে সজ্জিত—যাকে তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা বলেন 'দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীল।' কিন্তু ফ্রয়েড কি অশ্লীল? 'সত্য' কখনো অশ্লীল হতে পারে?...তীর্থযাত্রী যদি বহিরঙ্গের ঐসব ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনার আবর্তে পড়ে যায়, তবে মন্দিরের বহির্দ্বার থেকেই তাকে ফিরে যেতে হবে। মন্দিরে সে অনধিকারী। তার চিত্তশুদ্ধি হয়নি।"[10]

তত্ত্বটা নানান কারণে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথম কথা : মলমূত্রাদি ত্যাগও আবশ্যিক জৈব পর্যায়—নিঃসন্দেহে সেগুলি জৈব সত্য ; সত্যই। কিন্তু শিল্পরাজ্যে এইসব জৈবিক বৃত্তির রূপায়ণ বিশ্ব-শিল্পী সর্বদেশে সর্বকালে পরিহার করে গেছেন। কোপেনহেগেনের মূত্রত্যাগরত বালকের প্রতিমূর্তি 'ম্যানিকিন্-পীস্'-কে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে ধরে নিলে বিশ্বশিল্পের কোথাও ঐ জাতের জীবন-সত্যকে সার্থক শিল্পের উপজীব্য হতে দেখি না। 'সত্য' যে-অর্থে শিব ও সুন্দর, প্রতিটি জৈবিক বৃত্তি সে অর্থে শিল্পে সুন্দর নয়, শিব নয়, ফলে 'সত্য'-ও নয়! ফ্রয়েডের থিওরি নিশ্চয় অশ্লীল নয়—যেহেতু তা ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা বিজ্ঞান—যে রাজ্যে 'শ্লীল-অশ্লীল' বলে কোন মাপকাঠি নেই! কিন্তু ফ্রয়েডের অমর গ্রন্থ 'Psychopathologie des Altagslebens'—যাতে 'নর' ও 'নারী' নামধেয় জন্তু, আজ্ঞে হ্যাঁ, জন্তুই—স্তন্যপায়ী 'হোমোস্যাপিয়ন্স্ স্যাপিয়েন্স্'—তাদের তথাকথিত যৌন-বিকৃতির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন, সেই গ্রন্থটি অব-লম্বনে যদি কোনও প্রযোজক একটি নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন, তবে খুব সম্ভবত তা 'অশ্লীল'ই হবে!

দ্বিতীয় কথা হিন্দুধর্ম উদার ও সহনশীল। তীর্থযাত্রীকে—মনে রাখবেন, আমি সত্যানুসন্ধানী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা বলছি না, মন্দিরদ্বারে সমাগত মানুষের বৃকোদরভাগের কথা বলছি—সেই সাধারণ তীর্থযাত্রীকে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম, তার লৌকিক আচার কখনো এভাবে পিছন থেকে টেনে ধরতে চায় না। সকল অবস্থাতেই সে মুক্তিকামীকে সাহায্য করতে চায়। অযুত-নিযুত তীর্থযাত্রী যখন সংসারের যাবতীয় কামনা-বাসনাকে সাময়িকভাবে জয় করে বিশুদ্ধচিত্তে মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ায় ঠিক তখনই তার চোখের সম্মুখে সেই ভুলে-থাকা অধ্যায়গুলি পুনরায় মেলে ধরার নির্দেশ কোনও হিন্দুশাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রকার জানেন, সংসারে পাঁক আছে—আমরা সেই পঙ্কের মধ্যেই বাস করতে বাধ্য,

তাই সংসারীকে শাস্ত্রজ্ঞানীরা বলেছেন—পাঁকাল-মাছের মতো হতে! সেজন্য এ বিষয়ে মিস্টার টমাস-এর উদ্ধৃতিটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়: "This is a modern interpretation inspired by Western notion of the indecency of sex, and it is doubtful if this was the real intension of the builders." [পাশ্চাত্য-চিন্তায় যৌনতাকে যে অশালীন মনে করা হয় সেই চিন্তাধারা-তেই অনুপ্রাণিত হয়ে সম্প্রতিকালে এই মতটি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এ জাতীয় চিন্তা মন্দির-নির্মাতাদের মনে আদৌ ছিল কি না সন্দেহ জাগে।][11]

IV. INNOCENCE : [সরলতা] : এই মতের প্রবক্তাদের বিশ্বাস—শিল্পীরা সরল মনে ঐ মূর্তি-গুলি নির্মাণ করেছেন—নৃত্যগীত, শিকার, যুদ্ধ ইত্যাদির মতো কামকেলিও জীবনের এক পর্যায়, আবশ্যিক পর্যায়, এই সরল বিশ্বাসে মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা।

এই যুক্তিটির পিছনে আংশিক সত্য আছে এ-কথা মানতেই হবে। সে-কথা এভাবে বলা যায়:

'শ্লীল-অশ্লীলে'র সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন কালে পৃথক। আমরা—বিংশ শতাব্দীর দর্শক যে শিল্পবস্তুকে অশ্লীলতার কণামাত্র দেখি না হয়তো ভিক্টোরিওযুগে তা ছিল নিতান্ত অশ্লীল। সে-আমলে কোনও মহিলা 'বেদিং-কস্টুম' পরে সমুদ্রতীরে প্রকাশ্যে স্নান করার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। তখন না-কি টেবিলের নগ্ন-পায়া দেখতে পাওয়াকেও অশ্লীল মনে করা হত। অপরপক্ষে দণ্ডকারণ্যের আদিবাসী সমাজে বিকচ-উরসা রমণীদের হাটে-বাজারে আকছার দেখেছি। ফলে এই 'সরলতা' যুক্তিটিকে সেই-অর্থে আংশিক স্বীকৃতি দিতেই হবে। অর্থাৎ যে-কালে ঐ মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল তখন তা কী শিল্পে, কী সামাজিক চিন্তায় অনুমোদনযোগ্য মনে করা হয়েছিল।

V. PROTECTION : ['তুক'-হিসাবে] : দর্শক বা অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে মন্দিরকে 'তুক'-হিসাবে রক্ষা করবার প্রেরণায় এগুলি নির্মিত। মিস্টার লীসন তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনজন পূর্বাচার্যের মত উদ্ধৃত করেছেন। তিনজনই প্রতীচ্যের পণ্ডিত। তাঁদের মতে শিল্পীরা সেই অনুপ্রেরণাতেই এ কাজ করেছেন যা আজকের দিনেও করে হিন্দু-মুসলমান রাজমিস্ত্রি, আপনার-আমার ভদ্রাসন গড়ে তোলার সময়—বাঁশের ডগায় ঝাঁটা-জুতো-চুবড়ি ঝুলিয়ে দেয়। অর্থাৎ: বুঢ়ি নজরবালে তেরা মু-কালা!

পণ্ডিতত্রয় তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রাচ্য শিল্পশাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিতে পারেননি। তাঁদের তথ্য-সূত্র হচ্ছে এ দেশীয় কিছু অশিক্ষিত গ্রাম্য-মানুষের কথা। যুক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। এমন একটি ব্যাপক শিল্পচেতনা, যার ব্যাপ্তি একটি উপ-মহাদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত, যার কালীক ব্যাপ্তি প্রায় সহস্রাব্দীকাল, তার পিছনে কয়েকজন গ্রাম্য-লোকের কুসংস্কার কাজ করেছে এটা মেনে নেওয়া চলে না। আপনার-আমার ভদ্রাসন নির্মাণের সময় আমরা ঐ কুসংস্কারকে মেনে নিই শুধু এ জন্য যে, ও-ব্যবস্থাটা নিতান্তই সাময়িক। ঐ মিস্ত্রিই যদি বলত, 'বাবু-মশাই, আবহমানকাল ঐ জুতো-ঝাঁটা আপনার বাড়ির সমুখে ঝোলানো থাকবে', তাহলে তার সে আবদার আমরা মেনে নিতাম না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, শ্রীঊর্মিলা অগ্রবাল বলেছেন, "Passages in the *Utkal-khand*, the *Agni Purana* and the *Brihat Samhita* support the view that such obscene figures are intended to protect the structures against lightning, cyclones or other visitations of nature." [উৎকলখণ্ড, অগ্নি পুরাণ ও বৃহৎ-সংহিতার কোনও কোনও শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, এই অশ্লীল মূর্তি-গুলি বজ্রপাত, ঝঞ্ঝা বা ঐ জাতের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খোদিত।][12]

দুর্ভাগ্যবশতঃ লেখিকা কোনও নির্দেশ দেননি ঐ তিনটি গ্রন্থের কোথায় এ জাতীয় শ্লোক তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমার তা নজরে পড়েনি। নির্দেশ না থাকায় যাচাই করেও দেখতে পারিনি।

VI. ATTRACTION : [আকর্ষণ] : সাধারণ যাত্রীকে মন্দিরের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য।

Alain Danieleu লিখেছেন, "এই জাতীয় মূর্তির সন্ধানে সাধারণ মানুষ মন্দিরের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, পোতা থেকে মন্দির-চূড়ার সর্বত্র অন্বেষণ করে চলে। এভাবে প্রদক্ষিণ করতে করতে এবং সেই সঙ্গে ফুল ও ধূপের গন্ধে, আরতির আলোয়, শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে ক্রমশঃ তার মন বদলে যায়। সে মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধরা দেয়।"[13]

এ যুক্তিটা মেনে নিতে হলে ঐ সঙ্গে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মন্দির-নির্মাতাদের না ছিল তত্ত্বজ্ঞান, না সাধারণ বুদ্ধি। কারণ তত্ত্বজ্ঞান আমাদের বলে—শুধুমাত্র মন্দির পরিক্রমায়, তাও কোনও ধর্ম-

প্রেরণায় নয়, নিতান্ত কলুষচিন্তার বশবর্তী হয়ে—কখনও মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে না, যতক্ষণ না মুমুক্ষুর মনে মুক্তির ইচ্ছা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জাগে। অপরপক্ষে যার বিন্দুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি আছে সেই অনুমান করবে "পোতা থেকে মন্দির-চূড়ার সর্বত্র" অশ্লীল মূর্তিগুলি দেখা শেষ হলে যাত্রী আদৌ মন্দিরপ্রবেশের দ্বারটি অনুসন্ধান করবে না ; সে বরং সন্ধান নেবে : জনপদবধূদের মহল্লাটা কোনদিকে !

VII. EDUCATION : [যৌনতার শিক্ষা] : সাধারণ যাত্রীকে যৌনশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে এগুলি কামশাস্ত্র-সম্মত সচিত্র পাঠ।

এই মতটি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য। যে কারণে এটিকে আংশিকভাবে গ্রাহ্য বলেছি, সেই যুক্তি বা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু এই মতের প্রবক্তারা হেতুটা আলোচনা করেননি, অন্ততঃ লীসন যা সংকলন করেছেন তা থেকে একথাই মনে হয়। তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আমরা একাদশতম হেতু-সূত্রে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। বর্তমানে আমরা লীসন সাহেব সংকলিত পূর্বাচার্যগণের যুক্তি-সমূহ, তাঁদের আলোচিত দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করছি মাত্র।

এই মতের যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলতে চান—কামশাস্ত্র মানবপ্রজাতির পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক শাস্ত্র। তাই হয়তো বাৎস্যায়ন-বর্ণিত রতিকলার একটি সচিত্র পাঠ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মন্দিরের বহির্গাত্রে। এ-কথা আংশিকভাবে সত্য—কারণ উভয়েই, বাৎস্যায়ন এবং কলিঙ্গ-ভাস্কর কামকলার চর্চা করেছেন—বাৎস্যায়ন সংস্কৃত শ্লোকে, ভাস্করদল ছেনি-হাতুড়ি যোগে। ফলে কোন কোন মিথুন-মূর্তিকে বাৎস্যায়ন-বর্ণিত মৈথুনের সচিত্র পাঠ মনে হওয়া স্বাভাবিক। আপনি যদি বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তাহলে বারে বারে আপনাকে ডারউইনের প্রসঙ্গ তুলতে হবে, বিবর্তনবাদের পরিবর্তে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে লিখতে বসলে দেখবেন ডারউইন অনুপস্থিত, আইনস্টাইন ঘন ঘন আবির্ভূত হচ্ছেন রঙ্গমঞ্চে। ঠিক সেইভাবে কামকেলির রূপকার হিসাবে কলিঙ্গভাস্করের নাটকে বাৎস্যায়ন বারে বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। না হয়ে উপায় নেই।

কোন কোন পণ্ডিত আবার এই সুযোগে রতিক্রিয়ার মাধ্যমে দার্শনিক তত্ত্ব পেড়ে ফেলেছেন এবং লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদকে জড়িয়ে একটি তুরীয়-ধোঁয়াশার ধূম্রজাল রচনা করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। যেমন ডক্টর মুলক্‌রাজ আনন্দ্ বলেছেন, "Since sexual curiosity is, apart from the awakening of sensibility towards Reality, also one of the main causes of the perversions of the mind, it must be satisfactorily explained and analysed, so that education can lead not only to healthy enjoyment of the variegated pleasures of the body, also clarify the mind of the filth attached to the sacred act." [যৌন অনুসন্ধিৎসা শুধু বাস্তবতার (ডক্টর আনন্দ্ ক্যাপিটাল 'R' ব্যবহার করেছেন, ফলে অনুবাদে 'বাস্তবতা'-র বদলে 'পরমসত্য' শব্দটাই বোধহয় ঠিক) প্রতি বোধের উদ্রেক করে না, তা মানব মনের বিকৃতির অন্যতম মূল হেতু। এই অনুভূতিটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে—এমনভাবে, যাতে ঐ যৌনশিক্ষা দৈহিক-মিলনের বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সম্মত পর্যায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করতে পারে এবং ঐ সঙ্গে এই পবিত্র ক্রিয়ার বিষয়ে আমাদের মনের সকল কলুষ অপনোদন করতে পারে।][14]

অবাক হতে হয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য আনন্দ্-এর এই ব্যাখ্যা শুনে। তিনি কেমন করে সব কয়টি ভাস্কর্যকে 'স্বাস্থ্যসম্মত আনন্দানুসন্ধান' বলতে পারলেন ? এমন কতকগুলি মিলনের আসন খোদিত হয়েছে যা বাস্তবে আদৌ সম্ভবপর নয়। বাৎস্যায়ন থেকে হ্যাভলক্ এলিস্ কেউই শীর্ষাসনে নিরবলম্ব অবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগের বর্ণনা দেননি। সেগুলি—healthy enjoyment of the variegated pleasures ? ক্যাপিটাল 'R' দূরঅস্ত্—ছোট-হাতের r-ব্যবহৃত reality-র ধারে কাছে সেগুলি নেই। পরিষ্কার বোঝা যায়, যৌন-সঙ্গমের পটভূমিতেও শিল্পী স্বভাবজাত প্রেরণায় কল্পলোকে ভাসমান। বাস্তবের কোনও তোয়াক্কা না রেখে যে-ভাবে শিল্পী গজ-বিরাল, সিংহ-বিরাল, যক্ষ-কিন্নর-উড্ডীয়মান অপ্সরী গড়েছেন, সেই একইভাবে খোদাই করেছেন ঐ অবাস্তব মিলনদৃশ্য—তা আদৌ কামশাস্ত্রের 'ব্যাখ্যা' বা 'বিশ্লেষণ' নয়। নিছক শিল্পী-মনের প্রতিফলন।

VIII. TANTRA : [তন্ত্রশিক্ষা] : বামাচারী, তান্ত্রিক অথবা বজ্রযানীদের বিভিন্ন আসনের সচিত্র বিজ্ঞাপন। এবারেও দেখছি, মসিয়েঁ লীসন যাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরা সবাই প্রতীচ্যখণ্ডের পণ্ডিত। একমাত্র ব্যতিক্রম সেই ভারতীয় কলাবিশারদ ডক্টর মুলক্‌রাজ আনন্দ্। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের

কথা থাক, কিন্তু ঐ ভারতীয় পণ্ডিতপ্রবরও কি জানেন না যে, বামাচার, চীনাচার, তান্ত্রিক এবং বজ্রযানী বৌদ্ধদের গোপন সাধন পর্যায় ঠিক বাইবেল-বর্ণিত "Come unto Me and thou shall be saved." [আমার ক্রোড়ে আশ্রয় লও, পরিত্রাণ পাইবে।] জাতীয় নয়? কাপালিক বা তান্ত্রিকেরা তো বটেই এমনকি আউল-বাউল-সহজিয়া-পন্থীরাও তাদের সাধন-ভজনের সঙ্গে যৌনাচারের সম্পর্কটি অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখে। সেই একান্ত গুরুমুখী গুহ্য-বিদ্যার বিজ্ঞাপনে কাপালিকেরা এবং তান্ত্রিকরা মন্দিরগাত্রে মূর্তি উৎকীর্ণ করে যাবে এ-কথা পাশ্চাত্য-পণ্ডিত বললেও বলতে পারেন, ডক্টর আনন্দ্ কী-ভাবে বললেন? একটিই হেতু: ডক্টর আনন্দ্ স্বতঃ-নিয়োজিত কৌসুলীর ভূমিকায় ঐ অভিযুক্ত শিল্পী-দের পক্ষে সওয়াল করতে বসেছেন! উপনিষদের ভুল ব্যাখ্যা করে, শব্দের মায়াজাল বিস্তার করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—অপরাধীরা নির্দোষ!

আমাদের আপত্তি কিন্তু ঐ 'শিক্ষা' শব্দটিতে। 'তন্ত্রশিক্ষা' না বলে যদি 'তন্ত্রের প্রভাব' বলা হত তা-হলে আমরা আপত্তি করতাম না। এই মূর্তিগুলির উপ-স্থাপনে বজ্রযানী ও মহাযানী বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক কাপালিকদের প্রভাব যে পড়েছিল এ তথ্য মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ এবং আচার্য ব্রজেন শীলের গবে-ষণায় আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি; কিন্তু তার মানে এ নয় যে, 'তন্ত্রশিক্ষা' দিতে এগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

মঁসিয়োঁ লীসন সংকলিত আটটি হেতু আলো-চনার পরে আমরা আরও তিনটি হেতুর কথা আলো-চনা করব। এই তিনটি মতামত দেশীয় ভাষায় প্রকা-শিত হয়েছে বলে সম্ভবত ঐ ফরাসী গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তিনটি নয়, দুটি। কারণ তৃতীয় যুক্তিটি বর্তমান লেখকের একটা সংযোজন। অতঃপর সেই তিনটি সম্ভাব্য হেতুর আলোচনা করা যাক।

IX. AVERSION: [বিতৃষ্ণাউদ্রেগার্থে]: এই মতটি শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। মানসী পত্রি-কায় প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখছি, তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, "ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া গণ্য করিত। ইন্দ্রিয়-গুলিই বিপদ ও বেদনা আনয়ন করে; গলিত ন্যক্কারজনক দ্রব্য সম্মুখে ধরিয়া রূপজ মোহ জয় করিতে হইবে।"

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, "উপনিষদের নির্দেশ: জগৎ আনন্দময়, মধুময়। যেখানে সংসারটাকে হেয় ও কদর্য করিবার চেষ্টা দেখা যায় সেটা বৌদ্ধভাব প্রণোদিত। যেখানে সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা, সেখানে ব্রাহ্মণ্যভাব প্রবল।" তিনি আরও বলছেন, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ্য-শিল্পীরাও বৌদ্ধ প্রভাবে সৌন্দর্যকে কুৎসিত রূপে এঁকে রূপজ মোহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ত্রিবেদীমশাই কবি ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের একটি উদ্ধৃতিও শুনিয়েছেন:

> স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাতত্যুপমিতৌ
> মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
> স্রবন্মূত্রাক্লিন্নং করিকরস্পর্দ্ধি জঘনং
> মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিবরবিশেষৈগুরুকৃতম্॥

আমরা পণ্ডিতপ্রবর রামেন্দ্রসুন্দরের এ মতটি নানাকারণে গ্রহণ করতে অসমর্থ। প্রথম কথা কোন শিল্পীকে বা 'স্কুল'কে এভাবে সাধারণসূত্রে বাঁধা ঠিক নয়। শিল্পী—তিনি চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, সাহিত্যিক যাই হোন না কেন—যখন যে রস পরি-বেশন করেন তখন সেই রসসমুদ্রেই নিমজ্জমান থাকেন। আমাদেরও ঐ সঙ্গে সেই রসাস্বাদনের সুযোগ দেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মশাস্ত্রে 'দেহটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া গণ্য করিত কি করিত না' সে প্রশ্নটা মুলতুবি রেখে বরং লক্ষ্য করে দেখুন —বৌদ্ধশিল্পীরা ভারত-সংস্কৃতিকে যা উপহার দিয়ে গেছেন তাতে কি ঐ মত বিধৃত? সাঁচী, ভাজা, কাহেরী, মথুরা, সারনাথ, নালন্দা এবং বিশেষ করে অজন্তায় বৌদ্ধশিল্পীরা যা গড়েছেন, এঁকেছেন তাতে কি মনে হয়েছে মানবদেহটাকে তাঁরা কদর্য মনে কর-তেন? নিজযুক্তির স্বপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর কবি ভর্তৃহরির একটি শ্লোক শুনিয়েছেন—দেখছি, ভর্তৃহরির মতে: রমণীর স্তনদ্বয় স্বর্ণকলসের উপমান নয়, মাংসগ্রন্থী মাত্র; নায়িকার চন্দ্রানন শ্লেষ্মাগার মাত্র; করিকরস্পর্ধি বলে কাব্যবর্ণিত জঙ্ঘার সঙ্গমস্থল ক্লেদাক্ত ইত্যাদি। এবার ঐ কবি ভর্তৃহরির আর একটি কবিতা শ্যামাপদ চক্রবর্তীর অনুবাদে আপনাদের শোনাই:

> "অয়ি নবযৌবনা
> তোমার নিন্দা করি পণ্ডিতজনা
> আপনারে করে প্রতারণা, আর অন্যে প্রবঞ্চনা।
> সব সত্যের সার
> তপস্যাফল স্বর্গ, আবার স্বর্গের ফল: সুধারস
> শৃঙ্গার॥"[15]

এবার বলুন : কোন ভর্তৃহরি সত্য ?

আমি বলব : দুজনই !

কবির দুটি বিভিন্ন 'মুড'-এ রচিত দুটি কবিতার কোনটিই মিথ্যা নয়। প্রথম ক্ষেত্রে তিনি 'বিরাগ্য-শতক' রচনায় প্রবৃত্ত, দ্বিতীয়ে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎপ্রপঞ্চে তিনি আনন্দের অভিসারী ! কবি কখনও বলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', আবার কখনো বলেন, 'মরণ, তু আও রে আও।'—একই কবি। এর মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। প্রায় শতাব্দীব্যাপী সাহিত্যরচনায় যিনি ক্রমাগত বলে গেলেন "'ভালোবাস', অন্তর হতে 'বিদ্বেষবিষ নাশ'" তিনিও ক্ষেত্রবিশেষে ঐ বাণীর প্রবক্তাদের 'ব্যর্থ নমস্কারে' ফিরিয়ে দিতে পারেন। ভ্রান্তি তখনই হয় যখন কবির বিশেষ মুডে রচিত সৃষ্টিকে অবলম্বন করে আমরা একটি সাধারণ সূত্র লিপিবদ্ধ করতে যাই।

সে যাই হোক, বিতৃষ্ণা উদ্রেকের জন্য কলিঙ্গ-ভাস্কর ঐ অনবদ্য মূর্তিগুলি খোদাই করেননি। যেমন অজন্তা শিল্পীরা বলতে চাননি 'মানবদেহটা অত্যন্ত কদর্য' ! তা যদি ওঁদের বক্তব্য হত তা হলে তাঁদের সৃষ্ট শিল্পে সৌন্দর্য নয় বীভৎস রসই দেখতে পেতাম, যেমন পাই মধ্যযুগের য়ুরোপীয় চার্চে, পাপীদের নরকবাসের চিত্র-ভাস্কর্যে।

X. RECREATION : [ক্লান্তি-অপনোদন] : এই মতটি পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বসু। তিনি লিখেছেন, "কণারকের বিশাল আকার দেখিয়া জানিতে ইচ্ছা করে—কিসের প্রেরণায় শিল্পীরা বহুকাল ধরিয়া এমন রচনায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কিসেই বা এতকাল ধরিয়া তাঁহাদের উৎসাহকে সচেতন রাখিয়াছিল।...এতগুলি বন্ধকাম ও তাহারও অধিক সংখ্যায় রমণীয় ললিতমূর্তি দেখিয়া মনে হয় যে, শিল্পীদের উৎসাহ সংরক্ষণে এগুলির স্থান নিচে নহে। এরূপ মূর্তি তৈয়ারী করিতে করিতে তাহাদের উৎসাহ কমিবার কোনও কারণ থাকে না, বরং অবসাদের সময় চিত্রের ব্যাখ্যানবস্তুই তাহাদের কাজে বাঁধিয়া রাখিবে।...শিল্পীরা এত বড় কাজ করিয়া থাকিলেও তাহারা যে আমাদেরই মতো শ্রান্ত হইয়া পড়িত এবং কোনও কাজ নিরন্তর করিতে করিতে অনেকসময় অশ্লীল উৎসাহবর্ধক ছবি আঁকিত এই রকম কোন কথা সহজভাবে ভাবিলে অনেক গোল মিটিয়া যায়।"[16]

অধ্যাপক বসু একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। উড়িষ্যার স্থাপত্য বিষয়ে তিনি প্রামাণিক গবেষণা করেছেন ; তবু তাঁর এই সিদ্ধান্তটি আমাদের যুক্তি-বাদী মন গ্রহণ করতে অসমর্থ। একাধিক কারণে। আমাদের মতে গোল অত সহজে মেটে না। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কালে কোণার্ক মন্দিরের মতো, অথবা তার চেয়েও বড় স্থাপত্য-কীর্তি নর-মানুষেরাই গড়েছে —এমন মানুষ যারা ভিন্ন দেশ-কালের হলেও 'আমাদেরই মতো শ্রান্ত হইয়া পড়িত'। যথা : মিশরের একাধিক পিরামিড, আম্মান বা আবু-সিম্বেলের মন্দির, পারস্য-স্থাপত্যে 'পার্সিপোলিস'-এর শত-স্তম্ভের প্রাসাদ, এথেন্সের গ্রীকশৈলীর অ্যাক্রো-পোলিস্ বা পার্থেনন, রোমের প্যান্থিয়ন, কলোসম অথবা সেণ্টপীটর গীর্জা। আকারে, আয়তনে, উচ্চতায় এরা কেউ কোণার্ক-সূর্যমন্দিরের অপেক্ষা ন্যূন নয়। ভারতবর্ষেও অজন্তা-এলোরা, রামেশ্বরমের শিবমন্দির, অথবা তাজমহলে যত 'ম্যান-ভেজ', অর্থাৎ যত কারিগর যতদিন ধরে কাজ করেছে তা-ও কোণার্কের অপেক্ষা কম হবে না। কই, এদের কোনটির ক্ষেত্রেই তো শিল্পীদের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ও-জাতীয় বিচিত্র ব্যবস্থা করতে হয়নি ? শিল্পীরা তো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তেন। অথচ পিরামিড থেকে হুভার-ড্যাম, চীনের প্রাচীর থেকে এম্পায়ার-স্টেট-বিল্ডিং কোথাও কর্মীদের এভাবে উৎসাহ জোগানোর প্রয়োজন হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ, কোথায় কোন জাতের মূর্তি বসানো হবে তা নিশ্চয় নির্ধারণ করে দিতেন একজন মূল পরিকল্পনাকার বা চীফ আর্কিটেক্ট। তিনি নিশ্চয় স্বহস্তে ছেনি-হাতুড়ি চালিয়ে দৈহিক ক্লান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হতেন না। সেই মূল নিয়ামক যে এক-জন লঘুচিত্তের দায়িত্বজ্ঞানহীন অবিবেচক নন, তাঁর সৃষ্টির সুষমছন্দেই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সাধারণ কর্মীরা যাতে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে না পড়ে তাই তিনি এমন একটি কালজয়ী স্থাপত্যকীর্তিকে সজ্ঞানে অশ্লীলমূর্তি দিয়ে কলুষিত করে যাবেন—এ কথা বিশ্বাস্য ? তিনি তো অনায়াসে ক্লান্ত রামের পরি-বর্তে শ্যামকে নিয়োগ করে এ অপবাদ এড়াতে পার-তেন। অপরপক্ষে, সেই মূল নিয়ামকের অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে রাম-শ্যাম-যদু আপন খেয়ালে ক্রমাগত উৎসাহবর্ধক অশ্লীলমূর্তি গড়ে চলেছে—এ-কথাই বা মেনে নিই কেমন করে ?

শেষ যুক্তি—যেখানে ঐ ক্লান্তির প্রশ্ন আদৌ ওঠে না, সেখানে ? ভুবনেশ্বরের ছোট ছোট মন্দিরে এগুলি কেন এল ? বৈতাল, মুক্তেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, রাজারানী ? সেগুলি তো নিতান্ত ছোট মন্দির ?

XI. INCREASE OF POPULATION : [জনসংখ্যাবৃদ্ধি] : এই যুক্তিটার বিষয়ে কোন পূর্বসূরীর আলোচনা আমার নজরে পড়েনি।

বিশ-ত্রিশ বছর আগে ভারতরাষ্ট্রে ভ্রূণহত্যা ছিল সামাজিক অপরাধ, নৈতিক পাপ। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখার অপরাধে অনেককে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। মাত্র কয়েক দশক পরে দেখছি—সামাজিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটা আমূল বদলে গেছে। ভ্রূণহত্যা আর আইনত অপরাধ নয় ; জন্মনিয়ন্ত্রণ আজ স্বীকৃত প্রকল্প। পথে-ঘাটে সিনেমা-টি. ভি.-তে তাই আজ লালত্রিকোণের প্রচার। কেন ? যেহেতু জনসংখ্যা-বৃদ্ধি তৃতীয়-বিশ্বের বৃহত্তম সমস্যা আজকের দিনে।

মধ্যযুগে অবস্থাটা ছিল ঠিক বিপরীত। যার রাজ্যে যত জনবল তার সামরিক শক্তি তত বেশি। লক্ষ্য করবার বিষয় আচার্য শঙ্কর পুরীধামে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ বৈতাল-মন্দির নির্মাণের বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বে। তার মানে ঠিক যে সময়কাল থেকে ভুবনেশ্বরে মন্দির-নির্মাণ তথা কলিঙ্গ-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের জোয়ার আসে। খাজুরাহোতেও মিথুনবাদ শিকড় গেড়েছে পুরীধামে ঐ শঙ্করাচার্যের মঠ প্রতিষ্ঠার একশ বছরের ভিতর। শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানের পর, আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু হিন্দু যুবক যৌবনের প্রথম পর্যায়েই সংসারাশ্রমে প্রবেশ করার বদলে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে থাকে। এতে রাজশক্তির পক্ষে বিচলিত হয়ে পড়া স্বাভাবিক। 'সত্ত্ব'-র সঙ্গে দ্বৈরথ সংগ্রামে 'রজঃ'-কে 'তম'-মুখী হতে হয়। অর্থাৎ যৌবনের প্রথম পর্যায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের সাত্ত্বিক প্রবণতার প্রতিবিধানে রাজশক্তিকে এমন প্রচারে নিযুক্ত হতে হয় যাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এমনও হতে পারে—জনসংখ্যা হ্রাস করানোর প্রয়োজনে যেমন আজকের দিনে রাষ্ট্র ও সমাজ লাজ-লজ্জা-শালীনতার তোয়াক্কা না রেখে যত্রতত্র লালত্রিকোণের প্রচারে মেতেছে, ঠিক তেমনিই হয়তো তদানীন্তন রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রনিয়ন্ত্রিত সমাজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে কামকেলিকে বিজ্ঞাপিত করতে চাইলেন। আজকের দিনে যেমন বৃহত্তর প্রচারের মাধ্যম—সংবাদপত্র, টি. ভি., সিনেমা এমনকি দেশলাইয়ের খোল—তেমনি সেদিন তা ছিল মন্দিরগাত্র ! যেখানে প্রতিদিন অগণিত নরনারী সমবেত হত। অচ্ছুতেরা মন্দিরের ভিতরে যেতে পারত না—কিন্তু মন্দিরের বাহিরের অলঙ্করণ দেখতে পেত। এজন্য ভিতরের প্রাচীরে নয়, শুধু বহির্গাত্রেই ঐ বিজ্ঞাপন। রাজশক্তিকে রণক্ষেত্রে মদৎ জোগাতে ওদের যে সবার আগে মরতে হত !

শঙ্করাচার্যের পুরীধাম প্রতিষ্ঠা এবং কলিঙ্গ-ভাস্কর্যে মিথুনাচারের ভরা-কোটাল এই দুটি সমকালীন ঘটনাকে নিতান্ত কাকতালীয় বলে বাতিল করা চলে কি ?

মিথুনাচারের বিবর্তন :

বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে নববিবাহিত দম্পতিকে উপদেশছলে বলেছেন, "বিবাহের পর প্রথম তিন-রাত্রি নব-পরিণীত স্বামী-স্ত্রী ভূতলে শয়ন করবে এবং রতিরঙ্গ-বিবর্জিত সংযত রাত্রি যাপন করবে। পরবর্তী সপ্তদিবস রজনী তারা যুগলে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাতে যাবে ; তারা এক-সঙ্গে পুষ্প-চয়ন করবে, গান শুনবে, গল্প-গুজব করবে। এইভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হবার পর স্বামী তার সহধর্মিণীর দৈহিক নৈকট্যে আসার প্রয়াস পাবে।" বাৎস্যায়ন বলছেন, "কোনও স্ত্রীলোকই জোর-জবরদস্তি পছন্দ করে না ; অপরিচিত বা অর্ধ-পরিচিত কোনও পুরুষের দৈহিক জবরদস্তিতে যদি সে আত্মদানে বাধ্য হয়, তবে হয়তো সে সারাজীবন তাকে ক্ষমা করতে পারে না। হয়তো সে সুরতক্রিয়াকেই ঘৃণা করতে শুরু করে, অথবা শুধুমাত্র তার স্বামীকে। প্রথম ক্ষেত্রে নারী-হিসাবে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।"[17]

এই অমূল্য উপদেশটি কলিঙ্গ-ভাস্কর যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন !

কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের একেবারে আদি যুগে, খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের গুহাভাস্কর্যে তাই দেখতে পাই অপ্রগল্‌ভ যুগলমূর্তি। বাৎস্যায়নের প্রতিটি দিনকে প্রতিটি শতাব্দী ধরে নিয়ে দেখছি ওরা সাত-আট শতাব্দী সুরতক্রিয়ায় বিরহ ছিল। তারা হাত ধরা-ধরি করে ফুল তুলেছে, গান শুনেছে, পরস্পরের মন ছোঁবার চেষ্টা করেছে। ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে।

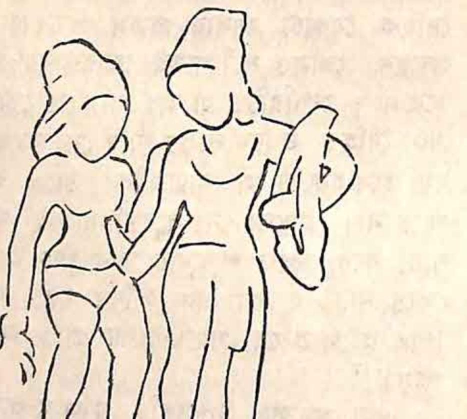
আমরা এই সাত-আটশ বছরের বিবর্তনকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। যথা :

(i) যুগল মূর্তি ; (ii) উত্তেজিত মিথুন ; (iii) শৃঙ্গাররত মিথুন ; (iv) মৈথুনরত মিথুন ; (v) যৌথ-যৌনাচার।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে এই পাঁচটি পর্যায় এসেছে একের পর এক। তার মানে এ নয় যে, প্রথম যুগে তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ের মিথুন-মূর্তি ছিল না। বস্তুত 'মৈথুনরত মিথুন' একেবারে প্রথম যুগেও ছিল। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে আমরা দেখেছি—ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের মিলনের দৃশ্যগুলি বিভিন্ন শতাব্দীতে পর পর প্রাধান্যলাভ করেছে। সংখ্যাতত্ত্ব ও গ্রাফ-সহযোগে আমার পূর্ববর্তী গবেষণা-গ্রন্থে সে তথ্যটা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি। এখানে যেহেতু আমরা শুধু রসের কারবারী তাই ঐসব সংখ্যাতত্ত্ব এড়িয়ে পাঁচটি পর্যায়ের ভিতর থেকে কয়েকটি নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করা গেল।

I. যুগল-মূর্তি :

প্রথম-জাতের মিথুন, যাদের আমরা 'যুগল-মূর্তি' নামে অভিহিত করেছি, তাদের আবির্ভাব ভারতীয় ভাস্কর্য-ইতিহাসের একবারে প্রথম যুগ



চিত্র—5·30 উদয়গিরির যুগলমূর্তি ; নায়ক-নায়িকার যৌথ পদচারণা ; খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী।

থেকে। প্রাগার্যযুগের প্রতীক-ভাস্কর্যের কথা বাদ দিলে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ঊষাযুগে ঐ নর ও নারী ছিল অপ্রগল্‌ভ, শালীনতা-বোধে সলজ্জ। দুটি উদাহরণ আমরা এখানে উপস্থিত করছি উদয়গিরি থেকে। এ দুটি অর্ধোৎকীর্ণ ভাস্কর্য বা 'বাস রিলিফ-ওয়ার্ক'।

আশ্চর্যের কথা, একই কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টজন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে এই ধরনের 'যুগল-মূর্তি' উৎকীর্ণ করা হয়েছে : ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধ-গয়া, উদয়গিরি, অজন্তা, ভাজা, কার্লে, মথুরায়। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখছি নায়ক ও নায়িকা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। দাঁড়িয়েই বেশি। বড় জোর নায়ক তার সঙ্গিনীর কাঁধে আল্‌তো করে একটি হাত রেখেছে, কিম্বা তার চম্পকাঙ্গুলি নিজের কর-মুষ্টিতে গ্রহণ করে আন্তর-উষ্ণতা নর্মসহচরীর দেহ-মনে সঞ্চারিত করছে। তারা লাজুক, তারা শালীন। আজকের দিনে নব-বিবাহিত দম্পতি ক্যামেরাম্যানের সামনে যতটা প্রগল্‌ভতা দেখানো শালীন বলে মনে করে দু-হাজার বছর আগেও দেখ্‌ছি ঠিক সেইটাই ছিল শালীনতার সীমারেখা।

বিরাট ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য সেই অরণ্য-অধ্যুষিত, রাজপথহীন বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তবাসী শিল্পীর দল যে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ-কথা মানতে মন সরে না ; কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যে যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তাতে সিদ্ধান্তে



চিত্র—5·31 উদয়গিরির যুগলমূর্তি ; অভিমানিনী নায়িকা ও নায়ক ; খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।

আসতেই হয় যে, এঁরা একই শিল্পগুরুর ধারাবাহক। এ বিষয়টি ইতিপূর্বেই (চিত্র—3·4) আলোচনাকালে লিপিবদ্ধ করেছি। মনে হয়, প্রথম যুগে এই জাতের মিথুন এসেছিল নিতান্ত অলঙ্করণরূপে। যেন এক জোড়া পদ্ম, শঙ্খ অথবা জ্যামিতিক নক্‌শা। কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার দুদিকে—ডাইনে-বাঁয়ে, এভাবে ভারসাম্য-রক্ষার খাতিরে যুগলবস্তু সংস্থাপন আলিম্পনরীতির একেবারে মূল কথা। কিন্তু যুগল মনুষ্যমূর্তির ক্ষেত্রে একটা 'বিশেষ' আছে। জোড়া-জোড়া পদ্ম-শঙ্খ-পক্ষী-মৎস্যের অলঙ্করণে দেখা যায় একটি

ডাইনে বেঁকেছে, অপরটি তার দর্পণ-প্রতিবিম্বের ছাঁদে বাঁ-য়ে হেলেছে। তারা একে অপরের প্রতিচ্ছায়া। অপরপক্ষে, যুগল-মূর্তিতে একটা লিঙ্গগত বৈপরীত্য অনস্বীকার্য, যা ঐ পদ্ম-শঙ্খ-পক্ষী-মৎস্যে নজরে পড়ে না। তা হচ্ছে : একটি পুরুষ, একটি প্রকৃতি। বৈপরীত্য তাদের ভঙ্গিমায় নয়, লিঙ্গভেদে। যেন ঐ বৈপরীত্যের বন্ধনেই গড়ে ওঠে একটা ভারসাম্যের ঐকতান—যেন চৌম্বকের দুটি বিপরীত মেরুর পারস্পরিক আকর্ষণ ; যেন বৈদ্যুতের দুই ভিন্নপ্রান্তের চুম্বন-স্ফুলিঙ্গ : ঋণাত্মক ও ধনাত্মক।

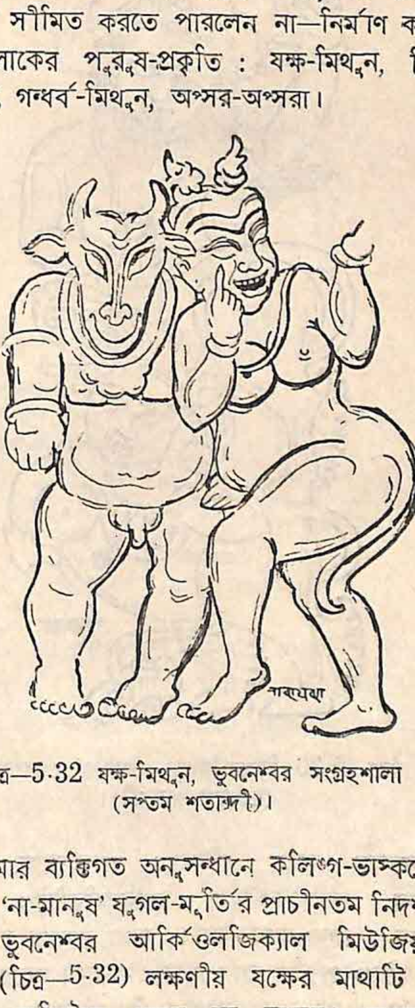
দু-একশ বছরের ভিতরেই এ জাতীয় মূর্তি গড়ার আরও একটি প্রেরণা দেখা দিল। এরা এখন আর শুধু অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে আসেনি, এসেছে অন্য প্রেরণায়। তারা হচ্ছে দাতা-দম্পতি বা donar couple। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নাসিককে কেন্দ্র করে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সমসময়ে—কিছু আগে পরে—গড়ে উঠেছিল একাধিক বৌদ্ধ সংঘারাম—চৈত্য ও বিহার। ভাজা, কন্‌ডেন, কাহ্নেরী, পিথালকোরা, নাসিক, অজন্তা, কার্লে প্রভৃতি। ঐ সব মন্দিরের প্রবেশদ্বারে দেখতে পাই এই জাতের দাতা-দম্পতির মূর্তি। তারা কল্পলোকের নায়ক-নায়িকা নয়, বাস্তব রাজারানী, শ্রেষ্ঠী-শ্রেষ্ঠিণী, দাতা ও তাঁর সহধর্মিণী। এদের সঙ্গে মিশরীয় পিরামিডে ফারাও ও রানীর যুগল-মূর্তির তুলনা করা চলে। উভয় ক্ষেত্রেই দম্পতি এসেছেন দেবতার প্রতি সম্মান জানাতে, শ্রদ্ধা জানাতে। তফাৎ এই যে, মিশরীয় যুগল-মূর্তি অব্যতিক্রম সমভঙ্গঠামে ; অপরপক্ষে, ভারতীয় যুগল-মূর্তি আভঙ্গ অথবা ত্রিভঙ্গঠামে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটি কথা বলে নিই :

শাস্ত্রকার বলেছেন, "প্রমথ মন্দিরে উৎকীর্ণ করতে হবে—সর্প, মঙ্গলচিহ্ন, বিহগ, বিল্বপত্র, ঘট, স্বস্তিকচিহ্ন এবং মিথুন"। এখানে 'মিথুন' শব্দটিকে কলিঙ্গ-ভাস্কর অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। মিথুন অর্থে : পুরুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান। তাদের মৈথুন-রত অবস্থা আবশ্যিক নয়। কালিদাসের 'হংস-মিথুন', বাল্মীকির 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন' এবং ছান্দোগ্য-উপনিষদের 'বাক-প্রাণ-মিথুন'ও ঐ একই অর্থবহ।

আরও লক্ষণীয়, কলিঙ্গ-ভাস্কর 'মিথুন' শব্দটিকে নর ও নারীর মধ্যে সীমিত রাখার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। তাই মনুষ্য-মিথুনের পাশাপাশি, এমনকি পরিবর্তে তাঁরা উৎকীর্ণ করেছেন : বানর-বানরী, সিংহ-সিংহী, করি-করিণী, নাগ-নাগিনী। বস্তুতঃ কলিঙ্গ-ভাস্করের কাছে এটাই ছিল আমাদের প্রত্যাশা—এটাই ভারতীয় ঐতিহ্যের শিক্ষা। ভারতবর্ষ মানবসমাজের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি ক্রমাগত 'না-মানুষদের' জগতে প্রক্ষিপ্ত করেছে। তাই উপনিষদের কবি 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্রে বলেছেন—এই রাত্রি মধুময়, এই ওষধি, এই বনস্পতি সবই মধুময়। তাই শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেন তখন শুধু অনসূয়া-প্রিয়ংবদাই নয়, হরিণীরাও কাঁদে, এমনকি গাছেরা কাঁদে, কাঁদে বনজ্যোৎস্নাও !

তাই সেই ভারতীয় ভাবনার উত্তরসাধক কলিঙ্গ-ভাস্কর বাস্তব জীবজগতেই 'মধুবাতা ঋতায়তে' মন্ত্রকে সীমিত করতে পারলেন না—নির্মাণ করলেন কল্পলোকের পুরুষ-প্রকৃতি : যক্ষ-মিথুন, কিন্নর-মিথুন, গন্ধর্ব-মিথুন, অপ্সর-অপ্সরা।



চিত্র—5·32 যক্ষ-মিথুন, ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালা (সপ্তম শতাব্দী)।

আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে কলিঙ্গ-ভাস্কর্যে এ জাতীয় 'না-মানুষ' যুগল-মূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শনটি আছে ভুবনেশ্বর আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে। এখানে (চিত্র—5·32) লক্ষণীয় যক্ষের মাথাটি হচ্ছে ষণ্ডের, বাকিটুকু দেহে সে মানুষ। অপরপক্ষে যক্ষিণী প্রায় পুরোপুরি মানবী—শিঙ, লাঙ্গুল ও স্বদন্ত ব্যতিরেকে। এই জাতীয় চিন্তাধারা—অর্থাৎ কল্পলোকের যুগল-মূর্তির রূপায়ণ যে

কলিঙ্গ-ভাস্করকে একেবারে শেষ যুগ পর্যন্ত অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছি ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি কিন্নর-মিথুন। এটি কোণার্ক জগমোহনের দ্বারের জ্যাম্ব-অংশ থেকে। প্রদীপ নিবে যাবার আগে খোদাই করা!

আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভাজা-কার্লে-কাহ্নেরী প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাস্কর্যে প্রায় সর্বত্র স্ত্রী-মূর্তিটি আছে পুরুষের দক্ষিণে, কারণ বৌদ্ধ-ভাস্করের মতে প্রকৃতি হচ্ছে পুরুষের 'বর-অঙ্গ : 'বেটার-হাফ'! তাই সে পুরুষমূর্তির



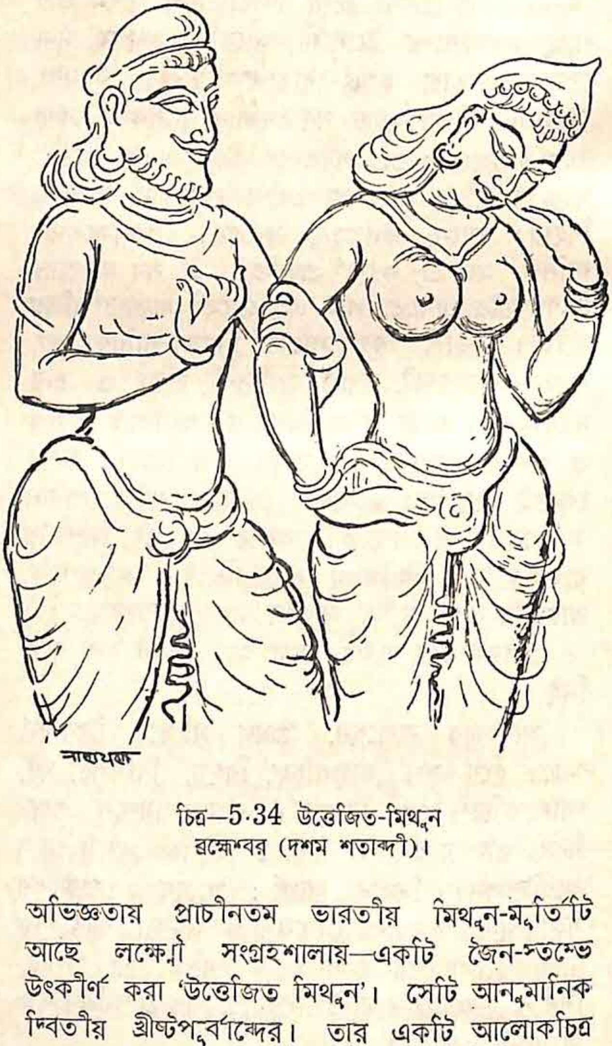
চিত্র—5·33 কিন্নর-মিথুন, কোণার্ক প্রবেশদ্বার (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

দাক্ষিণ্যসহ আছে দক্ষিণে। অপরপক্ষে, হিন্দু-ভাস্কর স্ত্রী-জাতীয়ার বামা-গতিটাকে প্রাধান্য দিলেন। রামা হবে বামা। ফলে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দেবদেউলে প্রকৃতি প্রায় আবশ্যিকভাবে আছে পুরুষ-মূর্তির বামে। যে-কারণে শিবমন্দিরে পূর্বমুখী শিবলিঙ্গের উত্তর-রাহাপাগের কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকেন পার্বতী, দক্ষিণ ও পশ্চিম রাহাপাগের পার্শ্ব-দেবতা যথাক্রমে গণেশ ও কার্ত্তিকেয়।

II. উত্তেজিত মিথুন :

দ্বিতীয় জাতের মিথুনকে আমরা বলেছি 'উত্তেজিত মিথুন'। যাদের সংজ্ঞার্থ : আলিঙ্গনবদ্ধ, চুম্বনোদ্যত, অথবা প্রাকমিলনকেলিরত, অথচ যাদের নিম্নাঙ্গ অপ্রকট।

ভারতীয় ভাস্কর্যে যুগল-মূর্তিকে ব্যাপকভাবে উত্তেজিত হতে দেখছি ষষ্ঠ শতাব্দীতে, শেষ চালুক্যযুগে নির্মিত আহিওলের দুর্গামন্দিরে এবং লাদখান মন্দিরে। তার পূর্বে যে উত্তেজিত মিথুনের পরিকল্পনা করা হয়নি এ কথা বলব না। আমার



চিত্র—5·34 উত্তেজিত-মিথুন ব্রহ্মেশ্বর (দশম শতাব্দী)।

অভিজ্ঞতায় প্রাচীনতম ভারতীয় মিথুন-মূর্তিটি আছে লক্ষ্মৌ সংগ্রহশালায়—একটি জৈন-স্তম্ভে উৎকীর্ণ করা 'উত্তেজিত মিথুন'। সেটি আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। তার একটি আলোকচিত্র ত্রৈমাসিক 'রূপম্' পত্রিকায় (এপ্রিল-জুলাই 1925, p. 54) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি ব্যতিক্রম। প্রথম পাঁচ-ছয় শত বছর—যেন বাৎস্যায়নের নির্দেশ মেনে ওরা শুধু পুষ্পচয়ন করেছে, গল্পগাছা করেছে!

শেষ চালুক্য যুগের মিথুন-মূর্তিগুলি উত্তেজিত হলেও তাদের নিম্নযৌনাঙ্গ ছিল গোপন। সাহিত্যে ততদিনে শৃঙ্গার ও মৈথুনের অকপট বর্ণনায় যদিচ কোন বিধিনিষেধ ছিল না, তবু ভাস্করদল গুপ্তযুগে অতটা প্রকট হতে পারেননি। হাজার হোক, ভাস্কর্য হচ্ছে দৃশ্যকাব্য—নয়নগ্রাহ্য ললিতকলা।



চিত্র—5·35 উত্তেজিত-মিথুন
ব্রহ্মেশ্বর (দশম শতাব্দী)।

উত্তেজিত মিথুনের পর্যায়ক্রম বোঝাতে আমরা এখানে পর পর চারটি উদাহরণ উপস্থাপিত করছি। প্রথম দুটি ব্রহ্মেশ্বর মন্দির থেকে। শেষ দুটি আমার সঙ্গে কলিঙ্গ পরিক্রমায় শিল্প-তীর্থযাত্রী শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগারের—একটি লিঙ্গরাজ ও একটি কোণার্ক থেকে।

প্রথম উদাহরণে (চিত্র—5·34) নায়িকার শুধু হাতখানি ধরা হয়েছে, তাতেই সে লজ্জাবনতা। নিজের বাঁ-হাতখানি রেখেছে চিবুকে, কিন্তু স্মিত-আস্যে তার সম্মতির বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় উদাহরণেও দেখেছি (চিত্র—5·35) নায়িকা সরাসরি তার প্রেমাস্পদের দিকে তাকাতে পারেনি। ভাবখানা : 'নহি নহি বোলবি, মোড়ায়বি গীম'। কিন্তু এবার দেখছি, মেয়েটি তার ডান হাতখানি রেখেছে দয়িতের স্কন্ধে। স্বীকার করতেই হবে, প্রথম উদাহরণের নায়িকার চেয়ে দ্বিতীয়া একটু বেশি উত্তেজিতা—বিকচ-উরসার মধ্যমাঙ্গের বিচিত্রঠামেও তার সম্মতির



চিত্র—5·36 লিঙ্গরাজ খিলান
ভুবনেশ্বর (একাদশ শতাব্দী)।

স্বীকৃতি। তৃতীয় উদাহরণটি শিল্পী শ্রীদুগার এঁকেছিলেন লিঙ্গরাজ-বিমানের উপরজঙ্ঘা থেকে (চিত্র—5·36)। এখানে নায়িকা সরাসরি তার প্রেমাস্পদের দিকে তাকাতে পেরেছে। বিকচ-কলাপ ময়ূরের মতো সে হাত দুটি লীলায়িত ভঙ্গিমায় মাথার উপরে তুলেছে। দয়িতকে সে স্পর্শ করে নেই—কিন্তু তার আভঙ্গঠামে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে চুম্বন-তিয়াসী।

চতুর্থ উদাহরণটি (চিত্র—5·37) কোণার্ক জগমোহন থেকে সংকলিত। নায়িকা এখানে রীতিমতো রত্যাতুরা। ভারতচন্দ্রের ভাষায়, "লাজের মাথায় হানিয়া বাজ" মেয়েটি সবলে আকর্ষণ করেছে তার

নায়ককে। দয়িতের ওষ্ঠাধর অনিবার্য আকর্ষণে নেমে আসছে!

III. শৃঙ্গাররত মিথুন :

সংজ্ঞা অনুসারে আমরা তাকেই শৃঙ্গাররত মিথুন বলেছি, যারা মৈথুনরত নয় অথচ যাদের



চিত্র—5·37 কোণার্ক জগমোহন (ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

নিম্নাঙ্গ গোপন নয়। এ জাতীয় সংজ্ঞা শিল্পশাস্ত্রে নেই। আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থে যৌন-তার পরিমাপ নির্ধারিত করতে—কোন যুগে, কোন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, কোন দেবদেবীর মন্দিরে বা আঞ্চলিক প্রভাবে মিথুন-মূর্তিতে যৌনতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে তা নিরূপণ করতে—এই ধরনের 'মন-গড়া' (arbitrary) সংজ্ঞা আরোপ করে আলোচনা করেছিলাম মাত্র। বর্তমান গ্রন্থে যৌনতার পরিমাপ নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত শেষ তিনজাতের মিথুন-মূর্তির আলেখ্য ও আলোচনাও আমি পরিহার করতে ইচ্ছুক। সেগুলি 'অশ্লীল' বলে নয়। বর্তমান গ্রন্থে অপ্রয়োজন বলে। এই বিষয়টি নিয়ে যেহেতু অধিকারী ও গবেষকদের জন্য আমি ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই এই সাধারণ-পাঠকের জন্য লিখিত পুস্তকে সেগুলি অপ্রয়োজন মনে করছি।

শৃঙ্গাররত মিথুন পর্যায়ের দুটিমাত্র উদাহরণ এখানে সংস্থাপিত করা গেল—পূর্ণ মূর্তির নয়। শুধুমাত্র ঊর্ধ্বাঙ্গের। কারণ রসের বিচারে সে দুটি অপরিহার্য মনে করছি।

চিত্র—5·38-এ সংযোজিত মিথুন মূর্তিটি কারও কারও মতে কোণার্কের শ্রেষ্ঠ মিথুন!

এর 'লাবণ্যযোজনা' আমাদের স্মরণপথে এনে দেয় বাংলাসাহিত্যে সুপরিচিত আর এক 'লাবণ্যে'র কথা! "সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়ালো। অমিত লাবণ্যের মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরল। লাবণ্যের চোখ অর্ধেক বোজা, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো, পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই, শুধু আনন্দ আছে, সেই অমর্ত্যলোকের অব্যক্ত ধ্বনি জাগছে।"

বাস্তবে অস্তসূর্যউদ্ভাসিত কোণার্ক দেবদেউলের ধ্বংসস্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে মহাকালের কশাঘাতে নির্যাতিত ঐ মিথুন-মূর্তির ঐকান্তিক প্রেমের দৃশ্যটি দেখতে দেখতে আপনার মনেও শেষের কবিতার ঐ রোমান্টিক অনুভূতিটাই জেগে উঠবে: দেহাতীত প্ল্যাটনিক-ল্যাভ্-এর একটা অনুকরণ, নিকষিত হেমের একটা স্বর্ণাভা, যদি না...

আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি না ঐ মূর্তির নিচের দিকে আপনার নজর পড়ে!

তা পড়লেও কিন্তু আর একটি সত্য অনুভব করবেন: যেখানে দেহ আছে, সেখানেও আনন্দ

থাকতে পারে। এবং আছে !

শেষ উদাহরণটিতে (চিত্র—5·39) নায়িকার মূর্তি রূপায়ণে শিল্পী একটি অপূর্ব দ্বৈতভাব ফুটিয়ে তুলেছেন : মনে হয়—মেয়েটি আন্‌মনা। যেন অতীতের কোন বিস্মৃতপ্রায় নায়কের কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে ! বর্তমানকে তাই বলে সে অস্বীকার করেনি। প্রত্যক্ষকে সে দক্ষিণহস্তের আলিঙ্গনে নিবিড় করে পেতে চায় ; অথচ করলগ্নকপোল বাম-হস্তের মূর্ছনায় মনে হয়, সে বুঝি মনে মনে হারিয়ে



চিত্র—5·38 কোণার্ক জগমোহন
(ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

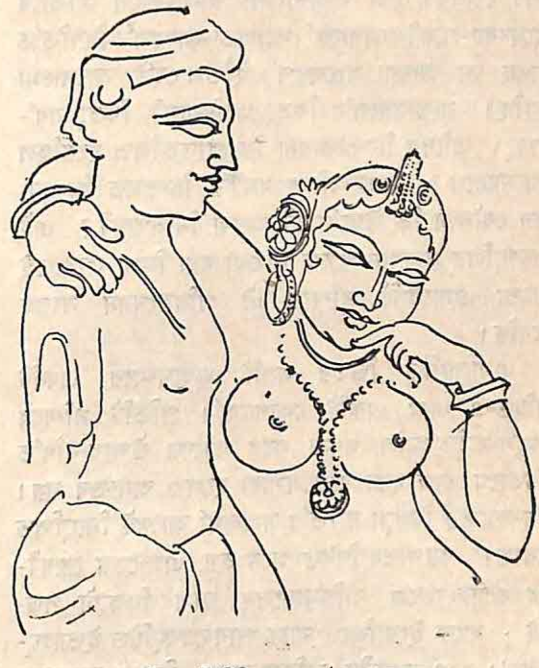
গেছে কোন্ অতীতযুগের বিস্মৃতপ্রায় কুয়াশাচ্ছন্ন খণ্ডমুহূর্তে। যেন তার কৈশোরকালের কোনও ভীরু, মুগ্ধ কিশোরের কথা, তার কম্পিত করস্পর্শের শিহরণ, তার প্রথম-চুম্বনের রোমাঞ্চ ! সেই আধো-মনে-পড়া অভিজ্ঞতার অন্তর্লীন অনুরণনে সে মগ্ন-চৈতন্য ! শাশ্বত নারীহৃদয়ের এক 'দেবানজানন্তি' রহস্য : 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাইনার'-এক বিচিত্র ব্যঞ্জনা এখানে বিধৃত। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দোদুল্যমান ঐ দোলকটির দ্বৈতসত্তায় আপনি কি লাবণ্যকে দ্বিতীয়বার দেখতে পেলেন ?

—'যে আমাকে দেখিবারে পায়/অসীম ক্ষমায়/
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি
এবার পূজায় তারে দিতে চাই আপনারে বলি !' ?

আমার কিন্তু মনে হল—ও হচ্ছে বজ্রসেনের বাহুবন্ধে উত্তীয়র চিন্তায় অন্যমনা—'শ্যামা'।

পরিসংখ্যায়নের সিদ্ধান্ত :

যদিও শেষ-পর্যায়ের মিথুন-মূর্তিগুলির—শৃঙ্গাররত, মৈথুনরত ও যৌথ-যৌনাচাররত বন্ধকাম মূর্তিগুলির আলেখ্য ও আলোচনা এ-গ্রন্থে পরিহার করা গেল তবু পূর্ববর্তী গ্রন্থের সামূহিক সিদ্ধা-



চিত্র—5·39 কোণার্ক জগমোহন
(ত্রয়োদশ শতাব্দী)।

ন্তের একটা চুম্বকসার এখানে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন যুগে কলিঙ্গ-মন্দিরে মিথুনাচার বিষয়ে যে বিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি কতটা সম্পৃক্ত। আমরা কলিঙ্গের বিভিন্ন যুগের এগারোটি মন্দিরে যাবতীয় মিথুন-মূর্তিগুলির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছিলাম এবং পূর্বকথিত পাঁচটি ভাগে তাদের বিভক্ত করেছিলাম, অর্থাৎ—যুগল-মূর্তি, উত্তেজিত মিথুন, শৃঙ্গাররত মিথুন, সঙ্গমরত মিথুন এবং যৌথ-যৌনাচার।

আমরা যতদূর জানি, এভাবে মিথুন-মূর্তিগুলির জাত-নির্ণয়, যৌনতার তথা 'অশ্লীলতা'-র বিচারে তাদের মূল্যায়ন এবং বিবর্তন-ধারার সমীক্ষা ইতি-পূর্বে করা হয়নি। অর্থাৎ কোন্ মন্দিরে কী-জাতের কতগুলি মিথুন আছে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ তার পরি-

সংখ্যান গ্রহণ করেননি—কোনও গবেষক করেছেন বলেও আমরা জানি না। সংখ্যায়, গুরুত্বে তারা কালের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান, না কমছে ; কেন বাড়ছে, কেন কমছে তা কেমন করে বিচার করব যদি কোনও পরিসংখ্যানই না থাকে ? কলিঙ্গ-দেউলে মূর্তি-নির্মাণের জোয়ার আসে শশাঙ্কের উড়িষ্যা-বিজয়ের অর্ধশতাব্দীকাল পরে। অর্থাৎ সপ্তম শতকের প্রথম পাদে। তারপর শৈলোদ্ভব, ভৌমকর, সোম-বংশী, কেশরী এবং গঙ্গ-বংশের রাজত্বকালে কীভাবে ভুবনেশ্বর-পুরী-কোণার্কে স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিবর্তিত হয়েছে তা আমরা সংক্ষেপে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। রাজন্যবর্গের কিছু আদিবাসী, কিছু বর্ণ-হিন্দু। তাঁদের চিন্তাভাবনা কি প্রতিফলিত হয়েছিল মিথুনাচারে ? সমসাময়িক ধর্মীয় চিন্তাতে মিথুন-বাদে যৌনতা কি ঊর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী ? এই প্রশ্নগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় কিনা জানতেই আমরা এগারোটি মন্দিরে ঐ পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছি।

এগারোটির ভিতর নয়টি ভুবনেশ্বরে, একটি খিচিঙ-এ এবং একটি কোণার্কে। প্রতিটি মন্দিরে মিথুন-মূর্তিগুলি গণনা করে তাদের উপরে-বর্ণিত পাঁচভাগে ভাগ করা আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। পাঁচ-জাতের মিথুন-মূর্তির সংজ্ঞার্থ আগেই নিরূপিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এজাতের শ্রেণী-বন্ধ করার কাজে ব্যক্তিমানসের ছাপ কিছুটা পড়-বেই ; যাকে ইংরাজিতে বলে 'সাব্‌জেক্‌টিভ ইভ্যাল্যু-য়েশন'। এ জাতীয় ব্যক্তিমানসের বিচার আমাদের সমীক্ষায় কতটা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে তা বুঝে নিতে আমি একটি ছোট্ট পরীক্ষা করি। আমি এই পরিসংখ্যান সংগ্রহের কাজে দুইবার কলিঙ্গ পরিক্রমা করি। প্রথমবার আমি সস্ত্রীক গিয়েছিলাম। আমার অনুরোধে আমার যাত্রাসঙ্গিনী কতকগুলি মন্দিরে এককভাবে মিথুন-মূর্তিকে শ্রেণীবন্ধ করেন। দেখা গেল, আমার শ্রেণীবদ্ধতার সঙ্গে তাঁর তালি-কার অতি সামান্য ইতরবিশেষ হয়েছে। বেশ কয়েক-বছর পরে আমি যখন দ্বিতীয়বার কলিঙ্গ-পরিক্রমা করি তখন আমার সঙ্গী ছিলেন. প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার এবং কলাসমালোচক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল মৈত্র। আমার অনুরোধে ওঁরা দুজনেও দু-একটি মন্দিরে পৃথক-পৃথকভাবে মিথুন-মূর্তিগুলিকে শ্রেণী-বন্ধ করেন। এবারেও দেখা গেল আমাদের তিনজনের পরিসংখ্যানের প্রভেদ 'মার্জিনাল', পাঁচ শতাংশের বেশি নয়।

মূল্যায়নের দ্বিতীয় পর্যায়টি শুধু দুরূহ নয়, বিতর্কমূলক ; অর্থাৎ বিভিন্ন জাতের মূর্তির উপর যৌনতার তথা 'অশ্লীলতা'র 'মান'-নিরূপণ ! এক্ষেত্রে ব্যক্তিমানস প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করবে আমা-দের পরিসংখ্যান। যৌনতার পরিমাপ করতে আমাদের একটি 'যৌনতা-একক' নির্ধারণ করতে হবে। অথবা 'তথাকথিত অশ্লীলতার' একক। এটা কী ভাবে করা যায় ? ঐ 'একক' এবং বিভিন্ন স্তরের মিথুন-মূর্তিগুলিতে 'যৌনতার মান' নির্ধারণ করতে আমি দ্বিবিধ পথে অগ্রসর হই। আমার লেখা বাংলা বই 'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন'-গ্রন্থটির সঙ্গে একটি ছাপা-কাগজ বিলি করে পাঠকদের অনুরোধ করি তাঁদের ব্যক্তিগত মূল্যায়নে তাঁরা কী-জাতীয় 'মান' আরোপ করছেন তা জানাতে। আমার সৌভাগ্য, অনেকেই নিজব্যয়ে ডাকযোগে তাঁদের মতামত জানান। ঐ সময়ে 'ইন্‌স্‌টিট্যুট অব্‌ এঞ্জিনিয়ার্সের' গোখেল-রোডের অফিসে আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা যায় ; বিষয়টি ছিল : 'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুনাচারের বিবর্তন।' এই সভাতে প্রায় সওয়া দুইশত শ্রোতা ছিলেন—অধিকাংশই এঞ্জি-নিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট। সেই সভাতে একটি আবেদনপত্র বিলি করা যায়—শ্রোতৃবৃন্দকে তাঁদের ব্যক্তিগত অভি-রুচিমত অশ্লীলতার মান নিরূপণ করে পাঁচ-জাতের মিথুনের মূল্যায়ন করতে বলা হয়। তাঁদের প্রত্যুত্তর থেকে আমরা প্রতিটি জাতের মিথুন-মূর্তির একটা 'গড়-মান' লাভ করি। এভাবেই গণভোটে বিভিন্ন জাতের মিথুন-মূর্তিতে আনুপাতিক অশ্লীলতার গড় মান নির্ণীত হয়।

ঐ প্রশ্নপত্রে প্রথম-প্রশ্নটি ছিল : "Do you agree that the degree of eroticism/obscenity of a few pieces of art can be evaluated relatively by subjective assessment ?" [আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, কয়েকটি শিল্পদ্রব্যের যৌনতা/অশ্লীলতার আপে-ক্ষিক পরিমাপ ব্যক্তিগত মূল্যায়নের মাধ্যমে করা সম্ভব ?]

অধিকাংশের জবাবই ছিল : হ্যাঁ। শতকরা পনের জনের মত ছিল : না। তাঁদের মধ্যে আবার অনেকে জানিয়েছিলেন যে, জবাবে তাঁরা 'হাঁ'-ই বলতেন কিন্তু বলছেন না এজন্য যে, শিল্পদ্রব্যের গুণাগুণ গণ-ভোটের মাধ্যমে বিচার করার মৌল পদ্ধতিটাতেই তাঁদের আপত্তি। যাই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহণ-কারী—যাঁদের মতে এভাবে মূল্যায়ন সম্ভব—তাঁরা

দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল : "Assuming that the eroticism-value of the 'Chaste-couple (type I, as on the facade of Udaygiri i.e. Fig. 5.30 in this book) be 'nil', and that of the most pornographic exhibit you have come across has a value of 100, what relative values would you generally ascribe to types II, III, IV & V ?" [যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এ-গ্রন্থের Fig. 5.30 চিত্রের যুগল-মূর্তিতে যৌনতার মান 'শূন্য' এবং আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সর্বাপেক্ষা যৌনতা-আশ্রয়ী মূর্তির মান 100, তাহলে আপনি ঐ বাকি চার-জাতের মূর্তিতে, অর্থাৎ উত্তেজিত মিথুন, শৃঙ্গাররত মিথুন, মৈথুনরত মিথুন এবং যৌথ যৌনাচারের শিল্পবস্তুগুলিতে কী মান আরোপ করবেন ?]

আমরা যে প্রত্যুত্তরগুলি পেয়েছিলাম তার গড়-ফল নিম্নোক্ত প্রকার (যৌনতার মান) :

যুগল-মূর্তি	...	0
উত্তেজিত মিথুন	...	5
শৃঙ্গাররত মিথুন	...	20
মৈথুনরত মিথুন	...	50
যৌথ-যৌনাচার (ও বিকৃতকাম)		80

এই গণভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে ঐ মিথুন-মূর্তি বিষয়ে আধুনিককালের দর্শকদের বিচার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে আসা বোধকরি অন্যায় হবে না :—

(i) প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'যৌনতার মান' ক্রমবর্ধমান। কোন ক্ষেত্রেই যৌনতার মান পূর্ব উদাহরণের চেয়ে কম নয়। এ-থেকে সম্ভবত ধরে নেওয়া যায় যে, আমরা যে পাঁচ-জাতের মিথুনে যৌনতার মান ক্রমবর্ধমানহারে সাজিয়ে ছিলাম সেটা ঠিক ছিল।

(ii) প্রথম ও দ্বিতীয় জাতের মিথুনের মধ্যে পার্থক্য মাত্র 5, অথচ দ্বিতীয় ও তৃতীয় জাতের মধ্যে পার্থক্য 15। তার হেতু মনে হয়—তৃতীয় জাতের মিথুনে যেহেতু নিম্ন-যৌনাঙ্গ দৃষ্টিগোচর তাই মানটা এভাবে বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে পশ্চিমখণ্ডে পুরুষ (যেমন, মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড') অথবা নারী (যেমন, আঙরের 'লা সুর্স') 'ন্যুডে' আমরা নিম্নযৌনাঙ্গ দেখতে পাই ; কিন্তু নরনারীর যৌথ উপস্থিতিতে—মিলন-দৃশ্যে—সচরাচর তা অপ্রকট রাখা হত। তাছাড়া ভারতীয় ললিতকলার অন্যান্য নয়নগ্রাহ্য শিল্পে—গুহাচিত্রে, মিনিয়েচারে, অলঙ্কৃত তৈজসপত্রেও তা 'টাবু' হিসাবে বর্জিত হয়েছে। হয়তো সে জন্যই তৃতীয় জাতের মিথুনে 'যৌনতার মান' এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iii) তৃতীয় এবং চতুর্থ জাতের মিথুন-মূর্তির মধ্যে 'যৌনতার মান' খুব বেশি বেড়ে গেছে। তার একটিই অর্থ : আধুনিক দর্শকের দৃষ্টিতে ভাস্কর্যে যৌন-মিলনের খোলাখুলি প্রতিচ্ছবি রুচিকর মনে হয়নি। তার অনেকগুলি হেতু। এক কথায় তা হচ্ছে এই—যৌন-মিলনের বর্ণনা ইদানিংকালে আভাসে-ইঙ্গিতে, প্রতীকের মাধ্যমে হওয়াই প্রত্যাশিত।

(iv) একই কারণে চতুর্থ ও পঞ্চম জাতের মিথুনে 'যৌনতা-মান'-এর বিরাট পার্থক্য।

তৃতীয় প্রশ্নটি 'যৌনতা' বিষয়ক নয়, 'অশ্লীলতা' বিষয়ক। প্রশ্ন করা হয়েছিল, একইভাবে পাঁচজাতের মিথুনে 'অশ্লীলতার মান' নিরূপণ করতে। এবার যে সংখ্যাগুলি পাই তার গড় (অশ্লীলতার মান) :

যুগল-মূর্তি	...	0
উত্তেজিত মিথুন	...	0
শৃঙ্গাররত মিথুন	...	15
মৈথুনরত মিথুন	...	45
যৌথ-যৌনাচার (ও বিকৃতকাম)		95

এই সমীক্ষা থেকে সম্ভবত নিম্নলিখিত অনু-সিদ্ধান্তে আসতে পারি আমরা :

(i) উত্তেজিত মিথুনের আবেদনে দর্শক বিন্দুমাত্র অশ্লীলতার আভাস পাননি।

(ii) শৃঙ্গাররত মিথুনগুলি তাদের নগ্নতার জন্য কিছুটা 'অশ্লীল' মনে হয়েছে।

(iii) মৈথুন-রত মিথুনে এবারেও দর্শক বিব্রত। অশ্লীলতার মান বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটা।

(iv) শেষ পর্যায়ের মিথুনে—যৌথ-যৌনাচারে

(iii) মৈথুনরত মিথুনে এবারেও দর্শক বিব্রত। অধিকাংশ ভোটার তাদের শতকরা শতভাগ 'অশ্লীল' বলে মন্তব্য করেছেন।

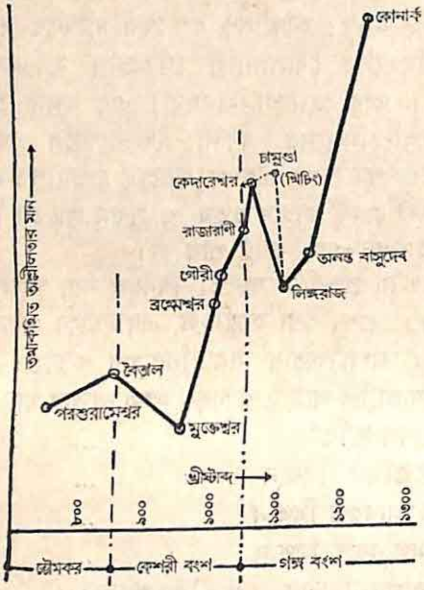
আমরা মিথুনাচার বিশ্লেষণ করতে ঐ দুটি মান—যৌনতা ও অশ্লীলতার মানের গড় সংখ্যাটি আরোপ করেছি প্রতিটি জাতের মিথুনে।

এখন আমরা একটি গ্রাফ রচনা করতে পারি, যার 'অ্যাবসিসা' হচ্ছে কাল এবং 'অর্ডিনেট' হচ্ছে যৌনতা-তথা-অশ্লীলতার মান।

গ্রাফটি বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নসিদ্ধান্তে আসতে পারি :

1. যৌনতা ও তথাকথিত অশ্লীলতা সাধারণ-ভাবে কালের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ক্রমবর্ধমান।

2· কিন্তু দুবার দেখছি তা নিম্নমুখী। আর দুবারই সেটা ঘটেছে রাজশক্তি হস্তান্তরিত হবার অব্যবহিত পরে। কেন? আমরা একটা 'অ্যানালজি' নিয়ে বিচার করতে পারি!



চিত্র—5·40 যৌনতা/অশ্লীলতা ও কালের ক্রম।

আজকের সমাজে অনেক দেশেই সমাজবিরোধী, স্বেচ্ছাচারী, মুনাফাখোর, কালোবাজারী, মজুতদার প্রভৃতি ক্ষমতাশালী মানুষেরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে চলে। রাজশক্তি হয় ভ্রূক্ষেপ করে না, অথবা গোপনে মদৎ যোগায়। কিন্তু যেই রাজশক্তির পরিবর্তন হয়—রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক, অথবা ভোটবাক্সের নির্দেশেই হোক, অমনি দেখা যায় —নূতন শাসক ওদের ধরপাকড় শুরু করে দেন। নতুন নেতা 'আমদরবারে' জনগণের অভাব-অভিযোগ শুনতে বসেন। সাধারণ মানুষ নবীন শাসকের জয়গানে মুখর হয়ে উঠি : যুগ যুগ জিও! তার-পর? তারপর দিন যায়, নবীন শাসক শাশ্বত-শোষকের ভূমিকায় ফিরে আসেন ; কারারুদ্ধ কালো-বাজারীরা একে একে কবে যে মুক্তি পেল সে-কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। দেখা যায়, ঐসব সমাজ-বিরোধী মানুষগুলোর প্রভাবপ্রতিপত্তির নিম্নমুখী গ্রাফ আবার ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে! অর্থাৎ শাসক সর্বদেশে সর্বকালেই জানে—ঐসব সমাজ-বিরোধী-দের প্রতি সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ঘৃণা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং শাসক একথাও জানে যে, ঐ সব সমাজবিরোধীরাই রাজশক্তির অনিবার্য স্তম্ভ! তাই সাময়িক দমনের পর আবার তাদের হাতেই ক্ষমতা তুলে দিতে হয়। আমাদের গ্রাফে ঐ 'অ্যানালজি'টা আরোপ করে আমরা কি এই সিদ্ধান্তে আসব যে, অশ্লীলতার প্রতি সাধারণ মানুষের সায় কোন যুগেই ছিল না, থাকে না, কিন্তু বিলাস-ব্যসনে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত রাজশক্তির আনুকূল্যে ওরা বারে বারে ফিরে এসেছে, তাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে?

3· দেখছি, কলিঙ্গরাজ্যে যখনই শিব-মন্দিরের পরিবর্তে শাক্ত-দেউল গড়ে উঠেছে—অর্থাৎ রেখ-দেউলের পরিবর্তে খাখর-দেউল গাঁথা হয়েছে, তখনই তথাকথিত অশ্লীলতার মান ঊর্ধ্বগামী। বৈতাল, গৌরী, খিচিঙ—বার বার তিনবার আমরা এটি লক্ষ্য করেছি—তিনটিকেই কাকতালীয় বলি কি করে? এর হেতু কি এই : মৈথুনকে ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রহণ করা হয়েছিল তান্ত্রিক বামাচারের ছত্রচ্ছায়ায়? ক্রমে তা কি শৈব, বৈষ্ণব, আউল-বাউল সম্প্রদায়ে সংক্রামিত হয়?

4· সম্ভবত যৌথ-যৌনাচারের পরিকল্পনা কলি-ঙ্গের নিজস্ব নয়। ভুবনেশ্বরের মাত্র নয়টি মন্দিরের তথ্য আমি এখানে সংকলিত করেছি। কিন্তু বাদ-বাকি দেউলগুলি—যা আজও টিকে আছে, আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু একটিও প্রকটভাবে-দৃশ্য যৌথ-যৌনাচার মূর্তি উদ্ধার করতে পারিনি। আমার ধারণা এটির মূল উৎস—খাজুরাহো। তাই সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যমণ্ডিত ভুবনেশ্বরে যৌথ-যৌনাচার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, খাজুরাহোতে ঐ জাতীয় মূর্তি মাত্র একশত বৎসরের ভিতরে যথেষ্টভাবে উৎকীর্ণ এবং মাত্র দ্বাদশ বৎসরে নির্মিত খাজুরাহোর-অনুজ কোণার্কের অর্ধভগ্ন মন্দিরে অন্ততঃ অর্ধশত যৌথ-যৌনাচার তথা বিকৃতকামের মিথুন দেখা যায়। সম্পূর্ণ মন্দিরে কত ছিল তা অনুমান-নির্ভর। □

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আদি হিন্দুযুগ

[ষষ্ঠ—অষ্টম শতাব্দী]

কলিঙ্গরাজ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব যে অতি প্রাচীনকাল থেকে ফল্গুধারায় প্রভাবিত ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। ব্রহ্মদত্তের দন্তপুরের কথা পূর্বেই বলেছি, বিনয়পিটকে দেখছি, বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁর কাছে যে ক'জন বণিক দেখা করতে এসেছিলেন—সেই উরুবিল্ব গ্রামে—তাঁরা উক্কলের লোক। পণ্ডিতেরা বলেছেন 'উক্কল' হচ্ছে উৎকলই। সুতরাং আদি যুগ থেকেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে কলিঙ্গের সম্পর্ক রয়ে গেছে। মৌর্যোত্তর যুগেও আর্যদেব, নাগার্জুন, দিঙনাগ প্রভৃতি বৌদ্ধ অর্হতেরা দ্বিতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কলিঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে গেছেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈনিক পরিব্রাজক তাঁর 'উ-টু' বা ওড্র দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, সে দেশে শতাধিক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম তিনি দেখেছিলেন ; এবং আরও বলছেন ওড্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল 'পুশী-পো-খিলি' মহাবিহার। কটক জেলায় এই পুষ্পগিরি মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুতঃ কটকে 'আসিয়া' পর্বতমালায় ললিতগিরি, উদয়গিরি এবং রত্নগিরি বিহার বৌদ্ধধর্মের সেকালীন এক-একটি প্রধান ঘাঁটি ছিল এটা বোঝা যায়। আরও পরবর্তীযুগে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এই মহাবিহারে এল এক নূতন ভাব-তরঙ্গ। এযাবৎকাল ঐ সব সঙ্ঘারামে ছিল মহাযানী বৌদ্ধদের আধিপত্য। এইবার এল বজ্রযানীদের যুগ। মহাযানীদের মতে আদি বুদ্ধের উপর আরোপিত হয়েছিল শূন্যতা গুণ, এখন আদি বুদ্ধের পরিবর্তে এলেন বজ্রসত্ত্ব এবং তাঁর গুণ হল বজ্র। এ তো তত্ত্বের কথা—কিন্তু সেই 'বজ্র' লাভের জন্য যে সব প্রক্রিয়া শুরু হল তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের তান্ত্রিক আচারের মতো। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মদ্যপান শুরু করলেন, মাংস ভক্ষণে আপত্তি নাই, এমনকি নরহত্যা আর বামাচার শুরু হয়ে গেল বজ্রযানীদের মধ্যে। তান্ত্রিক অর্হৎ নাগার্জুন এলেন পুষ্পগিরি বিহারে, আরও পরে এলেন অনঙ্গ বজ্র এবং ইন্দ্রভূতি। নালন্দা থেকে এলেন প্রজ্ঞা—যিনি চীন সম্রাটের কাছে অবতংশতকের শেষ অধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মমহামাত্যদের আদেশে।

মোট কথা উপকূলভাগের অনেক স্থানে বৌদ্ধদের ঘাঁটি টিকেছিল দীর্ঘকাল। বালেশ্বর জেলার অযোধ্যা, কোপারি, সোলানপুর, ফুলবনীতে বাউধ ; এবং কটক জেলার বাণেশ্বরনশী, ললিতগিরি, উদয়গিরি এবং রত্নগিরিতে ছিল বৌদ্ধধর্মের ঘাঁটি। ভুবনেশ্বর যখন শৈব মন্দিরে প্রায় ভরে গেছে তখনও এই কয়টি বিহারের অন্তরালে বজ্রযানী বৌদ্ধরা তাঁদের তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এবার দেখা যাক জৈন ও বৌদ্ধধর্মকে পর্যুদস্ত করে কলিঙ্গে কেমন করে শৈবপূজারীরা প্রাধান্য বিস্তার করল। আগেই বলেছি, গুপ্তযুগের প্রভাব পড়েছিল কলিঙ্গতে সমুদ্রগুপ্তের আমল থেকে। তদানীন্তন কলিঙ্গের সামন্তরাজা দ্বিতীয় মাধবরাজ একটি তাম্রশাসনে গুপ্তাব্দ দিয়ে সময়কাল চিহ্নিত করেছিলেন। গুপ্ত-সংবৎ 300-তে (অর্থাৎ 619 খ্রীষ্টাব্দে) দেখছি, দ্বিতীয় মাধবরাজ নিজেকে মহারাজ শশাঙ্কের করদ-রাজ বলে বর্ণনা করছেন। শশাঙ্ক ছিলেন শৈব-উপাসক, গৌড়ের প্রখ্যাত সম্রাট, যাঁর সঙ্গে হর্ষবর্ধনের ইতিহাস-বিখ্যাত সংগ্রাম হয়েছিল। প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেমন একই সঙ্গে ভার-

আকাশে তিন সূর্যের উদয় হয়েছিল—মগধের পুষ্য-মিত্র, কলিঙ্গের খারবেল এবং অন্ধ্র সাতবাহনের শ্রীসতকর্ণী—এই সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদেও তেমনি একই সঙ্গে কয়েকজন অত্যন্ত পরাক্রমশালী সম্রাটের অভ্যুত্থান হয়েছিল ভারত মহা-উপদ্বীপে। কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধন, গৌড়ের শশাঙ্ক, প্রাক্-জ্যোতিষপুরের ভাস্করবর্মা এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। চারজন সম্রাটের মধ্যে একমাত্র শশাঙ্কের প্রতিই ইতিহাস সুবিচার করেনি। তার একটি বিশেষ কারণ আছে। এ-যুগের ইতিহাস বস্তুতঃ চৈনিক পরিচাজক হিউ এন-ৎসাঙের বিবরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ; এবং যেহেতু শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধদের বিপক্ষ-শিবিরে, তাই তাঁকে প্রায় নর-রাক্ষসের রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু শশাঙ্ক সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণ-শাস্ত্র অন্য কথা বলে। একাম্র-পুরাণ মতে শশাঙ্কই ভুবনেশ্বরে ত্রিভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা—কলিঙ্গে শিবপূজার প্রথম ভগীরথ। একাম্র-পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শিব এবং ব্রহ্মার একটি কথোপকথন লক্ষণীয়। পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলেছেন যে, মর্ত্যে শিবপূজার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিভুবনেশ্বরে একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে এক অদৃষ্টপূর্ব মন্দির নির্মাণে ইচ্ছুক। প্রত্যুত্তরে মহাদেব বলছেন, "হে পিতামহ বিভুতেশ্বর, এ কাজ আপনার নয়। কলিযুগের এক-পাদ অতিক্রান্ত হলে আমার মস্তকস্থিত শশাঙ্ক ভূতলে অবতীর্ণ হবেন এবং ত্রিভুবনেশ্বরে আমার জন্য একটি অক্ষয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।"

স্বর্ণাদি-মহোদয়, একাম্র-চন্দ্রিকা এবং কপিল-সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে যে, ত্রিভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মূর্তির উপর একটি অপূর্ব মন্দির গঠন করাই হচ্ছে সম্রাট শশাঙ্কের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

এমন জোরের সঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে একথা লেখা হয়েছে যে, সম্রাট শশাঙ্ক ভুবনেশ্বরে একটি অপূর্ব শিব মন্দির নির্মাণ করেন যে, সেটা অবিশ্বাস করার উপায় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে সেটি তাহলে কোন মন্দির ?

ভুবনেশ্বরে এখনও যে প্রাচীন শিবমন্দিরগুলি খাড়া আছে তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পাশাপাশি তিনটি মন্দির—ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নে-শ্বর। তাদের আদিমরূপ বোঝা দুষ্কর, কোনক্রমে টিকে আছে তারা। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন, সে তিনটি মন্দিরের গঠনকাল 575 থেকে 600 খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সম্রাট শশাঙ্কের শাসনকালের কিছু পূর্বে। ফলে এ তিনটি মন্দির নয়। পরবর্তী মন্দিরগুচ্ছ হচ্ছে পরশুরামেশ্বর এবং তার সময়কালীন কয়েকটি মন্দির। গঠনসৌকর্যে পরশুরামেশ্বর একটি অপূর্ব মন্দির এবং এর সময়কাল 650 খ্রীষ্টাব্দ ; কিন্তু নানান কারণে এটি শশাঙ্কদেব-নির্মিত মন্দির বলে মনে করতে পারছি না। প্রথমতঃ, সমস্ত পুরাণেই দেখছি বলা হয়েছে শশাঙ্কদেবের প্রতিষ্ঠিত মূর্তি ত্রিভুবনেশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ, একাম্র-পুরাণে মহাদেব বলছেন যে, শশাঙ্কদেব শিবলিঙ্গ তৈরী করাননি। একটি আম্রবৃক্ষের পাদমূলে তাঁর 'স্বয়ম্ভূ-মূর্তির' উপর শশাঙ্কদেব 'ত্রিভুবনেশ্বরের' মন্দিরটি গঠন করেন। এর একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হতে পারে যে, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মূর্তির উপরেই গৌড়-সম্রাট শশাঙ্ক একটি মন্দির নির্মাণ করান। লিঙ্গরাজ স্বয়ম্ভূ-মূর্তি, অনাদিকাল থেকেই সেখানে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত—কাশীর কেদারেশ্বরের মত অথবা কেদার-নাথ তীর্থের লিঙ্গের মত।

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, পুরাতত্ত্ববিদদের মতে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গঠনকাল অনেক পরবর্তী যুগের—শশাঙ্কদেবের অন্ততঃ চারশ বছর পরে। কিন্তু আমরা কি মনে করতে পারি না যে, শশাঙ্কদেব-নির্মিত মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হওয়ায় পরবর্তী কেশরীবংশীয় কলিঙ্গরাজ সেই একই স্থানে এই দ্বিতীয় মন্দির গঠন করেন ? একই বিগ্রহের উপর একাধিক মন্দির নির্মাণের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

পুরাণমতে গৌড়েশ্বর ভুবনেশ্বরে শিবপূজার ভগীরথ বলে বর্ণিত হলেও আমরা দেখেছি তাঁর সময়কালের বহু পূর্ব হতেই ভুবনেশ্বরে শিব-মন্দিরের নির্মাণকার্য চলেছে। বস্তুতঃপক্ষে, কলিঙ্গ রাজ্যে শৈব উপাসনার ভগীরথ শশাঙ্কদেব নন—লাকুলীশ। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীর ধর্ম প্রচারক। পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা তিনি। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংঘাত, জৈন ধর্মের সঙ্গেও। পাশুপততন্ত্রে, একাম্র-পুরাণে এবং কপিল-সংহিতায় তাঁর কীর্তি-কাহিনী বর্ণিত। লাকুলীশের অষ্টাদশ প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন—নকুলীশ, কৌশিক, গার্গ্য, মৈত্রেয়, ঈশাণ ইত্যাদি। কলিঙ্গ থেকে জৈন-বৌদ্ধধর্ম বিতাড়নে এবং পাশুপত-শৈব উপাসনার প্রবর্তনে লাকুলীশের অবদান অসামান্য।

শৈবদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যে দীর্ঘকাল সংঘাত চলেছিল তার নানান পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভাস্করেশ্বরের লিঙ্গের কথা ইতিপূর্বেই বলেছি ;—বৈতাল মন্দিরের যূপ-শৈলে একটি বুদ্ধমূর্তির

ব্যঞ্জনা পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। সমস্ত মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি নেই—আছে একমাত্র যূপ-শৈলে, বলি-স্থানে। একাম্র-পুরাণের পঞ্চবিংশতি থেকে দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত দেবদানব যুদ্ধের বিবরণটিও লক্ষ্য করার মত। পুরাণকার বলছেন, গন্ধাবতী নদী (ভুবনেশ্বরে অবস্থিত নদীটির নাম গাঙ্গোয়া) তীরে দেবতারা শিবপূজার নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করার সময় দৈত্য হিরণ্যাক্ষ সসৈন্য এসে যজ্ঞনাশ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরাভূত হয়ে পালিয়ে যান এবং মহাদেবের শরণাপন্ন হন। অতঃপর মহাদেব যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যাক্ষকে সসৈন্য পরাজিত করেন—দৈত্য-সেনাপতি কালনেমী নিহত হন এবং হিরণ্যাক্ষ পার্বত্যগুহায় আশ্রয় নিয়ে তপস্যার মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

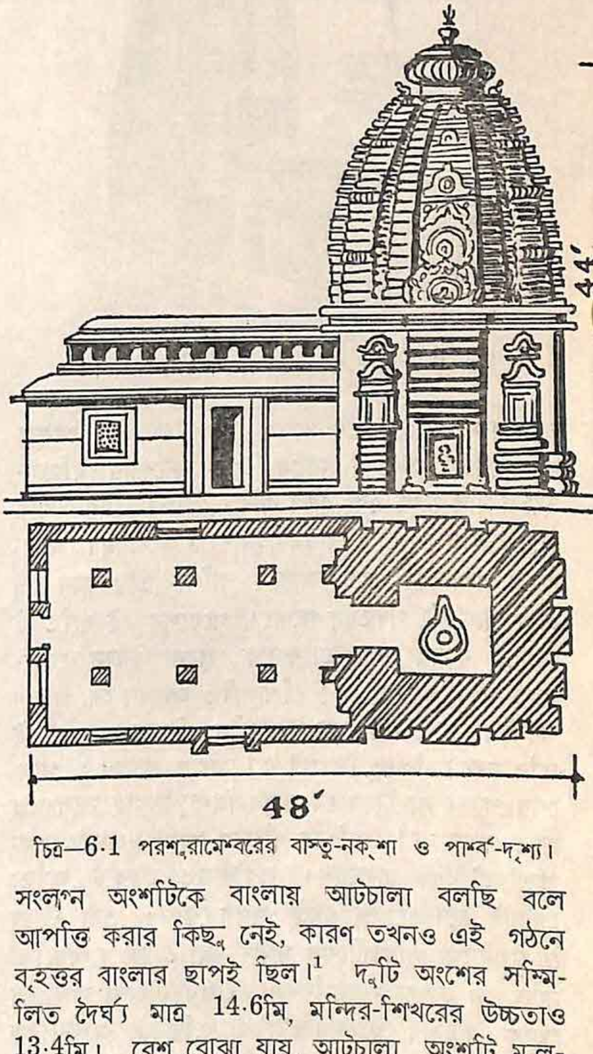
এ নিছকই গল্প কথা ; কিন্তু গন্ধাবতী নদীর অবস্থিতি—পার্বত্যগুহায় তপস্যার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। আরও বলি, খণ্ডগিরির অনতিদূরে গাঙ্গোয়া নদীর ধারে পাশাপাশি দুটি প্রাচীন গ্রাম আছে আজও। তাদের নাম 'যগমারা' এবং 'যগসারা'।

মোট কথা ভুবনেশ্বরে শৈব মন্দির নির্মাণের কাজ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল। কেমন করে শিব পূজার দেশে বিষ্ণু এলেন সে কথা আপাতত থাক। ইতিহাস আলোচনাও শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয় পর্যন্ত বলে আপাতত আমরা থামব। এবার বরং ভুবনেশ্বরে প্রথম যুগের যে শিবমন্দিরগুলি আজও টিকে আছে সেগুলি দেখতে শুরু করা যাক।

আগেই বলেছি, ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির যা আজও টিকে আছে তা হল ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর। দর্শনীয় সেখানে যা কিছু আছে তা পুরাতত্ত্ববিদদের জন্য। আমরা বরং আমাদের মন্দির দর্শন শুরু করব পরশুরামেশ্বর মন্দির থেকে।

পরশুরামেশ্বর :

আকারে মন্দিরটি খুবই ছোট, কিন্তু কলিঙ্গ স্থাপত্যের ইতিহাসে এটিই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—কারণ, এই পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ভিতরেই আমাদের সন্ধান করতে হবে সেই বীজটি যেটি উত্তরকালে লিঙ্গরাজ-কোণার্কের অপূর্ব মহীরূহে পরিণত হয়েছিল। মন্দিরের দুটি অংশ—একটি মূলমন্দির, যার ভিতরে গর্ভগৃহে আছেন বিগ্রহ, যার চূড়ায় মন্দির শিখর ; এবং দ্বিতীয়টি তার সামনে লম্বাটে একটি আটচালা। সামান্য খাঁজকাটা থাকলেও মূল মন্দিরটি মোটামুটি চৌকা—বর্গক্ষেত্র। সামনের আটচালা অংশ লম্বাটে—আয়তক্ষেত্র ; তার ভিতরে দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভের উপরের ছাদটি চারচালা এবং দেওয়ালের উপরে চারচালা। আমরা আগেই জেনেছি, উড়িষ্যা-স্থাপত্য অনুযায়ী এই লম্বাটে ঘরটির নাম 'জগমোহন' ; কিন্তু সে প্রসঙ্গে এখনও আসিনি আমরা—ঐ সম্মুখস্থ ও

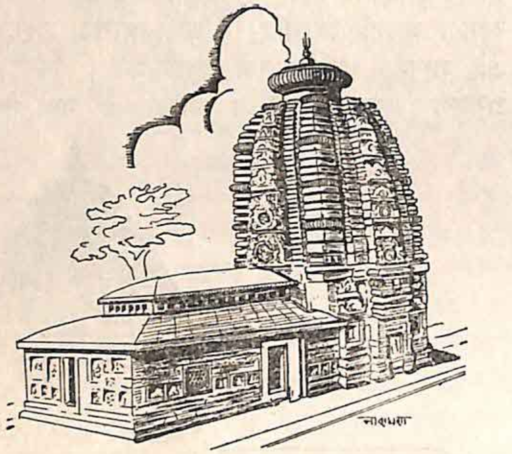


চিত্র—6·1 পরশুরামেশ্বরের বাস্তু-নক্‌শা ও পার্শ্ব-দৃশ্য।

সংলগ্ন অংশটিকে বাংলায় আটচালা বলছি বলে আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ তখনও এই গঠনে বৃহত্তর বাংলার ছাপই ছিল।[1] দুটি অংশের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য মাত্র 14·6মি, মন্দির-শিখরের উচ্চতাও 13·4মি। বেশ বোঝা যায়, আটচালা অংশটি মূলমন্দিরের পরবর্তী সংযোজন, প্রায় একশ বছর পরে তৈরী।

চিত্র—6·1-এ পরশুরামেশ্বর মন্দিরের বাস্তুনক্‌শা (প্ল্যান) এবং চিত্র—6·2-এ দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে দেখা একটি স্কেচ-চিত্র দেওয়া গেল। মূলমন্দিরের তিন দিকের কুলুঙ্গিতে তিনজন পার্শ্বদেবতার মূর্তি ছিল—দক্ষিণে গণেশ, পূর্বে কার্ত্তি-

কেয় এখনও আছেন ; উত্তরদিকে ছিলেন মহিষমর্দিনী, তিনি অপসৃত। চতুর্ভুজ গণেশ বসে আছেন সিংহাসনে—তাঁর শুণ্ডটি হস্তস্থিত লড্ডুকথালিকার দিকে। উপরে একটি চৈত্যগবাক্ষ, তাতে



চিত্র—6·2 পরশুরামেশ্বর—দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে।

নটরাজ-মূর্তি। পূর্বদিকের কুলুঙ্গিতে দ্বিভুজ কার্তিকেয়, পদতলে ময়ূর। কার্তিকেয়র দক্ষিণহস্তে মাতুলুঙ্গ এবং বামে শক্তি। কার্তিকেয়র উপরে লিণ্টেলে হর-পার্বতীর বিবাহদৃশ্যটি মনোরম। মাঝখানে পদ্মাসনে বসে আছেন অগ্নি—তাঁর বামে হর এবং পার্বতী, পদতলে গণেশ। গণেশের এই মূর্তিটি খোদাই করার জন্য ভাস্করকে 'অ্যানাক্রনিজম্'-দোষদুষ্ট মনে করবেন না! শিল্পীও জানেন যে, গণেশ 'কানীনপুত্র' নন—হর-পার্বতীর বিবাহের পরেই তাঁর জন্ম। কিন্তু শিল্পী কী করতে পারেন? গণেশের পুজা না দিয়ে যে কোন হিন্দু-বিবাহ সুসম্পন্ন হতে পারে না! অগ্নির দক্ষিণে স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা পূর্ণঘটে জল ঢালছেন। সর্বসমেত তেরটি মূর্তি খোদাই করা হয়েছে একই পাথর কেটে। তার উপর চৈত্যগবাক্ষে লাকুলীশের মূর্তি—যা নাকি বুদ্ধমূর্তি বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর দিকের কুলুঙ্গি থেকে বৃহত্তর মহিষমর্দিনীর মূর্তিটি অপসারিত হয়েছে ; কিন্তু উপরে ছোট কুলুঙ্গিতে অপর একটি ক্ষুদ্র মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে।

এবার সামনের আটচালা অংশের মূর্তিগুলি দেখা যাক। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে যদি আমরা জগমোহনটিকে প্রদক্ষিণ করি, তবে পর পর যে মূর্তিগুলি দেখা যাবে তা এইভাবে সাজানো।

(ক) প্রথমেই চতুর্ভুজ বিষ্ণুর একটি দণ্ডায়মান আভঙ্গমূর্তি (চিত্র—6·3)। শাস্ত্র নির্দেশানুসারে যদিও বিষ্ণুমূর্তি সমভঙ্গ হবার কথা তবু শিল্পী এটিকে আভঙ্গ রূপে কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, পার্শ্বদেবদেবীর মস্তক মূর্তির দিকে বাঁক নেয়নি, নিয়েছে বিপরীত দিকে। কিন্তু শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের কথামত কই আমরা তো উপলব্ধি করছি না "দুই পার্শ্ব-দেবতা এই দুই বিপরীত ত্রিভঙ্গঠামে রচনা না করিলে সম্পূর্ণ মূর্তির সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটে।" তার কারণ আছে। শিল্পাচার্য নিজেই তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। বলেছেন, "ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া কেহ যেমন ধার্মিক হয় না, তেমনি শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ করিয়া বা তাহার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রহিয়া কেহ শিল্পী হয় না। সে কী বিষম ভ্রান্ত যে মনে করে মাপিয়া-জুখিয়া শাস্ত্রসম্মত মূর্তি প্রস্তুত করিলেই শিল্পজগতের সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শিল্পলোকের আনন্দ বাজারে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়।" শাস্ত্রকার স্পষ্টই বলে গেছেন—'সেব্যসেবকভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্', যার ব্যাখ্যায় শিল্পাচার্য বলেছেন—"যখন পূজার জন্য প্রতিমা গঠন করিবে কেবল তখন শাস্ত্রের মত মানিয়া চলিবে, অন্য প্রকার মূর্তি গঠনকালে তোমার যথা অভিরুচি গঠন করিতে পার।"[2]



চিত্র—6·3 চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি (পরশুরামেশ্বর)।

তা তো বুঝলাম। তবুও যে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। শিল্পীর এ ধরনের অভিরুচি হল কেন? শাস্ত্রনির্দেশের বিপরীত পথে তিনি কেন গেলেন? আসুন বিচার করে দেখি।

প্রথমতঃ, পার্শ্বদেবতা দুটি আকারে সমান নয়—

পুরুষ মূর্তিটি কিঞ্চিৎ স্থূলকায় হওয়ায় দক্ষিণ-দিকের পাল্লা ভারী হয়ে যেত। পার্শ্বদেবতা দুটি যদি সমান দৈর্ঘ্যের এবং সমান আকারের হত তাহলেই সমভঙ্গের সমতাছন্দ (symmetry) ঠিকভাবে ফুটে উঠত। যেহেতু তা সম্ভবপর নয়, তাই শিল্পী সমভঙ্গের পরিবর্তে মূল মূর্তিটিতে আভঙ্গঠাম আরোপ করেছেন যাতে সমতা রক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দুই পার্শ্বদেবতার ভঙ্গিমায় যেন সেই ব্যঞ্জনাটি ফুটে উঠেছে যেটি আমরা দেখতে পাই কুতুব-মিনার দর্শনার্থীর ভঙ্গিতে। কুতুব-মিনারের নিচে দাঁড়িয়ে তার উচ্চতা অনুধাবন করতে হলে আমাদের মস্তক কুতুবের বিপরীত দিকেই বাঁকাতে হয়। এখানেও দুই পার্শ্বদেবতা যেন মধ্যস্থিত বিষ্ণুমূর্তির মহিমা অনুধাবন করতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে চাইছে। এইভাবে ফুটে উঠেছে বলেই সামগ্রিকভাবে মূর্তিটি অপূর্ব রূপ নিয়েছে। সৌন্দর্যের হানি তো হয়ই নি বরং সার্থক হয়ে উঠেছে ভাবব্যঞ্জনা!

(খ) বিষ্ণুমূর্তির দক্ষিণে বিশ্রম্ভালাপরত হর-পার্বতীর একটি মূর্তি। শিবের হাতে ত্রিশূল, দক্ষিণ কর্ণমূলে সর্পকুণ্ডল ও ধুতুরা। প্রস্তরাসনের একদিকে বৃষ অপরদিকে সিংহ, মাঝখানে গণেশ। লক্ষণীয় শিবের মাথা পার্বতীর বিপরীতে বাঁকানো। শিল্পাচার্যের সূত্র অনুযায়ী ধরে নিতে হবে শিবের মনে কিছু বিরাগ জন্মেছে। আমরা কল্পনা করতে পারি, পটভূমিকা আমাদের বাংলা দেশের আগমনী গানের—অর্থাৎ মা দুর্গা বুঝি বাপের বাড়ি যাবার বায়না নিয়ে দরবার করতে এসেছেন ভোলানাথের কাছে ; আর তাই মহাদেবের মেজাজ খারাপ! এবং সেইজন্যই বোধকরি দুর্গার সোহাগ উথলে উঠেছে—একটি কনুই তিনি রেখেছেন আশুতোষের কাঁধে! দুর্গার দুটি হাতের কুণ্ঠাজড়িত আঙুল কীভাবে জড়াজড়ি করে আছে তাও লক্ষণীয়। মায়ের অঙ্গুলিতে 'বাপের-বাড়ি-যাবার-বায়না'-র একটি দুর্লভ ব্যঞ্জনা (চিত্র—6·4)!

(গ) পরের প্যানেলটিতে অর্ধনারীশ্বরের একটি দুষ্প্রাপ্য ভঙ্গিমা। অষ্টভুজ এই অর্ধনারীশ্বর অতি-ভঙ্গ মূর্ছনায় নৃত্যরত। এই ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গিমায় অষ্টভুজ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আর কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

তিনটি মূর্তির পরে প্রবেশদ্বারের ছেদ। দ্বার পার হয়ে আবার তিনটি প্যানেলে তিনটি মূর্তি।

(ঘ) প্রথমেই দেবরাজ ইন্দ্রের একটি সমভঙ্গ উপবিষ্ট-মূর্তি—ক্রোড়ের উপর বজ্রটিকে দুই হাতে ধরে আছেন। ঐরাবৎ কিন্তু অনুপস্থিত। ইন্দ্র হচ্ছেন অষ্টদিকপালের অন্যতম—সুতরাং এরপর অপর সাতটি দিক্‌পতিকে আমরা দেখবার আশা করতে পারি।

(ঙ) ইন্দ্রের পরে মহিষবাহন যম, দণ্ডধারী—দক্ষিণ দিকপতি।

(চ) যমের পরে আসন পেয়েছেন বরুণ, তাঁর বাম হস্তে পাশ।

এরপর জাফরিকাটা একটি গবাক্ষ, সেটি অতিক্রম করলে আবার তিনটি মূর্তি পাওয়া যাবে—(ছ) বায়ু, (জ) কুবের এবং (ঝ) তৃতীয় মূর্তিটি অপসৃত—সম্ভবতঃ ছিল অগ্নির। ঈশান ও নৈর্ঋতকে আমি খুঁজে পাইনি।



চিত্র—6·4 হরপার্বতী (পরশুরামেশ্বর)।

যেহেতু মন্দিরের চারপাশের দৃশ্য ছবিতে এঁকে দেখান যায়নি তাই জগমোহনের পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বের মূর্তিগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে প্রধান মূর্তিগুলির নামোল্লেখ মাত্র করা গেল।—ঈশান, নৈর্ঋত, চামুণ্ডা, বরাহী, ইন্দ্রানী, শিবানী, ব্রহ্মাণী, কুমারী ইত্যাদি।

জগমোহনের পশ্চিমপ্রান্তে, মূল প্রবেশদ্বারের উপরে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। গজলক্ষ্মীর মূর্তির পরিকল্পনা অতি প্রাচীন। সাঁচী ভারহুতের প্রাচীনতম অংশে বৌদ্ধশিল্পীরা এ মূর্তি খোদাই করেছেন। একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে যে—যে যুগে বৌদ্ধশিল্পীরা গজলক্ষ্মীর মূর্তি প্রথম খোদাই

করেছিলেন তখনও মহাযান ধর্মমত প্রসার লাভ করেনি—বুদ্ধমূর্তি তখনও তৈরি হয়নি, বৌদ্ধ দেব-দেবী—অবলোকিতেশ্বর, তারা, জম্ভল, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদি কোনও মূর্তির পরিকল্পনা তখনও হয়নি। ফলে গজলক্ষ্মীর পরিকল্পনা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে বৈকি। এ মূর্তি বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দেব-দেউলে সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। লক্ষ্মী পদ্মাসনে বসে আছেন এবং দু-দিক থেকে দুটি হস্তী শুঁড়ে করে জল ঢালছে। গজলক্ষ্মী মূর্তির দু-দিকে দুটি লম্বাটে প্যানেল। দক্ষিণে (গজলক্ষ্মীর দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরদিকে) কুনকী হাতীর সাহায্যে জংলী হাতী ধরার একটি দৃশ্য, বামে শিবপূজার একটি প্যানেল। নিচে বাদ্যযন্ত্র সহকারে কয়েকটি মূর্তি। এই নৃত্যরত মূর্তিগুলির সাবলীল ভঙ্গিমা, তাদের পোষাক, শিরোভূষণ, অলঙ্কার খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস। উচ্চতা অনুপাতে মূর্তি-গুলি সম্ভবতঃ কিছু স্থূলকায়, কিন্তু ভারতীয় মূর্তির যে ব্যঞ্জনা তার আদিমরূপ এখানে সুন্দর-ভাবে ফুটে উঠেছে। বহু শতাব্দীর অবক্ষয়ে নৃত্য-রতা বালি-পাথরের মূর্তিগুলির নাক-মুখ-চোখ ক্ষয়ে গেছে, ভাংগা অংশটুকু কল্পনায় পূরণ করে চিত্র—6·5-তে এ'কে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এ মন্দির সম্বন্ধে আর একটি কথা বলব। জগ-মোহন থেকে মূল মন্দিরে প্রবেশ পথের যে দ্বার তার উপর আটটি গ্রহের (নয়টি নয়, কেতু অনুপস্থিত) মূর্তি খোদাই করা। সেখানে একটি শিলালেখ আছে যা থেকে মন্দিরটির নির্মাণকাল আন্দাজ করা হয়েছে। সেই শিলালেখে মন্দিরটির নাম পাওয়া গেছে পারাসেশ্বর। প্রথম যুগের পণ্ডিতেরা মনে করে-ছিলেন ওটা বর্ণাশুদ্ধি—আসলে মন্দিরটির নাম পরশুরামেশ্বর। পরে অবশ্য অনেকে মনে করেন নামটি সম্ভবতঃ ছিল 'পরাসরেশ্বর' ; কারণ 'পরা-শর' ছিলেন অন্যতম পাশুপত-আচার্য, লাকুলীশের শিষ্য। কিন্তু মন্দিরের নামটি পরশুরামেশ্বরই রয়ে গেছে।

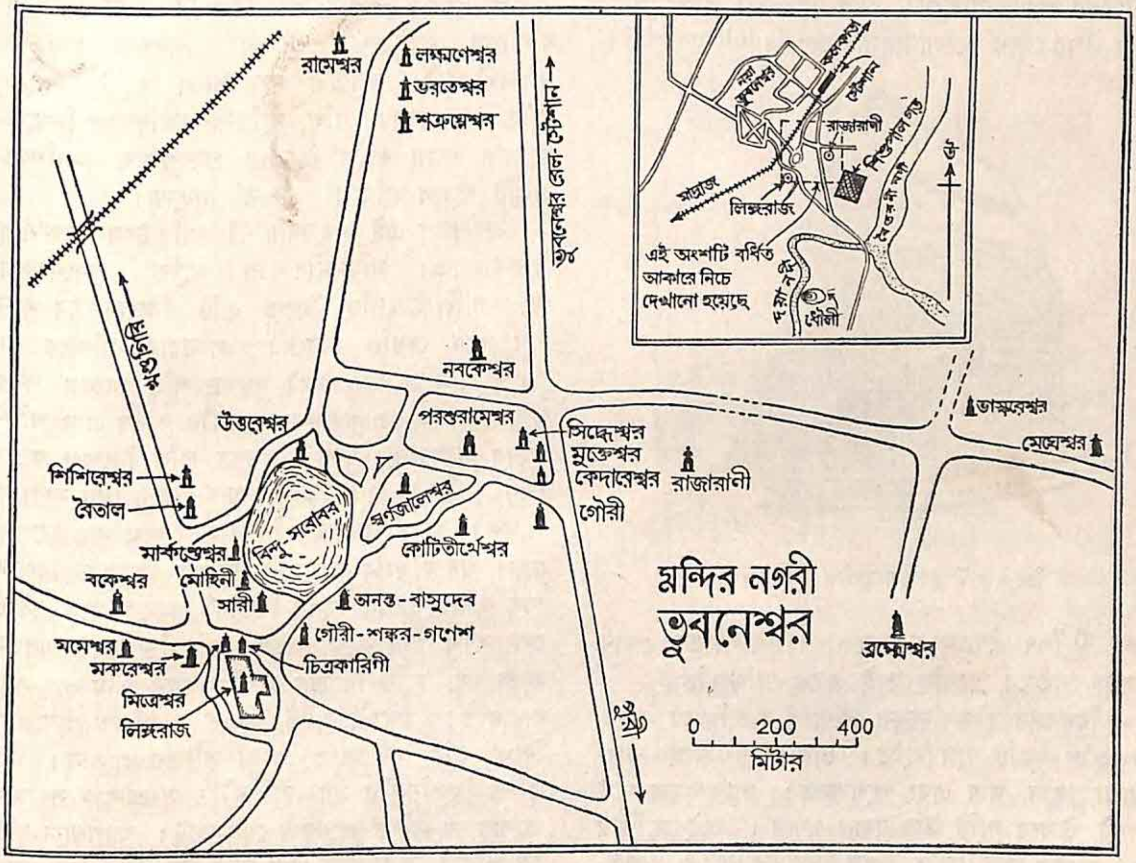


চিত্র—6·5 গীতবাদ্যরত নর্তকদল (পরশুরামেশ্বর)।

প্রথম যুগের তিনটি মন্দিরের কথা বলেছি, পরশুরামেশ্বরের সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করা গেল। তারপরে সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীতেই

আরও কয়েকটি মন্দির ভুবনেশ্বরে নির্মিত হয়েছিল। যেমন, স্বর্ণজালেশ্বর, উত্তরেশ্বর, পশ্চিমেশ্বর, মোহিনী, গৌরী-শঙ্কর-গণেশ ইত্যাদি। এগুলি অধিকাংশই আকারে ছোট এবং ভগ্নপ্রায়। আমরা এগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি না—যাঁদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে তাঁরা এ মন্দির-

নির্মিত হয়েছে। ফলে এইটিই ভুবনেশ্বরে প্রথম কাখর-দেউল। এছাড়া, এই মন্দিরেই ইতিপূর্বে দৃষ্ট অপ্রগল্‌ভ যুগল-মূর্তিকে মৈথুনরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। এ-থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বন্ধকাম মূর্তিগুলি আমদানী হল তান্ত্রিকপ্রভাবে—যে তান্ত্রিকধর্মে পঞ্চ 'ম'-কারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে



চিত্র—6·6 ভুবনেশবরের প্রধান মন্দিরগুলির অবস্থান-সূচক ভূমি-নক্‌শা।

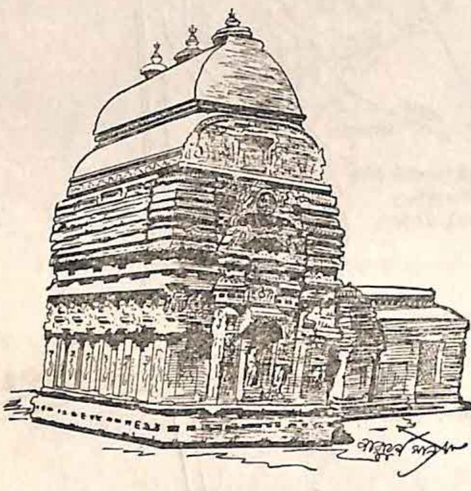
গুলিও ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। প্রাচীন মন্দিরগুলির অবস্থান সম্বন্ধে স্থানীয় লোক এবং রিক্সাওয়ালারা প্রায়ই খবর রাখে না ; তাই চিত্র—6·6-তে ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির অবস্থান দেখান হয়েছে। আমরা এরপর বিন্দুসরোবরের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বৈতাল দেউলটি দেখতে যাব।

বৈতাল-দেউল : বিন্দুসরোবরের পশ্চিমপাড়ে এই শাক্ত-মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য নানান কারণে স্বীকৃত। প্রথমতঃ, এইটিই ভুবনেশ্বরে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শাক্ত-দেউল। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র শিবমন্দিরই

'মৈথুন' ধর্মাচাররূপে স্বীকৃত।

মন্দিরের বাস্তু-নক্‌শা ইংরাজী T-অক্ষরের মতো। T-এর শীর্ষদেশ দীর্ঘায়ত বিমান, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ; মাঝের অংশটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা জগমোহন। বিমান অংশের উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে তিনটি করে খাঁজ এবং পশ্চিমাংশে পাঁচটি খাঁজ, পূর্ব-অংশে তো জগমোহন। প্রতিটি খাঁজের মধ্যে কুলুঙ্গির মত স্থান আছে ; তাতে আছে মূর্তি—দেবমূর্তি এবং পার্থিব মূর্তি। প্রথমোক্তদের সনাক্ত করার জন্য প্রত্যেকটি দেবমূর্তিতেই মাথার পেছনে আছে জ্যোতিঃপ্রভা। বাড় অংশের পা-ভাগে পাঁচ-

কামের পরিবর্তে চারকাম। পাদ-কাণি-পাটা-বসন্ত। বন্ধন অনুপস্থিত। গন্ডী অংশে কিছুটা ভূমি ভাগ করা, উপরের অংশটা সম্ভবতঃ সবটাই পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে মেরামতি করা—আদিম কাঠামোর সরল অনুকরণ। জগমোহনের চারপ্রান্তে চারটি ছোট মন্দির—জগমোহনটির সঙ্গে পরশুরামেশ্বরের জগমোহনের যথেষ্ট সাদৃশ্য। সেই আটচালা পরিকল্পনা এবং উপর থেকে আলো আসার ফোকর (clearstory)।



চিত্র—6·7 বৈতাল দেউল (ভুবনেশ্বর)।

চিত্র—6·7-এ বৈতাল-দেউলকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে যেভাবে দেখেছি তাই এঁকে দেখিয়েছি।

বিমানের দক্ষিণদিকের কেন্দ্রস্থ কুলুঙ্গিতে আছে চতুর্ভুজ একটি দুর্গামূর্তি। চার হাতে আছে—জপমালা, শূল, খড়্গ এবং পূর্ণকুম্ভ। দু' পাশে দুই সখী, উপরে দুটি উড্ডীয়মান গন্ধর্ব। এই মূর্তির দু' পাশের কুলুঙ্গিতে আছে মিথুনমূর্তি ও অলসকন্যা। দুর্গামূর্তির উপরে চতুষ্কোণ একটি প্যানেলে হর-পার্বতীর যুগল-মূর্তি ; তার উপর বৌদ্ধ চৈত্য-গবাক্ষের অনুকরণ। তার কেন্দ্রে পাশুপত ধর্মের প্রবক্তা লাকুলীশের ধ্যানস্থ-মূর্তি, যার উপরে কীর্তি-মুখ।

বিমানের পশ্চিমে অর্থাৎ পিছনে যে পাঁচটি কুলুঙ্গি আছে তার কেন্দ্রস্থলে আছে একটি দ্বিভুজ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। পুরুষ-হস্তে জপমালা ও কমন্ডলু—স্ত্রী-হস্তে দর্পণ। আভঙ্গঠামে দন্ডায়মান এ-মূর্তিটি সুন্দর। অন্যান্য কুলুঙ্গিতে মিথুন-মূর্তি এবং অলসকন্যা।

বিমানের উত্তরদিকস্থ কেন্দ্রীয় অবস্থানে এ মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন—অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী। মূর্তির দু' পাশে দুটি মিথুন-মূর্তি। প্রসঙ্গতঃ বলি, মূর্তির বামদিকস্থ মিথুন-মূর্তির সঙ্গে কার্লে চৈত্যের প্রবেশপথে অবস্থিত একটি যুগল-মূর্তির[3] আশ্চর্য সাদৃশ্য।

অষ্টভুজা এই মহিষমর্দিনী অতিভঙ্গ মূর্ছনায় পরিকল্পিত। মহিষমর্দিনীর মূর্তি ভুবনেশ্বরে অনেকগুলি দেখেছি কিন্তু এটি বিশেষভাবে মনে দাগ কাটে একটি কারণে। লিঙ্গরাজ মন্দিরে বা অন্যত্র মনে হয়েছে দেবী সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মহিষাসুরকে বধ করছেন। দেবীর বীরত্ব এবং শক্তি-মত্তার প্রকাশেই শিল্পী সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে-ছেন ; কিন্তু এ মূর্তিটির ভাব-ব্যঞ্জনা যেন সম্পূর্ণ পৃথক। অতি অনায়াসে তিনি সম্মুখস্থ বাম হস্তের চাপে অসুর দমন করেছেন—দক্ষিণ হস্তধৃত ত্রিশূল যেন মহিষাসুরের কণ্ঠ বিদীর্ণ করতে নয়, সেটি যেন স্পর্শ মাত্র করে আছে—যেন ত্রিশূলের মাধ্যমে মৃত্যু নয়, মুক্তি দিচ্ছেন দেবী। যেন ভীম-ভল্ল নয়, যাদুদন্ড! মায়ের দৃষ্টি আনত, ভূপাতিত অসুরের দিকে—তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে, প্রসন্ন তৃপ্তির আভাস। সে তৃপ্তি বিজয়িনীর নয়—দুর্বিনীত সন্তানকে সৎপথে আনার যে তৃপ্তি অনেকটা যেন তাই। আপনারা যদি সে ভাবটি না দেখতে পান তবে দোষ মূল ভাস্করের নয়, অধম অনুকারকের।

জগমোহন অলঙ্করণবর্জিত, যদিও ভিতরে সপ্ত-মাতৃকা প্রভৃতি মূর্তি আছে।

বৈতাল-দেউলের উত্তরে ঠিক পাশেই শিশিরে-শ্বরের মন্দির। □

সপ্তম পরিচ্ছেদ

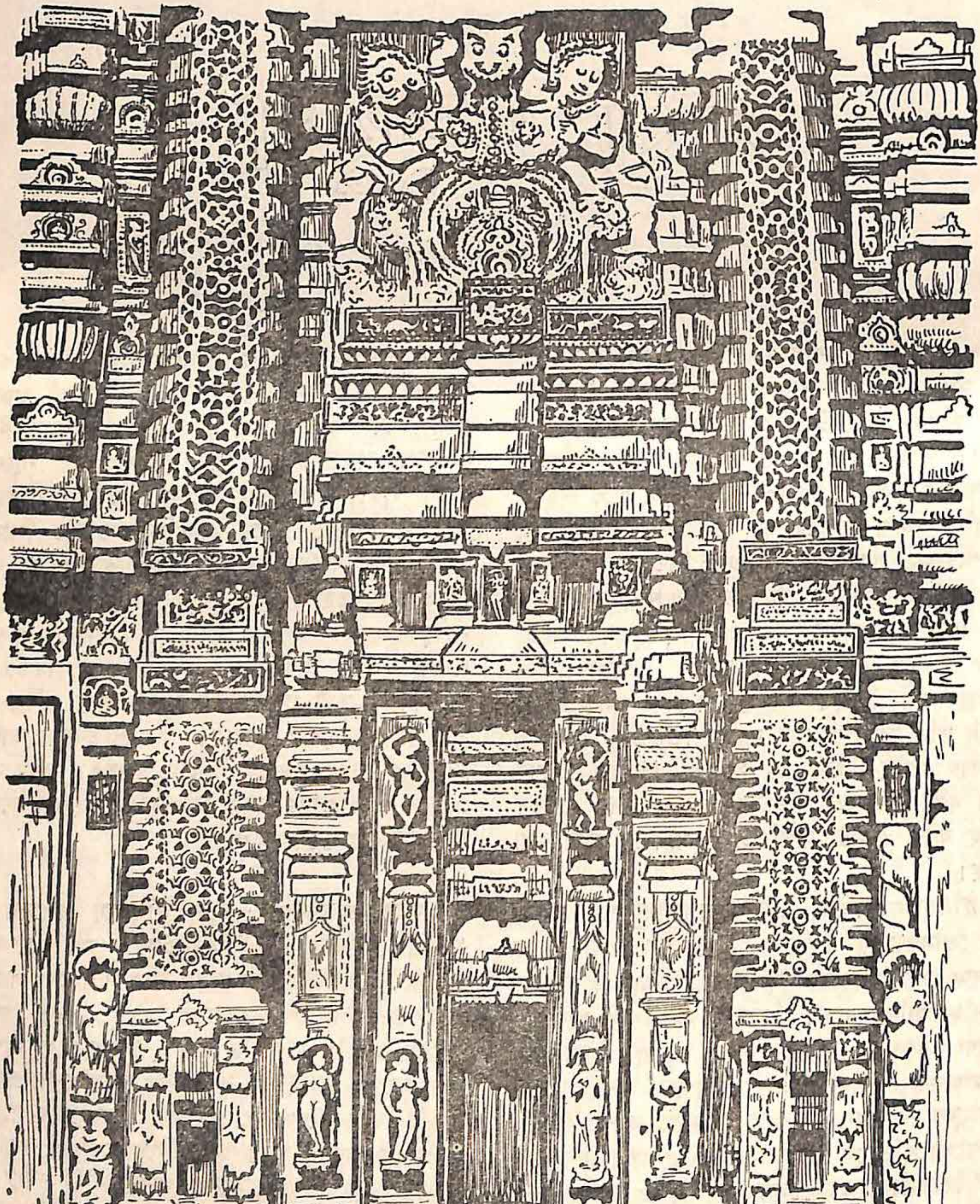
মধ্য হিন্দুযুগ

[অষ্টম—একাদশ শতাব্দী]

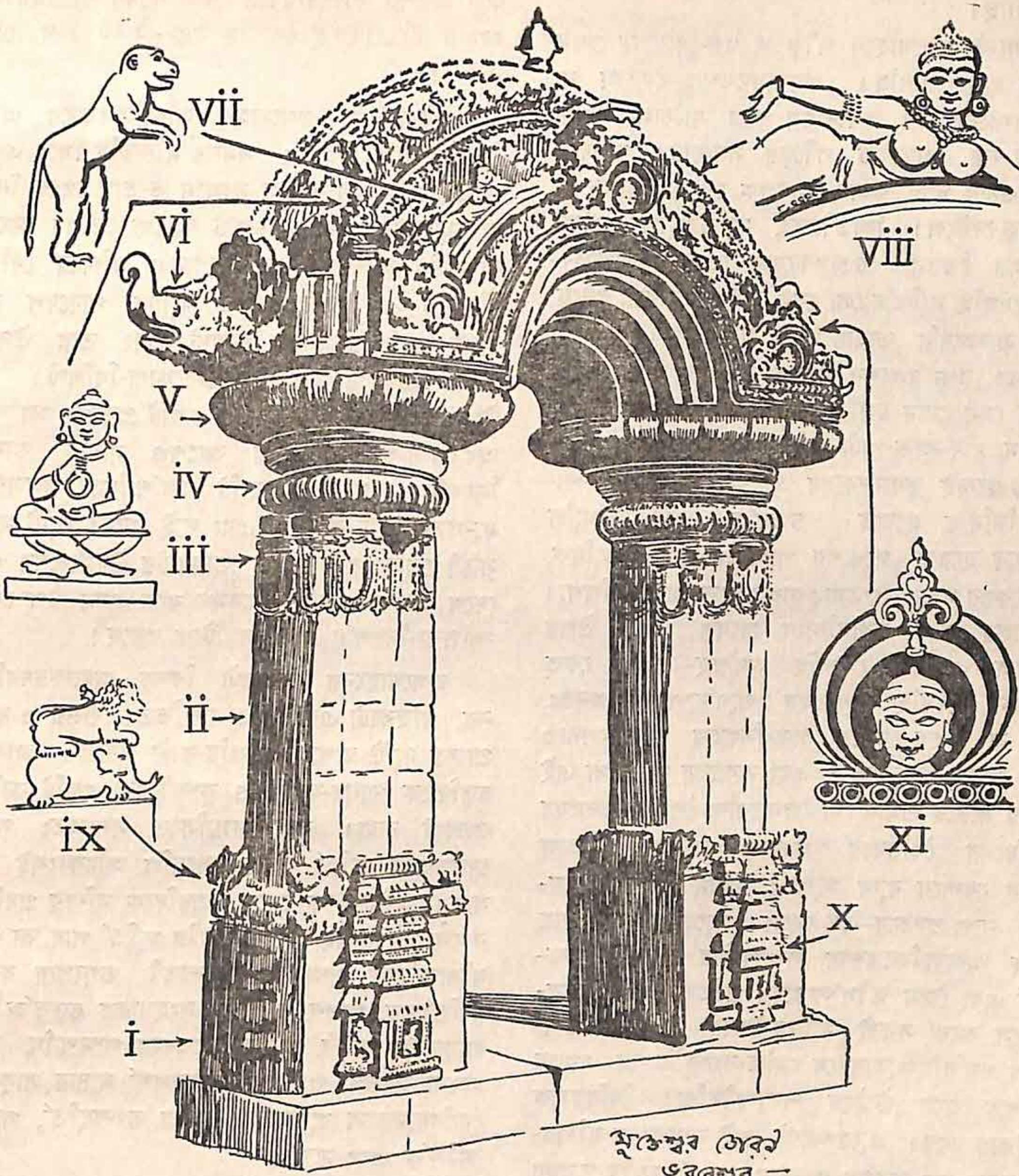
পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, গুহা মন্দির যুগের পর আমরা প্রায় পাঁচ-ছয়শত বৎসর ব্যাপী এক বন্ধ্যা যুগ অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলাম আদি হিন্দু-যুগে। তারপর প্রায় দু'শ বছর ধরে কলিঙ্গ স্থাপত্যের প্রথম যুগের দেব-দেউলগুলি গড়ে উঠতে দেখেছি আমরা—শত্রুঘ্নেশ্বর, ভরতেশ্বর, (রামেশ্বর), শিশিরেশ্বর, পরশুরামেশ্বর এবং বৈতাল। এ যুগ শেষ হচ্ছে আনুমানিক নবম শতাব্দীর শুরুতে। আমাদের হিসাবে পরবর্তী যুগ—মধ্য হিন্দুযুগও শুরু হচ্ছে ঐ নবম শতাব্দীর শুরুতে। তাহলে এখানে আমরা যুগ বিভাগ করছি কেন। কালানুক্রমিক একটা ফাঁক তো নেই দুই যুগের ভিতরে। তা নেই, স্বীকার করছি—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুই যুগের মধ্যে মন্দির-স্থাপত্য চিন্তায় একটা এমন প্রভেদ আছে যাতে একটি যুগবিভাগ অনিবার্য মনে করা গেছে।

ইতিহাসে দেখছি, এই যুগে সোমবংশী রাজন্য-বর্গ ভৌমকরদের বিতারণ করে শাসনদণ্ড হাতে নিচ্ছেন। ভৌমকরেরা বর্ণ হিন্দু ছিলেন না। শিব শুনেছি আদিম যুগে ছিলেন অনার্যদের দেবতা ; ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাঁকে জাতে তুলে নিয়েছিল। ভৌমকরেরাও শৈব ছিলেন, পরবর্তী বর্ণহিন্দুরাও শিবপূজা করেছেন ;—কিন্তু ভৌমকর যুগে জৈন ও বৌদ্ধদের প্রতি যে বৈরীভাব ছিল এ যুগে যেন সেটা ক্রমে তিরোহিত হয়ে গেল। জৈন ও বৌদ্ধ দেব-দেবীরা হিন্দু মন্দিরে স্থান পেলেন। বুদ্ধ হলেন হিন্দুদের একজন উপাস্য দেবতা। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, কলিঙ্গের স্থাপত্য ইতিহাসে এই আদি হিন্দুযুগ থেকে মধ্য হিন্দুযুগের সংক্রমণের মূলে আছেন একজন যুগাবতার—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য। এ কথা পূর্বাচার্যরা স্পষ্টাক্ষরে বলেননি ; অনধিকারী আমার এ কথা কেন মনে হয়েছে তা বলি। শঙ্করাচার্য 820 খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন ; কিন্তু তার পূর্বেই তিনি পুরীধামে গোবর্ধন-মঠের প্রতিষ্ঠা করে যান। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমনকি তিব্বতে গিয়েও তিনি বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের তর্কে পরাভূত করেন বটে কিন্তু 'দশাবতার স্তোত্রে' বুদ্ধদেবকে অবতাররূপে স্বীকৃতি দেন। অদ্বৈত বেদান্তের ধ্বজাধারী আচার্য শঙ্কর বৃহত্তর হিন্দুধর্মের নবপ্রবক্তা। ভৌমকরদের যুগাবসানে তাই গোবর্ধন-মঠের প্রভাবে কলিঙ্গেও এল ধর্মসহিষ্ণুতার জোয়ার। যার প্রতিফলন আমরা দেখব এ যুগের প্রথম মন্দির মুক্তেশ্বরে। আর তাই বৈতাল ও মুক্তেশ্বর প্রায় সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও দুটি বিভিন্ন যুগের মন্দির !

মুক্তেশ্বর দেউল : পুরাতত্ত্ববিদেরা বলছেন এ মন্দিরটির নির্মাণকাল 966 খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের তিরোধানের প্রায় দেড়শ বছর পরে এবং পরশুরামেশ্বর-বৈতাল-শিশিরেশ্বরের পরে কিন্তু ব্রহ্মেশ্বরের পূর্বে। মন্দিরটি ছোট্ট ; কিন্তু শুধু অপূর্ব কারুকার্যের জন্যই নয় এ দেউল স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রতীক। মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় 'মুক্তেশ্বর বালিপাথরে এক স্বপ্নের বাস্তব রূপ !' ফার্গুসনের ভাষায়—"It may be considered as the gem of Orissan Architecture." অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে এর সর্বাঙ্গ মণ্ডিত। কিন্তু সে কথা পরে, প্রথমে বলা দরকার এটিকে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের একটি দিকচিহ্ন



চিত্র—7·1 মুক্তেশ্বর দেউলের সম্মুখ-দৃশ্য (ভুবনেশ্বর)।



চিত্র—7·2 মুক্তেশ্বর দেউলের তোরণ (ভুবনেশ্বর)।

(I) ব্রহ্মকান্ড (চতুষ্কোণ) পাদদেশ
(II) ষোলোকোণা-বিশিষ্ট রুদ্রকান্ড—মধ্যদেশ

(III) রত্নহার
(IV) আমলক
(V) অর্ধপদ্ম
(VI) মকরমুখ
(VII) বানর
(VIII) অলসকন্যা
(IX) গজসিংহ
(X) পীড়মুন্ডি

(XI) ভো

কেন বলছি।

এখানেই জগমোহনে পীড় বা ভদ্র-দেউলের প্রথম পরীক্ষা হতে দেখছি। পরশুরামেশ্বর, বৈতাল বা শিশিরেশ্বরের মত জগমোহন আর আটচালা অথবা চারচালা নয়, এগারোটি পীড়ের সমাহার। আদিম-রূপ হওয়ায় ঘণ্টা, কলস, আমলক দেখতে পাচ্ছি না সে পীড়-দেউলে। দ্বিতীয়তঃ, মূর্তিগুলি এতদিন কুলুঙ্গির ভিতর চৈত্যগবাক্ষের ভিতর দেখেছি—এবার দেখছি মূর্তিগুলো যেন বাইরে বেরিয়ে আছে, যাকে ভাস্কর্যের ভাষায় বলে 'in alto-relievo'। তৃতীয়তঃ, বাড় অংশের শাস্ত্রসম্মত ভাগগুলি এখান থেকেই যেন মেনে চলা শুরু হল—পা-ভাগে পাচ্ছি পাঁচকাম, পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি-বসন্ত। এর পর থেকে ঐ পঞ্চ-ছন্দেই ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ মন্দিরের পা-ভাগ নির্মিত হয়েছে। চতুর্থতঃ, দেবমূর্তিগুলি বাহনযুক্ত হয়েছে—গণেশের পদতলে এসেছে মূষিক, কার্ত্তিকেয়র ময়ূর, সপ্তমাতৃকার ক্রোড়ে এসেছে শিশু। জগমোহন থেকে মূলমন্দিরে প্রবেশ পথের উপর লিন্টেলে এতদিন দেখেছি অষ্টগ্রহ—এবার কেতু এসেছেন, দেখছি নবগ্রহের পূর্ণরূপ। পঞ্চমতঃ, গণ্ডী বা রথক অংশে গজ-সিংহের পরিকল্পনাও এখান থেকে শুরু হল ; এবং সবচেয়ে বড় কথা এই মন্দিরে রয়েছে প্রমাণ যে, জৈন-বৌদ্ধ-শৈব সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বৈরিতার অবসান ঘটেছে। বৈতাল মন্দিরে যেখানে বুদ্ধ মূর্তির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল যূপ-প্রস্তরে—সে-স্থলে মুক্তেশ্বরের গায়ে দেখছি অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির মূর্তি, বুদ্ধ-মূর্তি এবং জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্তি! মুক্তেশ্বর সে অর্থে সত্যই 'মুক্তির-ঈশ্বর'—এ মহান উপ-দ্বীপে ধর্মসহিষ্ণুতার যে মৌল-সংস্কৃতি তা এখানে বিকশিত হয়ে উঠেছে শতাব্দীসঞ্চিত বৈরিতাকে অস্বীকার করে। মুক্তেশ্বরেই তাই ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্যের এক যুগের অবসান এবং দ্বিতীয় যুগের সূচনা (চিত্র—7·1)। এটা নিশ্চিত সম্ভবপর হল আচার্য শঙ্কর ও গোবর্ধন মঠের ধর্মসহিষ্ণুতার প্রভাবে।

বিমানের উত্তর ও দক্ষিণ রাহাপাগে গণ্ডী অংশে চৈত্যগবাক্ষটি একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। আগেই বলেছি, কলিঙ্গ স্থাপত্যে এর নাম 'ভো'। ভো-র উপরে কীর্তিমুখ। দু-পাশে দুটি সিংহ-নরমূর্তি, তারা কীর্তিমুখের মালাটিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাহা-পাগের দু-পাশে দেখছি অনুরথ-পাগে নিচে থেকে উপরে দুটি সুন্দর জাফরি-কাটা নকশা। কলিঙ্গ-স্থাপত্যের ভাষায় এর নাম ফাঁদ-গ্রন্থী। গণ্ডী ও বাড় অংশের ফাঁদ-গ্রন্থীতে যে সূক্ষ্ম কারিগরী তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি চিত্র—5·16 এবং চিত্র—5·17-এ।

দেউল এবং জগমোহন সম্মিলিতভাবে একটি পিষ্ঠের উপর তৈরী। সমস্ত মন্দিরটি ঘিরে একটি পাঁচিল। মন্দির-সমতল সংলগ্ন ভূ-ভাগ থেকে নিচে। জগমোহনের সম্মুখে একটি অনুচ্চ তোরণ আছে—যা নাকি কলিঙ্গের অন্য কোনও মন্দিরে দেখিনি (চিত্র—7·2)। তোরণ-স্তম্ভ দুটির পাদদেশ ব্রহ্ম-কাণ্ড অর্থাৎ চারকোণা-বিশিষ্ট এবং তার উপরের অংশ রুদ্রকাণ্ড অর্থাৎ ষোলোকোণা-বিশিষ্ট। তার উপরে রত্নহার, আমলক এবং একটি প্রকাণ্ড অর্ধপদ্ম। অর্ধগোলাকৃতি উপরের অংশেও নানান্ ভাস্কর্য নিদর্শন। দু-দিকে দুটি অর্ধশায়িতা অলসকন্যা, দু-পাশে দুটি বানর। এবং দুই প্রান্তে দুটি মকর। সাঁচী তোরণের মত এই তোরণটির ঊর্ধ্বাংশের ওজন দেখে অবাক হতে হয়—কেমন করে এমন 'টপ্-হেভি' স্থাপত্য-নিদর্শন এতদিন টিকে আছে!

জগমোহনের ভিতরটা কিন্তু অলঙ্করণবর্জিত নয়, খাঁজকাটা এবং মূর্তি-শোভিত। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি অপূর্ব জাফরি-কাটা গবাক্ষ। জাফরির চতুর্দিকে 'বানর-কর্কট ও কুম্ভীরের' একটি কাহিনী খোদাই করা। কুলুঙ্গিগুলিতে সম্ভবতঃ পার্শ্ব-দেবতাদের মূর্তি ছিল—সেগুলি অধিকাংশই অপ-সৃত। দক্ষিণদিক থেকে উত্তরদিকে মন্দির প্রদক্ষিণ-কালে পর্যায়ক্রমে যে দেবদেবীর মূর্তি পাব তা এই : বীণাবাদিনী পদ্মাসনা সরস্বতী, ভগ্নপ্রায় বরাহী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, গজাসুর-সংহাররত চতুর্ভুজ শিব, লাকুলীশ, দুর্গা, অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি, কুবের অথবা জম্ভল, পুনরায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় লাকুলীশ, বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধদেব, দুর্গার ভগ্নমূর্তি, পুনরায় কার্ত্তিক এবং সূর্য।

এ মন্দিরে নাগ ও নাগিনী মূর্তির প্রাবল্যও লক্ষ-ণীয়। অবশ্য নাগ-নাগিনী মূর্তি কলিঙ্গ দেশে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। একেবারে প্রথম যুগের উদয়গিরি গুহা থেকে শেষ যুগের কোণার্ক পর্যন্ত।

মুক্তেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন মারিচী-কুণ্ডের জল-পানে বন্ধ্যা নারী সন্তানসম্ভবা হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। মুক্তেশ্বরের দক্ষিণে কেদারেশ্বর এবং পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরকে সংলগ্ন মন্দিরই বলা চলে, যদিও তাদের নির্মাণকাল দ্বিতীয় যুগের।

গৌরী-দেউল : কালানুক্রমিকভাবে দেখবার উদ্দেশে তাই কেদারেশ্বর মন্দিরকে অতিক্রম করে তার দক্ষিণে অবস্থিত গৌরী-দেউলটি এবার দেখব আমরা। বৈতালের মত এটিও কাখর-দেউল। দুঃখের কথা ঊর্ধ্বাংশ ভেঙে যাওয়ায় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে এটিকে পুনরায় নির্মাণ করতে হয়েছে। এখানেও দেখছি, জগমোহনের দিকে রয়েছে, একটি ঝাম্পান-সিংহ—যদিও বুঝতে পারি না সেটা আদিম অবস্থাতেও ছিল কি না ; কারণ এটিও পুরাতত্ত্ব বিভাগের মেরামতি করা অংশে অবস্থিত।

গৌরী-দেউলের সঙ্গে মুক্তেশ্বরের সাদৃশ্য প্রচুর। দেউল অংশটা কাখর দেউলের নিয়ম অনুসারে লম্বাটে—পঞ্চরথ দেউল। বাড় অংশের অলঙ্করণ মুক্তেশ্বরের অনুরূপ। যদিও গণ্ডী-অংশে এর পার্থক্য প্রকট। মুক্তেশ্বরের মত ভূমি এবং আমলকে গণ্ডী-অংশ বিভক্ত নয়। মস্তক-অংশে বর্তমানে একাধিক কলস আছে, যদিও মনে হয় আদিমরূপে একটি মাত্র শিখরই ছিল।[1]

মূর্তিগুলি অধিকাংশই অক্ষত নেই। পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে কোন কোন মূর্তি মেরামতের চেষ্টা হয়েছে, তাতে তাদের রূপ আরও বিকৃত হয়ে গেছে ! দক্ষিণদিকের পূর্বদিকস্থ রাহাপাগে একটি এবং পশ্চিমদিকে আর একটি নায়িকা মূর্তি অটুট আছে —যা থেকে ভাস্করের দক্ষতা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। প্রথমোক্ত নায়িকামূর্তি একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্তম্ভের উপর একটি পোষা পাখী ; এবং শেষোক্ত মূর্তিটি আরও সুন্দর—দেখছি, নায়িকা তার পায়ের নূপুর খুলে ফেলছেন। ব্যঞ্জনাটা মর্মস্পর্শী। এ নায়িকা বস্তুতঃ অভিসারিকা ; পাছে চরণ মঞ্জিরের নিক্কণে শাশুড়ী-ননদিনীর নিদ্রায় ব্যাঘাত হয় তাই অভিসারিকার এই সাবধানতা।

গৌরী-দেউলের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য হিন্দুযুগের প্রথম পর্যায়ের মন্দির-দর্শন শেষ হল আমাদের। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম মন্দির যেটি আমরা দেখব সেটি সিদ্ধেশ্বর। প্রায় সমসময়েই নির্মিত হয়েছিল সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর এবং রামেশ্বর। সময়কালটা একাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ। কিন্তু এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্দিরগুলি দর্শনের আগে আমাদের পক্ষে কলিঙ্গের ইতিহাস আবার কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া ভাল ; তা' হলে বুঝতে পারব কোন রাজকুলের অনুগ্রহে মন্দির শিল্প এভাবে এগিয়ে চলেছে।

ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছিলাম রাজা শশাঙ্কের আমলে, সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে। সপ্তম থেকে একাদশ এই চারশ বছরে ভারতের স্থাপত্য-ইতিহাসের গঙ্গায় অনেক জল বহে গেছে—বাংলা-বিহারে পাল রাজাদের উত্থান-পতন ঘটেছে, কান্যকুব্জের প্রতিহার বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চণ্ডেল্য বংশ উত্তর খণ্ডে উঠেছে ও পড়েছে। দাক্ষিণাত্যে পহ্লবেরা মহাবলীপুরম্ মন্দির নির্মাণ শেষ করেছেন। বাতাপীর প্রথম-চালুক্য বংশ অস্তমিত হয়ে কল্যাণীতে দ্বিতীয় চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে। কল্যাণীর মন্দিরগুলি শেষ হয়েছে। অজন্তার সব কয়টি গুহামন্দিরের কাজ অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে —এলোরাতে রাষ্ট্রকূটদের অর্থানুকূল্যে শেষ কয়টি গুহা সবে শেষ হল।

সুতরাং কলিঙ্গের এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পীদল নিশ্চয়ই এসব শিল্পকর্মের সংবাদ অন্ততঃ কিছু কিছু রাখতেন। পূর্বযুগের মত যাতায়াত এত দুঃসাধ্য ছিল না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে চালুক্য, পাল বা কান্যকুব্জ রাজার দূত বিনিময় নিশ্চয়ই হত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কলিঙ্গের শিল্পীদল তাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধারায় অন্য কোনও রাজ্যের প্রভাব মেনে নিতে রাজী হয়নি। শিল্প ক্ষেত্রে কলিঙ্গ আমদানি না করলেও রপ্তানি করেছে বেশ কিছু। খাজুরাহোতে চণ্ডেল্য রাজবংশ কলিঙ্গ-স্থাপত্যের রকমফের করেই তৈরী করেছিল অসংখ্য মন্দির। চালুক্যরা কলিঙ্গ অধিকার করেছিল বটে কিন্তু বিজিত রাজ্য থেকেই শিল্পধারা নিয়ে গিয়েছিল নিজ দেশে—আমদানি করতে পারেনি কিছুই। রাজারানী-দেউলে কোনও নাম-হারানো কলিঙ্গেশ্বর কিছু চাণ্ডেল্য-রীতি আমদানীর চেষ্টা করেছিলেন ; পরে আমরা দেখব তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। বাদামীতে (আইহওলের অনতিদূরে) মন্দির শিল্পেও তার লক্ষণ দেখছি। ধারওয়াড়ে, বাদামীতে মন্দির ভাস্কর্যের বিরাল কলিঙ্গ থেকেই গিয়েছিল। বাদামীতে এক-নং গুহার নটরাজের মূর্তির সঙ্গে দেখছি মুক্তেশ্বরের নটরাজ মূর্তির পরিকল্পনার অদ্ভুত সাদৃশ্য ; —যেহেতু শেষোক্তটি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তাই বলতে পারি, বাদামীই এ কল্পনা কলিঙ্গ থেকে আমদানি করেছিল।

সে যাই হোক, শশাঙ্কের কলিঙ্গ বিজয়ের পর ইতিহাসের সূত্র তুলে নিয়ে বলতে পারি—সপ্তম

শতাব্দীর প্রথম পাদেই কলিঙ্গে দেখা দিল শৈলোদ্ভব রাজবংশ—গৌড়েশ্বরের করদ নয়, স্বাধীন কলিঙ্গের রাজা হিসাবেই। তাদের সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না বটে তবু এটুকু বলা যায় যে, পরশুরামেশ্বর মন্দির নির্মাণকালে শৈলোদ্ভবেরাই কলিঙ্গের শাসক।

শশাঙ্ক অস্তমিত হতেই শৈলোদ্ভবেরা কলিঙ্গের সিংহাসন দখল করেছিল সম্ভবতঃ 620 খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাদের শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র তেইশ বছর পরে 643 খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন কলিঙ্গ বিজয়ে আসেন। শৈলোদ্ভবেরা প্রচণ্ড আঘাত পায়—সম্ভবতঃ তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক নূতন রাজবংশ সিংহাসন দখল করল সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা শেষপাদে—তারা ভৌমকর। প্রায় একশ বছর ধরে ঐ ভৌমকরেরা কলিঙ্গ শাসন করেছে। সেই একশ বছরের ভিতরে তৈরী হয়েছে বৈতাল, শিশিরেশ্বর প্রভৃতি মন্দির।

ভৌমকরেরা আর্যক্ষত্রিয় নয় ; তাদের আমলেই, সম্ভবতঃ রাজানুকূল্যে শৈবধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক ধ্যানধারণা, মহাযান বজ্রযানের বামাচার প্রবেশ করে। শক্তি পূজাও তাদের আমলে প্রথম শুরু হল—দেখা দিল বৈতাল মন্দির, যার মূল বিগ্রহ চামুণ্ডার! স্বর্ণাদ্রি-মহোদয় পুরাণের সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে শাস্ত্রকার বলেছেন, "নৃমুণ্ডমালা-শোভিতা মহাশক্তি-ধারিণী কাপালিনী চামুণ্ডা বিন্দু সরোবরের পশ্চিম-প্রান্তে অধিষ্ঠিতা।" একাধিকবার 'কাপালিনী' উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় শব্দটা "কপালিনী"র ভ্রান্তরূপ নয়—কাপালিকের স্ত্রী অর্থাৎ ভৈরবীর রূপ। বৈতাল মন্দিরে হয়তো সে যুগে নরবলী পর্যন্ত হত! ভুবনেশ্বরে অবস্থিত অন্য কোন মন্দিরের গর্ভগৃহ এত অন্ধকার নয়।

ভৌমকরদের শাসন শেষ হল নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং তখনই সোমবংশী রাজন্যবর্গের প্রথম নৃপতি জন্মেজয় কেশরীবংশের পত্তন করেন। ভৌমকররা সম্ভবতঃ ছিল তপশীল-সম্প্রদায়ভুক্ত—ভুঁইহার। বর্ণহিন্দুরা তাদের শাসনে তাই হয়তো খুশী ছিল না। ভৌমকরদের ধর্মমতে যে-সব বামাচার প্রবেশ করেছিল তাতেও গোঁড়া শৈব-পুরোহিতের দল সন্তুষ্ট ছিলেন না। বর্ণহিন্দু কেশরী রাজাদের অভ্যুত্থানে তাই খুশীই হয়েছিলেন মন্দির পুরোহিতের দল। মুক্তেশ্বরের মন্দিরে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মুক্তির মন্ত্র তাই কি আমরা শুনতে পেয়েছি কেশরী বংশের শুরুতেই ?

প্রথম জয়তী কেশরী ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর এবং পুরীতে 'জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণ করান। মুক্তেশ্বর মন্দির অটুট থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে জয়তী কেশরী নির্মিত জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই। বর্তমানে পুরীতে জগন্নাথ দেবের যে মন্দির দেখতে পাই তা অনেক পরে আদ্যন্ত নির্মাণ করেছিলেন পরবর্তী রাজ-বংশের অনন্ত বর্মণ চোড় গঙ্গ। কেশরী বংশের শেষ দুজন রাজা দ্বিতীয় জয়তী কেশরী এবং উদ্যত কেশরী ভুবনেশ্বরের মূল মন্দির ও জগমোহন নির্মাণ করান। এছাড়া, দ্বিতীয় জয়তী কেশরীর স্ত্রী এবং উদ্যত কেশরীর জননী কোলাবতী দেবী ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্মাণ করান। যদিও এই রাজ-বংশ ধর্মে ছিলেন শৈব, তবু জগন্নাথ দেবের বিষ্ণুমূর্তির নির্মাণ এঁদের হাতেই হয়েছিল। শুধু তাই নয়, উদ্যত কেশরীর সময়েই খণ্ডগিরিতে নবমুনী গুহায় জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উদ্যত কেশরীর মৃত্যুতে কলিঙ্গের সিংহাসন আবার হাত বদল হল—সোমবংশী অথবা কেশরী বংশীয়দের পরিবর্তে উৎকল-অধিপতি হলেন গঙ্গ এবং সূর্য-বংশের রাজন্যবর্গ। কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা বরং ভুবনেশ্বরে এ যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের মন্দির—সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, রাজারানী মন্দিরগুলি দেখে আসব। কারণ সেগুলি গঙ্গ বংশের উত্থানের আগেই নির্মিত।

সিদ্ধেশ্বর-রামেশ্বর-কেদারেশ্বর মন্দির তিনটি সমপর্যায়ের এবং একই যুগের। তাদের নির্মাণকাল কেশরী বংশের শেষ পর্যায়ে। এর ভিতর রামেশ্বর এবং সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মনে হয়, ঐ দুটি স্থানে পূর্বেই দুটি মন্দির ছিল। সেই আদিম দেব-বিগ্রহের উপর একই স্থানে এ দুটি মন্দির এযুগে নূতন করে গড়ে উঠেছে। রামেশ্বর মন্দিরের সমস্তটা ভিতের (প্লিন্থ-এর) প্রস্তরখণ্ড প্রমাণ দেয় যে সেটি পূর্বেকার মন্দিরের অংশ মাত্র। তাই হওয়া স্বাভাবিক—কারণ ঐ মন্দিরের অনতিদূরে এক সারিতে রাজা দশরথের তিন পুত্রের নামে অতি প্রাচীন তিনটি মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতেই নির্মিত হয়েছিল। ভরতেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর এবং শত্রুঘ্নেশ্বর থাকবেন আর রামেশ্বর মন্দির একই সঙ্গে নির্মিত হবে না, এ কথা চিন্তাই করা যায় না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ঐ তিনটি মন্দিরের সরল রেখায় অবস্থিত ছিল রামেশ্বর-দেউল, একই দূরত্বে—স্টেশান থেকে

মন্দিরে যাবার সড়কটি ঠিক সেই মন্দিরের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—না হলে মাটি খুঁড়ে সেই প্রাচীন মন্দিরের বনিয়াদ বার করা চলত।

সিদ্ধেশ্বর : অনুরূপভাবে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটিও পুরাতন মন্দিরের উপর একাদশ শতাব্দীতে নূতন করে তৈরী করা। বর্তমান মন্দিরের গায়ে প্রাচীন মন্দিরের কিছু কিছু পাথর এখনও দেখতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের যা বৈশিষ্ট্য এই সিদ্ধেশ্বর-দেউলেই তার পূর্ণ বিকাশ প্রথম লক্ষিত হল। দেউলের বাস্তু-নক্‌শা পঞ্চরথ ; বাড় অংশটি ত্রি-অঙ্গ নয় পুরোপুরি পঞ্চাঙ্গ। উপর ও তল-জঙ্ঘার সীমা নির্দেশকারী বন্ধন এই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করল। জঙ্ঘাদ্বয়ে কাখর-মুণ্ডি ও পীড়-মুণ্ডি অলঙ্করণ দেখা দিয়েছে। বন্ধন অংশ শাস্ত্রসম্মত 'সাত-কাম'। কোণাপাগে দেখছি গণ্ডী অংশে পাঁচটি ভূমি, পাঁচটি ভূমি-আমলকে বিভক্ত। মন্দিরশীর্ষের আমলকের তলায় রয়েছে চারটি উপবিষ্ট বামন—যে অলঙ্করণটি পরবর্তীযুগের প্রায় সব মন্দিরেই অনুকৃত। পার্শ্বদেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ রাহাপাগের কুলুঙ্গিতে স-মূষিক গণপতি এবং পশ্চিম কুলুঙ্গিতে কার্ত্তিকেয় উপস্থিত।

জগমোহনটি কিন্তু পঞ্চ-অঙ্গের নয়—সেটি এখনও ত্রি-অঙ্গ অর্থাৎ পাভাগ-জঙ্ঘা-বরণ্ডিতে বিভক্ত। অনতিদূরের মুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনের মতই পীড়-দেউল সেটি ; কিন্তু এবার দেখছি, তার উপর আমদানি করা হয়েছে কলস—যদিও পীড়-দেউলের মস্তকাংশের শাস্তসম্মত অন্যান্য অঙ্গ—ঘণ্টা বা শ্রী ইত্যাদি এখনও আসেনি।

কেদারেশ্বর : মুক্তেশ্বর এবং গৌরী-দেউলের মাঝখানে এই মন্দিরটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য মন্দিরের মতো এটি পূর্বমুখী নয়, দক্ষিণ-মুখী। দ্বিতীয়তঃ, এর ভূমি-আমলকগুলি গোলাকার নয় চতুষ্কোণ। পাভাগে পাঁচকাম—পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি-বসন্ত। উপর-জঙ্ঘায় অধিকাংশই মিথুন মূর্তি, তল-জঙ্ঘায় বিরাল। পার্শ্বদেবতাদের মধ্যে কার্ত্তিক এবং গণেশ উপস্থিত। এবার দেখছি, জগমোহনের মস্তকাংশে শাস্ত্রসম্মত সব কয়টি অঙ্গই উপস্থিত। জগমোহনের প্রবেশ-পথে, দক্ষিণদিকে একটি শিলালেখের বক্তব্য—রাজা প্রমাড়ি কেদারেশ্বরের মন্দির সম্মুখে অনির্বাণ শিখায় জ্বলার উপযুক্ত প্রদীপটি নির্মাণ করান। বোধকরি অনির্বাণ শিখায় জ্বলবার উপযুক্ত ঘৃতের বাৎসরিক চালানের আয়োজনও তিনি চিরকালের নিমিত্ত করেছিলেন, কোন ভূমিখণ্ড দান করে। এই রাজা প্রমাড়ি হচ্ছেন পুরীর মন্দির নির্মাতা অনন্তবর্মা চোড় গঙ্গর অনুজ ভ্রাতা। বলাবাহুল্য, এ লিপিটি পরবর্তী কালের।

ব্রহ্মেশ্বর : একটু দূরে অবস্থিত বলে অনেক সময় যাত্রীরা এ মন্দিরটি দেখতে যান না, এবং জানতেও পারেন না যে তাঁরা কী হারালেন। ইদানীং ঐ মন্দির পর্যন্ত পাকারাস্তা হয়েছে ; মটোরগাড়ি বা রিক্‌সা অনায়াসে যেতে পারে। ফলে এটিকে বাদ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ এ মন্দিরে কয়েকটি অনবদ্য ভাস্কর্য আছে।

একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই দেউলটি গেঁথে তোলেন সোমবংশী নৃপতি উদ্যোতকেশরীর জননী কোলাবতী দেবী। সে আমলে ঐ অঞ্চলের নাম ছিল সিদ্ধতীর্থ। বাড়-অঞ্চল যথারীতি পাঁচভাগে বিভক্ত ; পা-ভাগ ও বড়ণ্ডিতে যথাক্রমে পাঁচ ও তিন কাম। তল-জঙ্ঘায় কাখর-মুণ্ডি ও বিরাল ; উপর-জঙ্ঘায় পীড়-মুণ্ডি ও নায়িকামূর্তির আধিক্য। নায়িকা-মূর্তিগুলি অতি সুন্দর। রাজারানী ও লিঙ্গরাজের সঙ্গে তুলনীয়। কয়েকটি মিথুন-মূর্তিও অনবদ্য (চিত্র—5·30)। প্রবেশদ্বারে সুন্দর লতাপুষ্পের নক্‌শা ও শৈব-দ্বারপাল। লিণ্টেলের কেন্দ্রীয় অবস্থানে গজলক্ষ্মী।

জগমোহনে একটি অপূর্ব প্রস্তর-চন্দ্রাতপ। একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে উৎকীর্ণ করা। এই জাতের কারুকার্য ইতিপূর্বে মুক্তেশ্বরেও লক্ষ্য করা গেছে।

রাজারানী : সিদ্ধেশ্বর মন্দির থেকে পূর্বমুখে যে রাস্তাটি চলে গেছে সে পথে পড়বে চারটি প্রান্তিক দেউল—রাজারানী, ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর এবং মেঘেশ্বর। ভুবনেশ্বরের সাম্প্রতিক নগরবিস্তারের পূর্বযুগে এই চারটি দেব-দেউলকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন মনে হত। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যখন তাদের ভিতর রাজারানী মন্দিরটিকে দেখেছিলাম তখন মনে হয়েছিল আদিগন্ত ধানক্ষেতের সমুদ্রে যেন একটি লাইট হাউস! শস্যভারনম্র পাকাধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠছিল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গের মতো। ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে সরু আলপথ বেয়ে মন্দির-দেহলিতে উপস্থিত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক শতাব্দীর অবহেলাকে উপেক্ষা করে দেব-দেউলের

বিভিন্ন অঙ্গে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বালি-পাথরের মূর্তি—দেবদেবী, গজবিরাল, অলসকন্যার দল। কারও ভেঙেছে হাত, কারও পা,—সামুদ্রিক লোনা হাওয়ায় তাদের পেলবতা, মসৃণতা বহুদিন অন্তর্হিত ; তবু মহাকালের স্থূল হস্তাবলেপনকে অস্বীকার করে ওরা দাঁড়িয়ে আছে শিল্পীর সেই আদিম আবেদনের পশরাটুকু মাথায় নিয়ে।

রাজারানী মন্দিরটি ভুবনেশ্বরের দেব-দেউল প্রাঙ্গণে এক সুদুর্লভ উদাহরণ। সে স্বতন্ত্র, সে একক, সে অনন্য। এই অন্তেবাসী অনবদ্য মন্দিরটি কলিঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। কেন সে কথাই আগে বলি :

প্রথম কথা : ওর নাম। ভুবনেশ্বরে প্রায় প্রতিটি মন্দিরের নামের শেষে আছে 'ঈশ্বর'। একমাত্র লিঙ্গ-রাজ (যার আদিনাম অবশ্য ত্রিভুবনেশ্বর) ভিন্ন অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য শিবমন্দির নেই যার শেষাংশ 'ঈশ্বর' নয়। শাক্ত বা বিষ্ণুমন্দিরের ক্ষেত্রে বিগ্রহের পরিচয় বহন করে মন্দিরের নাম ; যেমন বৈতাল, গৌরী, মোহিনী বা অনন্তবাসুদেব। রাজারানী এদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম। সে ঐ দুটি নিয়মের একটাও মানেনি। নাম থেকে বিগ্রহের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কেন? বস্তুত মন্দিরের বিগ্রহটি অপহৃত, অথবা অপসৃত। বিগ্রহটি কিসের ছিল তারও কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, নামটি এসেছে এই মন্দিরে ব্যবহৃত এক বিশেষজাতের লালচে বালি-পাথর থেকে, যার স্থানীয় নাম 'রাজারানিয়া'। তাঁদের মতে এ মন্দিরে দেব-মূর্তি আদৌ কোনদিন প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে একটিই যুক্তি : মূলমন্দির বা বিমানে অতি সূক্ষ্মকারুকার্য বিদ্যমান, অথচ জগ-মোহনটিতে কোনও কারুকার্য নেই, যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে শেষ করা। তাই ওঁদের ধারণা, কোন এক রাষ্ট্রবিপ্লবে জগমোহনটি কোনক্রমে শেষ করা হয় বটে কিন্তু মূর্তি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মন্দিরটি পরিত্যক্ত। সেজন্য কোনও দেবতার সঙ্গে দেউলের নাম যুক্ত হয়নি ; হয়েছে বালি-পাথরের নামে : রাজারানিয়া।

এই মতটি মানতে পারা যাচ্ছে না একটি বিশেষ কারণে। যদিচ কপিলসংহিতা, মাদলাপঞ্জী এবং অন্যান্য পুরাণ এ মন্দির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব কিন্তু একাম্র পুরাণে এর উল্লেখ আছে। ঐ পুঁথির চতুর্দশ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে : মুক্তেশ্বর মন্দির থেকে 70 ধেনবন্তর দূরত্বে পূর্বদিকে একটি দেউল আছে, তার নাম শক্রেশ্বর। শক্র হচ্ছেন ইন্দ্র, সুতরাং শক্রে-শ্বর হচ্ছেন 'দেবরাজ ইন্দ্র পূজিত দেবাদিদেব'। ধেন্ব-ন্তর নিঃসন্দেহে একটি দৈর্ঘ্যের মাপ—ধেনু + অন্তর ; অর্থাৎ সত্তরটি গাভি 'লেজে-মাথায়' সার বেঁধে দাঁড়ালে যে দূরত্ব হবে। একটি গড় গাভীর দৈর্ঘ্য যদি 1.5 মিটার হয়, তাহলে এই দূরত্ব হচ্ছে 105 মিটার। মুক্তেশ্বরের পূর্বদিকে এই দূরত্বে কোনও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি ; কিন্তু সেই চিহ্নিতস্থানের নিকটতম দূরত্বে আছে রাজারানী। তার চার-পাঁচ গুণ দূরে অবশ্য আরও মন্দির আছে, কিন্তু তাদের নাম সুচিহ্নিত : ভাস্করেশ্বর ও মেঘে-শ্বর। ফলে অনুমান করছি, একাম্র পুরাণমতে রাজা-রানীই ছিল সে-আমলের শক্রেশ্বর। তা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, এই দেউলে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ; কারণ দেবমূর্তি সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত না হলে পুরাণে তার উল্লেখ থাকা সম্ভবপর নয়। পুরাণকারের কাছে মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্য নিরর্থক, মন্দিরের প্রথম শর্ত তার বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। এছাড়া, কলিঙ্গের ইতিহাসে ঐ সময়ে কোনও রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিবরণ পাই না। অপিচ, যদি ওঁদের যুক্তিই মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রবিপ্লব শেষ হলে কেন মন্দিরে দেব-প্রতিষ্ঠা হবে না? কেন তার নাম হবে 'রাজারানিয়া' পাথরের নামে?

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ঐ লালরঙের বালি-পাথর, যার নাম রাজারানিয়া। ভুবনেশ্বরের আর কোনও মন্দির ঐ পাথরে নির্মিত নয়। মনে হয়, পাথরগুলি অন্য কোনও স্থান থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, এ মন্দিরের বাস্তু-নক্শা। কলিঙ্গ স্থাপত্যের চিরাচরিত নির্দেশমত এ দেউলের জগ-মোহন ও গর্ভগৃহের আভ্যন্তরীণ প্রাচীর চারটিমাত্র সরলরেখার সমাহারে বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র নয়। ভিতর দিকের দেওয়াল ক্রমাগত খাঁজ-কাটা। চিত্র—7.3 লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এত বেশি খাঁজ-কাটা হয়েছে যে, ভিতর দিকের প্রাচীর প্রায় গোলাকার। মজা হচ্ছে এই যে, ভিতরের দেওয়াল ভুবনেশ্বরে কখনই খাঁজ-কাটা নয়, অথচ খাজুরাহোর প্রায় প্রতিটি মন্দিরের বাস্তু-নক্শা ঐ জাতীয়।

চতুর্থতঃ, মন্দির-শিখর। ভুবনেশ্বরের অসংখ্য দেউলের মধ্যে একমাত্র রাজারানীর শিখর রেখ-দেউলের ছন্দে গঠিত হয়নি। কেন্দ্রীয় শিখরকে চার-দিক থেকে চারটি ক্ষুদ্রতর শিখর ঘিরে ধরেছে, এবং ঐ ক্ষুদ্রতর শিখর চতুষ্টয়কে বেষ্টন করে আছে আরও

অসংখ্য ক্ষুদ্রতম শিখর। প্রতিটি শিখরই রেখ-দেউলের ছন্দে গঠিত, আমলক, ভূমি-আমলক ইত্যাদিতে শোভিত। এই অদ্ভুত শিখরের দোসর সমগ্র ভুবনেশ্বরে খুঁজে পাবেন না ; অথচ আবার বলি—খাজুরাহো মন্দির-শিখরে এইটিই প্রচলিত রীতি। চিত্র—7·3-তে দৃষ্ট মন্দির-শিখরের সঙ্গে কলিঙ্গের অন্য যেকোন দেবদেউলের শিখর তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে ঐ ধরনের খাজুরাহো-প্রতিম শিখর উড়িষ্যায় আর নেই।

পঞ্চমতঃ, ভাস্কর্যের গঠনশৈলী। মূর্তিগুলিতে খাজুরাহো-ভাস্কর্যের ছাপ প্রবলভাবে পড়েছে। কলিঙ্গের অন্যান্য মন্দিরে নায়িকার দল কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া, বরং বলা উচিত—'শ্রোণীভারাদলসগমনা'। তুলনায় খাজুরাহোর নায়িকা সবাই যেন ব্যালে-নাচের আসর থেকে উঠে এসেছে। রাজারানীতে সেই লঘুছন্দ সাবলীল ভাবটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আরও একটি কথা। কলিঙ্গে মূর্তিকে কখনও পিছনদিক থেকে খোদাই হতে দেখি না, যাকে বলি 'ব্যাক-ভিয়ু'। খাজুরাহোতে তা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় (চিত্র—5·25)। এবং দেখা যাচ্ছে কলিঙ্গের এই রাজারানী মন্দিরেও।

সবটা মিলিয়ে আমাদের মনে একটা সম্ভাবনার কথা জেগেছে। সেটা যে নির্ভুল এমন দাবী করতে ভরসা পাই না ; কারণ বিশেষজ্ঞেরা এ-কথা কেউ বলেননি। তবু গোয়েন্দাকাহিনীর শেষে ডিটেক্টিভ যেভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত ক'রে প্রতিটি অসঙ্গতির এক-একটি সমাধান দাখিল করেন, এ-ক্ষেত্রেও তেমনি সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে যদি আমাদের থিয়োরিটা মেনে নেওয়া যায় :

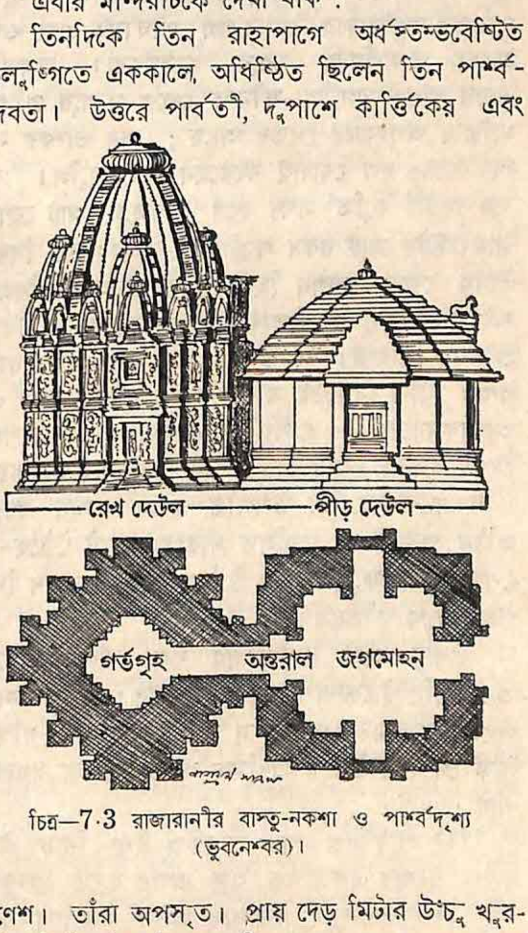
আমরা অবাক হব না, যদি কোনও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেন যে, তদানীন্তন কলিঙ্গাধিপতি বুন্দেলখণ্ড থেকে একটি চাণ্ডিল্যা-বংশীয় রাজকুমারীকে বিবাহ করে আনেন এবং মহারানীর ইচ্ছানুসারে সে দেশের স্থপতিকে নিয়ে এসে ভুবনেশ্বরে এই দেব-দেউলটি গেঁথে তোলেন।

সেক্ষেত্রে বোঝা যায়, কেন এ দেউলের বাস্তু-নক্শা কলিঙ্গ-স্থাপত্যকে অস্বীকার করে খাজুরাহো-শৈলীকে গ্রহণ করেছে, কেন শিখরে খাজুরাহোর প্রবল প্রভাব, কেন মূর্তিগুলি খাজুরাহো-শৈলীর। হয়তো মহারাজা আশঙ্কা করেছিলেন—রক্ষণশীল কলিঙ্গবাসী তাঁর মৃত্যুর পরে এই মন্দিরে দেববিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করবে না, মন্দিরকে উপেক্ষা করবে ; তাই নিজ জীবদ্দশায় অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে জগমোহনটি সমাপ্ত করেন। সেখানে শক্রেশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তাই পুরাণে তার উল্লেখও হয়েছে। কিন্তু ঐ মহারাজের প্রয়াণের পর রক্ষণশীল কলিঙ্গ-স্থপতি এই বিজাতীয় দেউলটিকে স্বীকার করেনি। মূর্তিটি অন্যত্র অপসারিত হয়েছে। রাজারানীর অপূর্ব স্থাপত্য-ভাস্কর্য কোনভাবেই পরবর্তী যুগকে প্রভাবিত করেনি।

তা যদি সত্য হয় তবে বলব : 'রাজারানী' শব্দের উৎপত্তি 'রাজারানিয়া' প্রস্তর থেকে নয়। তার অর্থ অতি সহজ—এবং যা আপাতগ্রাহ্য। অর্থাৎ সংস্কারাচ্ছন্ন উত্তরকাল এই অনবদ্য দেউলটিকে অস্বীকার করে বলতে চেয়েছে—এটি একটি স্ত্রৈণ রাজা এবং তাঁর বিদেশিনী সহধর্মিণীর খেয়াল মাত্র। এ মন্দিরের নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যুক্ত হবে না ; এ শুধু : রাজারানী!

এবার মন্দিরটিকে দেখা যাক :

তিনদিকে তিন রাহাপাগে অর্ধস্তম্ভবেষ্টিত কুলুঙ্গিতে এককালে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিন পার্শ্ব-দেবতা। উত্তরে পার্বতী, দুপাশে কার্তিকেয় এবং



চিত্র—7·3 রাজারানীর বাস্তু-নকশা ও পার্শ্বদৃশ্য (ভুবনেশ্বর)।

গণেশ। তাঁরা অপসৃত। প্রায় দেড় মিটার উঁচু খুর-বিশিষ্ট পিষ্ঠের উপর মন্দিরের বাড় অংশে এবার

দেখছি, পূর্ণ পঞ্চ অঙ্গরূপ। পা-ভাগে পাঁচকাম—পাদ-কুম্ভ-পাটা-কাণি ও বসন্ত। তল-জঙ্ঘাতে আছেন অষ্টদিকপাল এবং অলসকন্যারা। তল-জঙ্ঘায় এক-একটি খোপে একটি করে স্থাণক মূর্তি। অষ্টদিক-পাল এবং অলসকন্যা। আগেই বলেছি, এই নায়িকা-দের অসংখ্য ভঙ্গিতে দেখতে পাবেন কলিঙ্গের দেব-দেউলে। কখনও প্রসাধনরতা—দর্পণে মুখ দেখছেন, সীমন্তে সিন্দুর দিচ্ছেন, চরণমঞ্জিরকে বন্ধনমুক্ত কর-ছেন ;—কখনও বা সন্তানকে আদর করছেন, স্তন্য-দান করছেন, আবার কখনও বা পোষা-পাখীকে আদর করছেন। শাল-রসাল-অশোক বৃক্ষের শাখায় হাত রেখে অলসপ্রহর যাপন করছেন কোন শালভঞ্জিকা রমণী, বুঝিবা কোন মিলনমধুর রাত্রির স্মৃতিচারণে ! এই নায়িকা মূর্তিগুলি অধিকাংশই সপ্ততালমূর্তি —কখনও আভঙ্গ, কখনও ত্রিভঙ্গ আবার কখনও বা অতিভঙ্গ মূর্ছনায় দণ্ডায়মানা। ভারতীয় নারী-মূর্তির সাধারণ ধর্ম অনুসারে এদের নিতম্ব গুরু, পয়োধর বর্তুলাকার, নয়নযুগল দীর্ঘায়ত এবং ওষ্ঠ-প্রান্তে লাজ-বিনম্র মধুর হাস্যরেখা। লক্ষণীয় এদের অলঙ্কারগুলি—সীমন্ত থেকে নূপুর প্রতিটি মূর্তির অলঙ্কারে প্রভেদ আছে ; যেন ভাস্কর নয়, স্বর্ণকারের দল খোদাই করেছেন মূর্তিগুলি। পর পর আটটি মূর্তি লক্ষ্য করে দেখলুম, আট জোড়া আর্মলেটের আট রকম প্যাটার্ণ। অলঙ্কারের বিষয়ে ওঁদের কোন ফ্যাশন ছিল না—প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্টাইল। শুধু কি অলঙ্কার ? কবরীবন্ধন রীতিতে প্রত্যেকে বিশিষ্ট। কিন্তু শুধু অলঙ্কার আর কবরী-বন্ধন রীতি দেখতেই যদি সময় নষ্ট করি তবে এই অলসকন্যাদের অপ্সরী-বিনিন্দিত যৌবনশোভা দেখব কখন ? আর তারও পরে তাদের যে ভাবব্যঞ্জনা —লাবণ্যযোজনা, তা উপলব্ধি করব কেমন করে ? কঠিন পাথরে যে তরলিত মুক্তাভা ফুটে উঠছে—যে পেলবতা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করব কীভাবে ?

এবার অষ্ট দিকপালের কথা বলি। এগুলি আছে প্রতিটি কোণাপাগের দুই প্রান্তে। চারটি কোণা-পাগে সর্বসমেত চার-দুকুনে আটটি অবস্থান। দক্ষিণ-দিক থেকে দেউলকে প্রদক্ষিণ করলে আমরা যথাক্রমে পাব :

(1) পূর্বদিক রক্ষক দেবরাজ ইন্দ্র—নিচে ঐরা-বত ; ইন্দ্রের এক হাতে বজ্র অপর হাতে অঙ্কুশ।

(2) দক্ষিণ-পূর্ব দিকপাল অগ্নি—পদতলে বাহন, মেষ—হাত দুটি ভেঙ্গে গেছে। শ্মশ্রুসমন্বিত অগ্নি-দেবের মধ্যদেশ কিঞ্চিত স্ফীত—পিছনে অগ্নিশিখা।

(3) দক্ষিণদিক রক্ষক—দণ্ড ও পাশধারী মহিষ-বাহন যম।

(4) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকপাল—নৈর্ঋতের এক হাতে তরবারি, অপর হস্তে কোনও পাপাত্মার ছিন্নমস্তক। পদতলে প্রলম্বিত এক অসুরমূর্তি।

(5) পশ্চিম দিকপতি বরুণের মূর্তিটিই সব-চেয়ে সুন্দর। বামহস্তে পাশ এবং দক্ষিণহস্তে বরদান করছেন। পদতলে বাহন—মকর।

(6) উত্তর-পশ্চিম দিকপাল বায়ুর হস্তে একটি পতাকা।

(7) উত্তরদিকের রক্ষক স্থূলকায় কুবেরের অব-স্থান সাতটি ধন-ঘড়ার উপর।

(8) উত্তর-পূর্ব দিকের ঈশান।

অষ্ট দিকপতি এবং একক অলসকন্যারা আছেন তল-জঙ্ঘায়। আটজন দিকপতি এবং ষোলোজন অলসকন্যা। এর উপরের অংশ বন্ধন কিন্তু 'তিন-কাম' নয়—'দুই-কাম' ; পরপর দুটি পাটা, তাতে নক্শা-কাটা। উপর-জঙ্ঘাতে দেখছি দিকপালদের উপরে মিথুন-মূর্তি ; অলসকন্যাদের উপরে পুন-রায় অলসকন্যা। খাঁজের ভিতর অংশে এবং অর্ধ-স্তম্ভের গায়ে গজ-বিরাল অথবা নর-বিরাল। বারান্দা অংশে সাতকাম—কাণি-পদ্ম-পাটা-পাটা-পাটা-পাটা-বসন্ত।

গণ্ডী-অংশের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। লক্ষণীয়, ঝাম্পান-সিংহ অনুপস্থিত। আমলকের নিচে চার-দিকে চারটি উপবিষ্ট বামনমূর্তি।

সম্মুখস্থ জগমোহন ত্রি-অঙ্গ, পঞ্চরথ, পীড় দেউল বা ভদ্র দেউল। উপরে মস্তকাংশের শাস্ত্রসম্মত ঘণ্টা, শ্রী ইত্যাদি অনুপস্থিত। বাড় অংশের অলঙ্করণ অতি সামান্য। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে রাহাপাগে পঞ্চস্তম্ভ শোভিত গবাক্ষ। জগমোহনের পূর্বদিকে একটি গজসিংহ রয়েছে—জানি না, সেটা আদিম রূপে ছিল, না পুরাতত্ত্ব বিভাগের আমদানি। জগমোহনের প্রবেশদ্বারের কারুকার্যটি লক্ষণীয়। দ্বারের দুই পাশে খাড়া অংশে (জ্যাম্ব অংশ) সর্বনিম্নে দুটি 'বিরাল'—তদুপরি দুই শৈব দ্বারপাল এবং তার উপরে দুটি লতার নক্শা। দ্বারের উপরের জ্যাম্ব-অংশে কেন্দ্রস্থলে গজলক্ষ্মীর মূর্তি। দ্বারের উপরের কড়িতে (লিণ্টেলে) নবগ্রহের মূর্তি। ভুব-নেশ্বরে অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তেশ্বর ছাড়া এই মন্দিরটিতেই শুধু জগমোহনের অভ্যন্তরভাগে মূর্তি ও নক্শা দেখতে পাবেন। □

অষ্টম পরিচ্ছেদ

খিচিঙ

[একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী]

নাগর স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কলিঙ্গ যেমন স্বকীয়তায় স্বতন্ত্র, ঠিক তেমনি কলিঙ্গ-রীতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খিচিঙ একটি অনবদ্য স্বকীয় শিল্পশৈলীর ধারক। ভৌগোলিক বিচারে খিচিঙ উড়িষ্যার অন্তর্গত। এর পূর্ব-নাম খিজ্জিঙ্গ অথবা খিজ্জিঙ্গকোট। একাদশ শতকের ভঞ্জরাজা রণভঞ্জ ও রাজভঞ্জের তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, 'খিচিঙ' ছিল তাঁদের রাজধানী।[1] ঐ রাজ-পরিবারের উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে এই অঞ্চলে একাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে তাঁদের গৌরবসূর্য ছিল মধ্যগগনে। শৈব-পাশুপত, শাক্ত এবং বৌদ্ধ শিল্পীর দল রাজানুগ্রহে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক অনবদ্য শৈলীর জন্ম দেন। বিগত শতাব্দীতে তদানীন্তন ময়ূরভঞ্জ নৃপতির আমন্ত্রণে বিশিষ্ট ভারতবিদ পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ এখানে খননকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত দেউল পুনর্নির্মিত হল ; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুরাকীর্তি ও ভাস্কর্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয়। এ জন্য ময়ূরভঞ্জরাজ এবং রমাপ্রসাদ আমাদের ধন্যবাদার্হ। কারণ তাঁদের ঐ প্রচেষ্টা ছাড়া উড়িষ্যা-শিল্পের একটি অনবদ্য নিদর্শন ইতিহাস থেকে মুছে যেত।

দেব-দেউলগুলির মধ্যে উল্লেখ্য—নীলকণ্ঠেশ্বর, খণ্ডিয়া দেউল এবং কুতাইতুণ্ডী। শেষোক্ত মন্দিরটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে রক্ষিত এবং সেখানে আজও নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। ঐ মন্দিরের অনতিদূরে একটি সংগ্রহশালা—সম্ভবত রমাপ্রসাদ চন্দের তত্ত্বাবধানে নির্মিত। সেখানে প্রায় চল্লিশটি ভাস্কর্য-নিদর্শন সংরক্ষিত।

ওড়িষ্যার পর্যটন বিভাগ থেকে খিচিঙের বিশেষ প্রচার করা হয় না। একটি মাত্র সরকারী যাত্রী-আবাস ছাড়া রাত্রিবাসের উপযুক্ত কোনও আশ্রয় নজরে পড়েনি। সরকারী রেস্ট-হাউসেও বিজলিবাতি ছিল না (নাকি সে-রাত্রে নিরবচ্ছিন্ন লোডশেডিং চলছিল, ঠিক মনে নেই !), শৌচাগার ছিল, পানীয় জলও পাওয়া যায়। পয়সা দিলে মোটামুটি ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হয়। টুরিস্ট-বাস দেখিনি—সাধারণ যাত্রীবাহী বাস-এ খিচিঙ-ভ্রমণ কষ্টকর। সাধারণ যাত্রী হয়তো হতাশ হবেন—কারণ কোনও আকাশচুম্বী দেউল বা অগণিত মন্দির এখানে নেই। কিন্তু ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ছাত্রদের কাছে খিচিঙ অবশ্য-দ্রষ্টব্য। কারণটা আগেই বলেছি : নাগর শিল্পে কলিঙ্গ যেমন স্বতন্ত্র, কলিঙ্গ-শিল্পে খিচিঙ ঠিক তেমনই একমেবাদ্বিতীয়ম্ !

খিচিঙ এই কারণেও বিশিষ্ট যে, এই শৈলী উড়িষ্যা ও পশ্চিমবাংলার স্থাপত্যের মাঝখানে একটি হাইফেন-চিহ্ন। আশ্চর্যের কথা পণ্ডিতপ্রবর নীহাররঞ্জন তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাসে' 'শিল্পকলা' অধ্যায়ে, যেখানে বঙ্গদেশের মন্দির-স্থাপত্য আলোচনা করেছেন সেখানে 'খিচিঙ' প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। বস্তুতঃ, তাঁর গ্রন্থের কোথাও 'খিচিঙ' শব্দটি আসেনি, থাকলে 'নির্ঘণ্টে' তার নির্দেশ পেতাম। তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন বাংলার রেখ বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝা যায়। স্পষ্টতই ইহারা লিঙ্গরাজ মন্দিরের পূর্ববর্তী।

তাহা ছাড়া, বাংলার মন্দিরগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়ে ; ওড়িষ্যার মন্দিরগুলির মতো এই মন্দিরগুলির কোন জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ কিছু নাই, আমলক সহ শিখর-শীর্ষ গর্ভগৃহই দেউলের একমাত্র অংগ ; অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখ দিকের দেওয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে। ওড়িষ্যার লিংগরাজ ও পরবর্তী মন্দিরগুলির ভূমি-নকশায় ও অলংকরণে যে বৈচিত্র্য ও জটিলতা তাহাও বাংলার মন্দিরগুলিতে নাই। বস্তুতঃ, বাংলার মন্দিরগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও খুব মার্জিত ও সংযত রুচির পরিচয় বহন করে।"[2]

নীহাররঞ্জন গৌড়ীয় মন্দির-স্থাপত্য-বিবর্তনের তৃতীয় স্তরের মন্দির, অর্থাৎ বর্ধমানের দেউলিয়া-মন্দির, বাঁকুড়া জেলার বহুলারা গ্রামের ইটের-তৈরী সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং দেহার গ্রামের সল্লেশ্বর মন্দির প্রভৃতির ভূমি-নক্শা, গর্ভগৃহ, শিখর ও অলঙ্করণ বিশ্লেষণ করতে বঙ্গীয় মন্দির-স্থাপত্যের সঙ্গে কলিঙ্গ-স্থাপত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে ঐ আলোচনা করেন। কিন্তু এই দুই শৈলীর যেটি যোগসূত্র—খিচিঙ শৈলী—তার উল্লেখ করেননি। কেন করেননি তা প্রণিধান করা শক্ত। কারণ নীহাররঞ্জনের গ্রন্থ-প্রকাশের অন্ততঃ সাত বছর পূর্বে পার্সি ব্রাউনের 'ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার' (বুদ্ধিস্ট অ্যান্ড হিন্দু পিরিয়ড) প্রকাশিত হয়েছিল ; এবং ব্রাউন স্পষ্ট করে এই দুই শৈলীর সংযোগ রেখাটির বিষয়ে পাঠককে অবহিত করেছিলেন, "Taking the first of these movements ('The Brahmanical Buildings of Bengal' from 8th to 17th centuries being the span of the three movements), that which found favour in the southernmost portion of the Bengal area, and was in some respects a provincial phase of the Orissa Schools, this may be studied at various places but principally in Mayurbhanj State, and in the Bengal districts of Bankura and Burdwan. In Mayurbhanj is the ancient site of Khiching, now a small village near the western portion of the State, but at one time comprising the capital of a principality, its ruined shrines and sikharas indicating that in the eleventh and twelfth centuries the Bhanja Rulers maintained a school of architecture and sculpture of no mean Order." [বাংলার দক্ষিণতম অঞ্চলে যে স্থাপত্যের প্রাথমিক চিন্তাধারা—যা উড়িষ্যা-স্থাপত্যের এক আঞ্চলিক বিকাশরূপে প্রতীয়মান, তা বাংলার বাঁকুড়া ও বর্ধমান মন্দিরে প্রতিফলিত। যোগসূত্রটি বিকশিত হয়েছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন নগর খিচিঙ-এ। এখন সেটি একটি নগণ্য গ্রামমাত্র, কিন্তু অতীতকালে সেটিই ছিল ঐ রাজ্যের রাজধানী। ঐ পরিত্যক্ত জনপদের দেবমূর্তি ও দেউল প্রমাণ দেয় যে, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানে এক শিল্পশৈলীর বিকাশ ঘটেছিল যা কোনক্রমেই উপেক্ষার নয়।]

নীহাররঞ্জন যেহেতু ঐ খিচিঙ-স্থাপত্যকে উপেক্ষা করেছেন তাই ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে গৌড়ীয়-স্থাপত্যের বৈপরীত্যটুকুই লক্ষ্য করেছেন। বাস্তবে জগমোহন বা ভোগমণ্ডপ বর্জনের নবীনত্ব গৌড়ীয়-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নয় ; সে বিপ্লবাত্মক চিন্তা-ধারার জন্য প্রশংসা প্রাপ্য খিচিঙের কোনও বিদ্রোহী স্থপতিবিদের।

খিচিঙ-শৈলী কী কারণে কলিঙ্গের মৌল স্থাপত্য-চিন্তাকে অস্বীকার করেছিল তার কোনও সদুত্তর ইতিহাস দিতে পারেনি। ভারতবিদ্ রমা-প্রসাদ চন্দ এই শৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলি নথীবদ্ধ করে-ছেন—কোথায় কোথায় উড়িষ্যা-শিল্পের মূলধারা থেকে সে বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে বিচ্যুত হয়েছে তা দেখিয়েছেন—কিন্তু কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য মানসিকতায় খিচিঙ-শৈলীর আদি-নিয়ামক এভাবে বিদ্রোহী হয়ে পড়েন তার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি।

আমরা রসপিপাসু, পণ্ডিত নই। তাই ইতি-হাসের সেই হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠাগুলি কল্পনায় পাদ-পূরণের অধিকার আমাদের আছে। ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নয়, কল্পনার জালবিস্তারে, রসের বিচারে। এই দেখুন—আপনাদের সঙ্গে এসব কথা বলতে বলতে আমার মাথাতে দু-একটি পোকা নড়ে উঠেছে! উড়িষ্যা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলো-চনার মূল ধারাটি থেকে সরে এসে একটা গল্প ফাঁদতে ইচ্ছে করছে। গল্পের প্লটটা যদি এই রকম হয়—

আমরা দেখেছি—না দেখিনি, অনুমান করেছি—রাজারানী মন্দিরের নির্মাতা জনৈক কলিঙ্গরাজ চাণ্ডিল্য-বংশের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করে এনে-ছিলেন। তারপর নববধূর 'নস্ট্যালজিকতা'র প্রতি নতি স্বীকার করে ভুবনেশ্বরে গড়ে তুলেছিলেন এক দেব-দেউল যা কলিঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যকে অস্বী-কার করে খাজুরাহো শৈলীর দিকে ঝুঁকেছিল। মহা-

রাজের দেহাবসানের পরে পুরোহিতেরা সেই শক্রেশ্বর শিবের মূর্তিটি অপসারিত করে মন্দিরটির অনবদ্য শিল্পকে উপেক্ষা তথা বর্জন করে। শক্রেশ্বর-দেউল হয়ে যায়—'রাজারানিয়া'। স্ত্রৈণ রাজা আর বিদেশী রানীর এক ছেলেখেলার সাক্ষী হয়ে সে অন্তেবাসী—এক ঘরে!

ধরা যাক সেই রাজারানীর দুটি সন্তান ছিল। যুবরাজ মন্দির-পুরোহিতদের এই সংকীর্ণ মনোভাবে এবং পরলোকগত পিতার অপমানে বিদ্রোহী হয়ে পড়েন! ঐ সঙ্গে কাহিনীতে একটু রোমাণ্টিক আবহাওয়া আনতে আমরা আরও মনে করতে পারি—পরলোকগত রাজা চাণ্ডিল্য-দেশ থেকে একটি অপূর্ব সুন্দরী দেবদাসীকেও এনেছিলেন, যে ছিল ঐ শক্রেশ্বর মন্দিরের হবু 'রুদ্রাণী', অর্থাৎ প্রধানা দেবদাসী। মন্দির পরিত্যক্ত হওয়ায় সেই অনিন্দ্যকান্তি দেবদাসীটিকে চাণ্ডিল্য রাজ্যে প্রত্যর্পণের প্রস্তাব ওঠে। এই সময় সেই বিদ্রোহী যুবরাজ মন্দির পুরোহিত ও দেউল-স্থপতিদের প্রতি বিরক্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যান—তাঁর অনুজকে কলিঙ্গের সিংহাসনে বসিয়ে। স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাবার সময় ঐ ভাগ্যতাড়িতা রাজনটীকেও নিয়ে যান। মনে করা যেতে পারে সেই যুবরাজই আদি খিচিঙকোটের প্রতিষ্ঠাতা। যেহেতু খিচিঙ-শৈলী রাজারানী দেউল নির্মাণের অব্যবহিত পরে স্ফুরিত হয়, তাই এ কাহিনীটি ইতিহাসকেও অতিক্রম করবে না।

কিন্তু এ জাতীয় কাহিনীর ভিতর একবার প্রবেশ করলে আমরা আর স্থাপত্য-ভাস্করের বাঁধা ছকে ফিরে আসতে পারব না। প্লটটা নিয়ে আপনারা মনগড়া কাহিনী রচনা করুন বরং।

স্থাপত্যের নিরিখে খিচিঙ-শৈলীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রতিটি মন্দিরই একক-দেউল ; জগমোহন বা মণ্ডপ নেই। এমনকি গর্ভগৃহের সম্মুখে ক্ষুদ্রায়তন অন্তরাল-এরও কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি। গর্ভগৃহের উপরে নির্মিত বিমানই একমাত্র মন্দির। পুণ্যার্থীকে মুক্ত নীলাকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দেবদর্শন করতে হয়। এজন্য খিচিঙে পীড়-দেউল নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—শাক্ত-মন্দিরে কাখর-দেউল গেঁথে তোলা হয়নি। শৈব-মন্দিরই হোক বা শাক্ত মন্দিরই হোক—একই জাতের একক রেখ-দেউল। তৃতীয়তঃ, ভুবনেশ্বরে বাড়-অংশ যেভাবে পাঁচ-কাম অথবা তিন-কামে ভাগ করা হয়েছে এখানে সেই ছন্দটিও মেনে চলা হয়নি।

মন্দিরের তিন মূল রাহাপাগে তিনটি পার্শ্ব-দেবতার নির্দিষ্ট আসনের ছন্দটি কিন্তু স্থপতি মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ উত্তরে পার্বতী, দক্ষিণে গণেশ



চিত্র—8·1 গঙ্গাদেবী, কুতাইতুণ্ডী প্রবেশদ্বারে, খিচিঙ।

এবং পশ্চিমে কার্ত্তিকেয়। বলা বাহুল্য, পূর্বমুখী মন্দির নির্মাণের শাস্ত্রীয় নির্দেশটিও মানা হয়েছে।

কিন্তু পার্শ্বদেবতাদের রূপারোপে খিচিঙ-ভাস্কর স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনটি মন্দিরের ভিতর কুতাইতুণ্ডী মন্দিরটিই সুরক্ষিত। ফলে সেটির বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দু-পাশে দুটি ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু অনবদ্য ভাস্কর্য। দক্ষিণ দিকে গঙ্গা এবং উত্তর দিকে যমুনা। দুটি মূর্তিই মকরবাহিনী—দ্বিভুজা, স্থাণক ও সমভঙ্গঠাম। সমতারক্ষার জন্য একে অপরের বিপরীত দিকে বাঁক নিয়েছেন। উভয়েরই এক হস্তে কেতকী-পুষ্প, অপর হস্তে মঙ্গলঘট বা পূর্ণ কলস। উপরে রাজছত্র (চিত্র—8.1-এ আঁকা হয়নি) যা, খিচিঙ-শৈলীর আর এক বৈশিষ্ট্য। রত্ন-যজ্ঞোপবীত, মুকুট, কণ্ঠহার, মণিবন্ধ, বাজুবন্ধ কিন্তু নূপুর নেই। কবরীবন্ধনরীতিতে স্বকীয়তা লক্ষণীয় —এখানে ভুবনেশ্বর-শৈলীর প্রভাব নেই। সবার চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য মায়ের মুখের হাসিটি। এখানেই বোধকরি খিচিঙ-ভাস্করের তুরুপের টেক্কা! ভুবনেশ্বর, পুরী এমন কি কোণার্কের নারীমূর্তিগুলিও হাসে, কিন্তু এখানকার মূর্তিগুলি—প্রায় প্রতিটি ভাস্কর্যে যেভাবে স্মিত হাস্যরেখায় অনবদ্য হয়ে ওঠে তা অতুলনীয়। মনে হয়, অন্তরের এক প্রশান্তির বহিঃ-



চিত্র—8.2 নৃত্যরত গণেশ, কুতাইতুণ্ডী পার্শ্বদেবতা, খিচিঙ।

প্রকাশ—যা ইন্দ্রিয়জ সুখানুভূতির পরিচায়ক নয়। প্রভেদটা যে কী, তা এঁকে বা লিখে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। সম্ভবতঃ তা বর্ণনা করাও যায় না। এমন কি আলোকচিত্রের সঙ্গে মূর্তি মিলিয়ে দেখেছি যে, ক্যামেরাতেও সেটা ধরা যায় না। ত্রিমাত্রিক স্নিগ্ধতা দ্বিমাত্রিক আলোকচিত্রে প্রস্ফুটিত হতে চায় না। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকৌশল 'হলোগ্রাফি'-তে তাকে হয়তো বন্দী করা যায়—ঠিক জানি না—তবে এটিকে ধরবার একটি প্রক্রিয়া দু-হাজার বছর আগে বাৎলে দিয়েছিলেন এক গ্রীক দার্শনিক। সে পথে অগ্রসর হবার পরামর্শ দিতে পারি আপনাদের—"There is no way of putting it into words. . .but after much communion and constant intercourse with the thing itself, suddenly like a light kindled from a leaping fire, it is born within the soul and henceforth nourishes." [কথায় তার বর্ণনা অসম্ভব...দীর্ঘ সময় তার সান্নিধ্যে থেকে, অবিরত আত্মিক-সঙ্গমে তার সঙ্গে একাত্ম হবার প্রচেষ্টায় তাকে পাওয়া যায় ; ঠিক যেভাবে লেলিহ-জিহ্ব অগ্নিশিখা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হঠাৎ প্রদীপ-শিখাকে চুম্বন করে আলোকিত করে তোলে—ঠিক তেমনিভাবে অকস্মাৎ অনুভূতির অন্তর্লীন মনোরাজ্যে তাকে লাভ করা যায়।][3]

যদি কখনো খিচিঙ যান, দার্শনিক প্লেটোর ঐ তত্ত্বটা অনুভব করবেন। এ প্রত্যক্ষ অনুভবের সম্পদ।

পশ্চিম রাহাপাগের পার্শ্বদেবতা কার্ত্তিকেয় প্রথানুযায়ী কুক্কুটশোভিত। এ ক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরের রীতি মোটামুটি মেনে চলা হয়েছে। প্রভেদ শুধু পুরুষমূর্তির হাসিটি।

কিন্তু দক্ষিণ রাহাপাগের পার্শ্বদেবতা গণেশ এক অতি অসাধারণ দুঃসাহসিক পরিকল্পনা : নৃত্যরত গণেশ (চিত্র—8.2)। গণেশমূর্তি রূপায়ণের যে দুটি শাস্ত্রসম্মত মূলধারা স্থাপত্যে স্বীকৃত এখানে শিল্পী তা স্পষ্টতই অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মানসপটে আছে চোল-শৈলীর বিশ্ববিখ্যাত তাণ্ডব নৃত্যরত শিব। কিন্তু এখানে তিনি সেই পরিকল্পনার নকল করেননি আদৌ। তাঞ্জোরের নটরাজ শিব অতিভঙ্গ মূর্ছনায়, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর দেহভার শুধুমাত্র বাম পদে রক্ষিত। এখানে গণেশ মূলতঃ ত্রিভঙ্গ মূর্তি, তিনি অষ্টভুজ এবং তাঁর দেহভার উভয় চরণেই ন্যস্ত। এখানে শিল্পীর দুঃসাহসিকতা আরও বেশি প্রকট হয়েছে এজন্য যে, তাঁর 'মডেল'-এর দেহাবয়ব নৃত্যের উপযোগী আদৌ নয়। অমন নায়ককে নৃত্যরত অবস্থায় গড়লে তাতে ভক্তিরসের পরিবর্তে কৌতুকরস

প্রস্ফুটিত হবার আশংকা! নটরাজের দেহসৌষ্ঠভ নৃত্যশিল্পীর উপযুক্ত—তাঁর কটিদেশ কৃশ, ঊর্ধ্বাঙ্গ গোমুখকাণ্ড, হস্তপদাদি ক্রীড়াবিদ্‌সুলভ, পেশীবহুল কিন্তু পেলব। অপরপক্ষে গণেশ স্ফীতোদর, খর্বকায়, তাঁর হস্তপদাদি স্থূলতার ইঙ্গিতবাহী। এতগুলি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শিল্পী নৃত্যরত গণেশ উৎকীর্ণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কারণ শৈল্পিক আনন্দে তিনি নিজেই মানসিকভাবে নৃত্যরত। তাই এ মূর্তিতে কৌতুকমিশ্রিত রসাভাস ঘটেনি একটুও। নৃত্যরত গণেশের যে স্ফূর্তি, যে আনন্দ, তাই আমাদের অভিভূত করে।

গণেশ উপরের দুটি হাতে ধনুকাকৃতি কিছু একটা ধরে আছেন। কী, তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা তাকে কার্মুখ বলে অনুমান করে নিতে পারি। বামদিকের দ্বিতীয় হস্তে অভয়, তৃতীয়ে লড্ডুকভাণ্ড, নিম্নতম হস্তে ভূমিস্পর্শ কুঠার। দক্ষিণ দিকের নিম্নতম হস্তে নৃত্যমুদ্রা, তারপরে কর্তিত গজদন্ত, পুষ্প এবং ধনুকের অপরাংশ। শুণ্ডটি নৃত্যছন্দে তরঙ্গায়িত—শেষ প্রান্তে একটি লড্ডুক। এমন নৃত্যরত গণেশ একটি দুর্লভ ভাস্কর্য। কুতাইতুণ্ডী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে একটি অষ্টভুজ নটরাজ মূর্তি। তার উপরে দুটি কুলুঙ্গি থেকে মূর্তি অপসারিত। উত্তর রাহাপাগের দশভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তিটি—আগেই বলেছি—আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহিষমর্দিনী। আমার সহযাত্রী প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীইন্দ্র দুগার দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছিলেন ঐ দেবীমূর্তিটি আঁকতে। সে সময় আমি অন্যান্য মূর্তির স্কেচ এঁকেছি এবং নোট নিয়েছি। সাত রাজ্য ঘুরে এসে ইন্দ্রদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হল?

উনি স্কেচ-খাতা বন্ধ করে বললেন, কিছুই হল না। পণ্ডশ্রম!

ওঁর হাত থেকে খাতাখানি নিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। আমার তো মনে হল দিব্যি হয়েছে। সে কথা বলায় উনি আমাকে ধমক দিলেন, আপনি ছবির কিছুই বোঝেন না!

স্বয়ং ইন্দ্র দুগার যখন এতটা সময় ব্যয় করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারলেন না, তখন আমি আর 'পণ্ডতরশ্রম' আদৌ করিনি। তাই সে অনবদ্য ভাস্কর্যের রেখা-চিত্র সংযোজন করা গেল না।

ঐ মহিষমর্দিনীর উপরে ছোট্ট একটি কুলুঙ্গিতে পুনরায় মহিষমর্দিনী। তার উপর শিবের মুখ।

পশ্চিম রাহাপাগেও পার্শ্বদেবতা কার্তিকেয়-মূর্তির উপরে পুনরায় কার্তিক। এবার তাঁর একজোড়া বাহন—মদ্দা ও মাদী ময়ূর। তার উপরে এবারেও শিবের মুখ সমন্বিত ভো।

এই ছন্দটি দক্ষিণ রাহাপাগেও মানা হয়েছে। অর্থাৎ নৃত্যরত গণেশের উপরেও একটি ছোট্ট অষ্টভুজ গণেশ—এবারে তা নৃত্যরত নয় এবং তার উপরে শিব-ভো।

তলজঙ্ঘায় আছে গোটা-দশেক সামনে-ফেরা গজ সিংহ। গণেশ মূর্তির দুপাশে দুটি করে; প্রবেশদ্বারের দিকে নেই; অন্য দুদিকে চারটি করে।



চিত্র—৪·৩ স্থানক গণেশ,
খিচিঙ সংগ্রহশালা।

কুতাইতুণ্ডী মন্দিরের শিখরে দশটি ভূমি এবং আমলক আছে। অনুরথপাগের দুদিকে দুটি করে নাগ-লতা, যার উপরে সপ্তফণাযুক্ত নাগ-দম্পতি।

এ মন্দিরে আমি সর্বমোট এগারোটি মিথুন-মূর্তি পেয়েছি। যুগল-মূর্তি—তিনটি; উত্তেজিত মিথুন—দুটি; শৃঙ্গাররত মিথুন—একটি; মৈথুনরত মিথুন—তিনটি এবং শেষ পর্যায়ের বিকৃতকাম মিথুন—দুটি। এ ছাড়া বারোটি নাগ-দম্পতি।

কুতাইতুন্ডী দেউলের দক্ষিণ-পশ্চিমে আন্দাজ পনের মিটার দূরত্বে চন্দ্রশেখরেশ্বর দেউল। পূর্ব-মুখী। একরথ। প্রবেশপথে দুটি স্থাণক চতুর্ভুজ শিব। প্রবেশদ্বারের উপর গজলক্ষ্মী। কোন পার্শ্ব-দেবতা বা মূল বিগ্রহ নেই।

এবার আসুন, আমরা সংগ্রহশালাটিতে প্রবেশ করি। আগেই বলেছি, মূর্তিগুলি এই পরিত্যক্ত জনপদের বিভিন্ন অংশ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত। মূর্তিগুলি ওজনে ভারী। উঁচু টেবিলের উপর যেভাবে সংরক্ষিত, তাতে মনে হয় না যে, সেগুলির স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং আমি যে পর্যায়ে মূর্তিগুলি দেখেছি, আপনি যদি কখনো যান সেই পর্যায়েই তাদের দেখবেন। পর্যায়ক্রমে মূর্তিগুলি উল্লেখ করার সময়ে বন্ধনী-যোগে তাদের আনুমানিক উচ্চতার উল্লেখও করেছি। চোখ-আন্দাজে। মূর্তিগুলির উচ্চতা সেণ্টিমিটারে প্রকাশিত :

1· ভক্তিমতী নারী (75)	...	বামহাতে পদ্ম। কর্ণাভরণটি বিচিত্র
2· ষড়ভুজা দুর্গা (75)	...	প্রস্ফুটিত পদ্মে উপবিষ্টা, পদতলে সিংহ
3· চতুর্ভুজ স্থাণক গণেশ (75)	...	আয়ুধ : রুদ্রাক্ষ, দন্তাগ্রভাগ, লড্ডুক, গদা
4· তারামূর্তি (75)	...	পরবর্তী যুগের, স্থূল শিল্প
5· চতুর্ভুজা ব্রহ্মাণী (75)	...	তিন মুখ, পদতলে হংস
6· চতুর্ভুজা বৈষ্ণবী (85)	...	শিশুক্রোড়ে, পদতলে গরুড়
7· চতুর্ভুজ মহেশ্বর (75)	...	দুই হস্তে পদ্ম
8· মহিষাসুরমর্দিনী	...	মূর্তিটি অপসারিত
9· নাগস্তম্ভ (120)	...	পাদপীঠে গজমূর্তি
10· ঐ ঐ	...	ঐ
11· দুটি স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ (90)	...	
12· চতুর্ভুজ স্থাণক গণেশ (150)	...	অপূর্ব মূর্তিটি (চিত্র—8·3)
13· উপবিষ্টা তারামূর্তি (45)	...	মুণ্ডহীন
14· মহিষমর্দিনী (70)	...	কুতাইতুন্ডী পার্শ্বদেবতার ব্যর্থ অনুকরণ
15· অর্ধনারীশ্বর (180)	...	চিত্র—8·4 দ্রষ্টব্য
16· স্থাণক পার্বতী (100)	...	মুখের একপাশ ভেঙে গেছে
17· স্থাণক চণ্ড (210)	...	চতুর্ভুজ, নিচে দুটি নায়িকা
18· হর (270)	...	প্রকাণ্ড শিবমূর্তি। দু-পাশে দুটি নায়িকা, বামদিকেরটি অতি সুন্দর। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, উপরে দুটি গন্ধর্ব। লিঙ্গপ্রকট।
19· প্রচণ্ড (210)	...	চিত্র—8·5 দ্রষ্টব্য
20· চতুর্ভুজ বীর গণেশ (90)	...	শুণ্ড দক্ষিণাবর্তে, আয়ুধ ; ত্রিশূল, লড্ডুক, পদ্ম, রুদ্রাক্ষ
21· সূর্য (100)	...	দ্বিভুজ, সপ্তাশ্ব, পদতলে অরুণ
22· দণ্ডায়মানা পার্বতী (150)	...	হাত ও পা ভেঙে গেছে
23· ধ্যানী বুদ্ধ (150)	...	
24· অবলোকিতেশ্বর	...	মূর্তির ঊর্ধ্বাঙ্গ ভগ্ন
25· নাগস্তম্ভ (120)	...	নং-9-এর অনুরূপ
26· বুদ্ধমূর্তি	...	ঊর্ধ্বাঙ্গ ভগ্ন
27· স্থাণক বিষ্ণু (100)	...	অতিসুন্দর ভাস্কর্য। খিচিঙ-হাস্য !
28· স্থাণক ঈশাণ (90)	...	অবক্ষয়ীযুগের নিকৃষ্টমান
29· কার্ত্তিকেয় (90)	...	অসমাপ্ত কাজ
30· ভক্তিমতী নারী (75)	...	নং-1-এর অনুরূপ

উপরে বর্ণিত মূর্তিগুলি সংগ্রহশালার কেন্দ্রীয় কক্ষে সংরক্ষিত। কিন্তু প্রবেশপথের দক্ষিণে আরও একটি কক্ষে পাশাপাশি চারটি অতি বৃহৎ হর-পার্বতী মূর্তি রাখা আছে। এই মূর্তিগুলি বর্ণনা করার পূর্বে মিথুন পর্যায়ে অনালোচিত আর একটি প্রসঙ্গের বিষয়ে কিছু বলা দরকার।



চিত্র—8.4 অর্ধনারীশ্বর
সংগ্রহশালা, খিচিঙ।

আমরা দেখেছি, কলিঙ্গ-ভাস্কর—বস্তুতঃ ভারত-ভাস্কর—মিথুন-মূর্তির ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত করে জীব-জন্তু এবং কল্পলোকের প্রাণীদের মধ্যেও নিয়ে গেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের মিথুন। কিন্তু দেব-দেবীর ক্ষেত্রে সচরাচর আমরা শুধু যুগল-মূর্তি পর্যায়ের মিথুনই দেখতে পাই। ক্বচিৎ কখনো উত্তেজিত দেব-মিথুন নজরে পড়লেও পরবর্তী পর্যায়ের ঘনিষ্ঠতর দেব-মিথুন একেবারে দেখাই যায় না।

পূর্বভারতে যে কয়টি দেবতাকে সস্ত্রীক উৎকীর্ণ করা হয় তাঁরা প্রায় আবশ্যিকভাবে যুগল-মূর্তি পর্যায়ের মিথুন। পরস্পরকে তাঁরা কদাচিত স্পর্শ করেন। রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী,—এমন কি কাব্যজগতে প্রেমের প্রতীক রাধাকৃষ্ণ মূর্তিও এই পর্যায়ের। একমাত্র ব্যতিক্রম : শিব-পার্বতী। অন্যান্য দেবদেবী পাশাপাশি বসেন ; শুধু পার্বতীকে দেখা যায় মহাদেবের বাম জানুর উপর উপবিষ্টা। শিব বাম হস্তে মাতৃমূর্তিকে আলিঙ্গন করে থাকেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে অন্যান্য দেবদেবীর এমন যৌথমূর্তি দেখেছি যেগুলিকে উত্তেজিত মিথুন পর্যায়ে ফেলা যায়। তারও পরবর্তী পর্যায়ের মিথুন



চিত্র—8.5 প্রচণ্ড
সংগ্রহশালা, খিচিঙ।

—শৃঙ্গার বা মৈথুনরত দেব-মিথুন গড়া হত না। আমি তো একটিমাত্র দেখেছি আমার অভিজ্ঞতায়—কুম্ভকোনামের নাগেশ্বর মন্দিরে এক সস্ত্রীক গণপতির মূর্তিতে।

গ্রীক সভ্যতায় দেবদেবীর যৌনাঙ্গ উৎকীর্ণ করায় ভাস্কর আপত্তির কিছু দেখেননি। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই সেখানে 'ফোব্‌স্‌' বা 'আফ্রোদিতে'-র নগ্নমূর্তি গড়া হয়েছে। সেই ট্রাডিশন অব্যাহতভাবে রোমক ও ইউরোপীয় শিল্পচিন্তায় প্রবাহিত হয়েছিল। ভেনাস, অ্যাপোলো, মার্কারি, প্রভৃতি সকলেই 'ন্যুড'। কিন্তু পশ্চিমখণ্ড সে কাজ করেছে বাস্তবতার খাতিরে, মদনানন্দের ইন্ধন জোগাতে নয়। স্মর্তব্য—ইউরোপখণ্ডে দেবতা ও দেবীদের পৃথকভাবে রূপায়ণের সময়েই তাঁদের 'ন্যুড'

রূপে গড়া হত। তাঁদের মিলনদৃশ্যগুলি নয়। এমনকি রেনেসাঁ যুগেও এই ধারণাটা বলবৎ ছিল। তখনো একক উপস্থাপনে দেব ও দেবীকে নগ্নাবস্থায় আঁকা বা গড়া হত ; কিন্তু তাঁদের মিলনদৃশ্যগুলিতে সাধারণত দেবদেবী বস্ত্রাচ্ছাদিত।

ভারতবর্ষে কিন্তু দেব ও দেবীমূর্তিকে কখনোই নগ্ন করে উৎকীর্ণ করা হত না। এমন কি সাধু-সন্তদেরও নগ্নমূর্তি পাওয়া যায় না,—দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রসঙ্গ অবশ্য বাদ দিয়ে বলছি। অর্থাৎ শিল্পের প্রয়োজনে নিরাবরণ দেব, দেবী, সাধু-সন্তদের উৎকীর্ণ করা হয়নি।

এই সাধারণভাবে স্বীকৃত রীতির একটিমাত্র ব্যতিক্রম : হর-পার্বতী।

একদল শিল্পীর মতে শিবমূর্তিতে লিঙ্গ উৎকীর্ণ না করার কোনও অর্থ হয় না। ঐ দেবতার প্রতীক-মূর্তির যে ব্যঞ্জনা তাতে দেবতাকে মনুষ্যাকৃতিতে কল্পনা করার সময়ে সেই ব্যঞ্জনাটি স্বীকার করতে হবে। বেশ বোঝা যায়, এ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি ভারতীয় ভাস্কর। যুগে



চিত্র—8·6 শিব-পার্বতী পরশুরামেশ্বর, ভুবনেশ্বর।

যুগে এই প্রশ্নটি উঠেছে এবং স্থানীয় শিল্পগুরুরা যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ভাবেই শিবমূর্তি নির্মিত হয়েছে। পুনরুক্তি দোষ সত্ত্বেও আবার বলব, একমাত্র শিব ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার মূর্তি গঠনের প্রসঙ্গে এ জাতীয় বিতর্কের কোন অবকাশ কোন যুগেই ছিল না।

আমরা এখানে পাশাপাশি কয়েকটি শিব-পার্বতী মূর্তি উপস্থাপিত করছি।

চিত্র—8·6 এবং চিত্র—8·7 দুটিই পরশুরামেশ্বর মন্দির থেকে সংগৃহীত। একই কালে, একই স্থানে দুটি ভাস্কর দেখা যাচ্ছে দুটি দলের। প্রথমটিতে পার্বতী বসেছেন শিবের পাশে, এবং শিবের পরিধানে বস্ত্র। দ্বিতীয়টিতে পার্বতী শিবের বামজানুর উপর উপবিষ্টা এবং মহাদেবমূর্তিতে লিঙ্গটি উৎকীর্ণ করা। পরশুরামেশ্বর মন্দিরের এই শৃঙ্গাররত মিথুন পর্যায়ের মূর্তিটি (চিত্র—8·7) কোনও ব্যতিক্রম নয় : এ ধারণাটি সমান্তরালে যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ বৈতাল দেউলের কেন্দ্রীয় অবস্থানে একটি নটরাজ-ভো। সেই নৃত্যরত শিবের পুরুষাঙ্গটি ভাস্কর নিখুঁত করে গড়েছেন। যদিচ ঐ বৈতাল দেউলে আরও দু-একটি শিবমূর্তি আছে, যেখানে এ জাতীয় চিন্তা করা হয়নি।



চিত্র—8·7 শিব-পার্বতী পরশুরামেশ্বর, ভুবনেশ্বর।

কলিঙ্গ ভাস্কর্যের পরবর্তী যুগে—ব্রহ্মেশ্বর, লিঙ্গরাজ বা অনন্তবাসুদেব দেউলে প্রকটিত-লিঙ্গ শিবমূর্তি আমি খুঁজে পাইনি। মনে হয়, ক্রমশঃ মানবদেহধারী শিবমূর্তির ক্ষেত্রে মানবিক শালীনতা বোধ থাকা বাঞ্ছনীয়—এই মতটি দৃঢ়মূল হতে থাকে। এজন্য খাজুরাহো এবং কোণার্কে—পূর্ব-ভারতের যে দুটি ক্ষেত্রকে যৌনতা এবং তথাকথিত অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়—আমরা

একটিও শিবমূর্তিকে মানবিক শালীনতা বর্জিত বা নাগাসাধুর বেশে দেখতে পাই না। খাজুরাহোর একটি হর-পার্বতী মূর্তি উদাহরণ হিসাবে চিত্র—৪.৪-এ সংযোজন করে দেওয়া গেল।



চিত্র—৪.৪ হর-পার্বতী, খাজুরাহো।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার বলি খিচিঙ-শৈলী এক দুর্লভ ব্যতিক্রম। ততদিনে ভারতবর্ষ বস্তুতঃ মেনে নিয়েছে যে, মহাদেব যখন মানবদেহধারী তখন তাঁকে মানবিক শালীনতাবোধের ভিতরেই রূপায়িত করতে হবে। খিচিঙ তা মানেনি। প্রায় প্রত্যেকটি শিব-মূর্তিতে লিঙ্গটি উৎকীর্ণ করা। মন্দিরগাত্রে মূর্তি-গুলি ছোট ছোট, তাই হয় তো নজরে পড়ে না। কিন্তু সংগ্রহশালার প্রবেশপথের দক্ষিণে যে ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটি আছে, সেখানকার চারটি অতি প্রকাণ্ড হর-পার্বতী মূর্তিতে এটি অধিকভাবে প্রকট। শিব সেখানে চতুর্ভুজ। আয়ুধনিচয় : ত্রিশূল, জননী-মূর্তির বামস্তন, মায়ের চিবুক ও প্রস্ফুটিত পদ্ম।



চিত্র—৪.৯ হর-পার্বতী, খিচিঙ সংগ্রহশালা।

শিবের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম এবং কটি দেশে রত্নমেখলাও আছে। চারটি ভাস্কর্যই অতি অপূর্ব। স্বাভাবিক নর-নারীর তুলনায় মূর্তিগুলি বৃহত্তর। মাতৃমূর্তি দ্বিভুজা। দক্ষিণহস্ত মহাদেবের স্কন্ধে। বামহস্তে দর্পণ।

জানিনা—শিবমূর্তির এই বিচিত্র পরিকল্পনার জন্যই এই অতি উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য নিদর্শন চারটিকে কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালায় স্থান দেওয়া হয়নি কি না।

সংক্ষেপে, খিচিঙ অনবদ্য, একক এবং অনন্য। □

নবম পরিচ্ছেদ

শেষ হিন্দুযুগ

[দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাব্দী]

খিচিঙ পরিদর্শন শেষে, আসুন আবার ভুবনেশ্বরে ফিরে যাওয়া যাক।

মুক্তেশ্বর থেকে রাজারানী পরিক্রমা শেষ করে আমরা সে পরিচ্ছেদে উপনীত হয়েছিলাম শেষ হিন্দু-যুগে। এই শেষ হিন্দুযুগে আমাদের দ্রষ্টব্য তিনটি ভারতবিখ্যাত দেউল : লিঙ্গরাজ, পুরী ও কোণার্ক। কিন্তু শেষ দুটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের জন্য দুটি পৃথক পরিচ্ছেদ রচিত হওয়া উচিত। এজন্য বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা শুধু ভুবনেশ্বরে অবস্থিত লিঙ্গরাজ ও অনন্তবাসুদেব মন্দির দুটি আলোচনা করব।

উড়িষ্যার সিংহাসনে কেশরীবংশের শেষ অপুত্রক রাজার দেহান্তে গঙ্গবংশের প্রথম নৃপতি চোড়-গঙ্গদেব নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। উড়িষ্যা রাজ্য মুসলমান অধিকারে চলে যাওয়া পর্যন্ত এই গঙ্গবংশ ছিলেন কলিঙ্গরাজ। আলোচ্য সময়কালের পর্বেই কলিঙ্গের পূর্বপ্রান্তে বঙ্গদেশে পালরাজাদের যুগ শেষ হয়েছে, বঙ্গদেশের সিংহাসনে দিল্লীশ্বরের করদ নবাবেরা অধিষ্ঠিত। দক্ষিণে চালুক্য-স্থপতির আইহোল, বাদামী, পাট্টাদাকলের অপূর্ব শিল্পসম্ভার এতদিনে চার-পাঁচ শতাব্দীর পুরাতন স্থাপত্যকীর্তি —পহ্লবদের মহাবলীপুরম্ (600-900 খ্রীঃ) সমাপ্ত ; চোলবংশীদের তাঞ্জোর ও কুম্ভকোনামের (900-1150 খ্রীঃ) মন্দিরগুলি সদ্যসমাপ্ত অথবা প্রায় সমকালীন। উত্তরখণ্ডে নাগর-স্থাপত্যের অপর অংশীদার খাজুরাহোর দেউলগুলি (950-1050 খ্রীঃ) শেষ করে চাণ্ডিল্য রাজাদের ক্ষমতা অস্তমিত। রাজপুতানা, গুজরাট এবং মথুরার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। কলিঙ্গে এই শেষ হিন্দুযুগের সমসাময়িক স্থাপত্য বিকাশের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দেখা যাচ্ছে—হালেবিড এবং বিজয়নগরে। এই পটভূমিতে মন্দিরগুলি দেখতে হবে।

বৃহত্তর ভারতের এই স্থাপত্যস্ফুরণের পট-ভূমিতে বিচার করতে বসে দেখছি, কলিঙ্গ তার স্বকীয়তা এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই নূতন নূতন স্থাপত্যবিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। লিঙ্গরাজ থেকে অনন্তবাসুদেব, পুরী থেকে কোণার্ক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবর্তনের প্রভাব লক্ষ-ণীয় ; কিন্তু তা কলিঙ্গরীতিকে অতিক্রম করে নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদে ইতিহাসকে আমরা ছেড়ে এসেছি ভৌমকরদের অবসান যুগে। কলিঙ্গে এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল সোমবংশীয় রাজন্যবর্গ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত কেশরী বংশ। কেশরীরা তিন-চার শ' বছর রাজ্যশাসন করেন এবং কেশরী-বংশের শেষ অপুত্রক রাজার দেহাবসানে চোড়গঙ্গ-দেবের উদ্যোগে কলিঙ্গ-সিংহাসনে এসে অধিষ্ঠিত হলেন গঙ্গবংশ।

লিঙ্গরাজ মন্দির :

ভুবনেশ্বরে দীর্ঘ চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে মন্দির-স্থাপত্যের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার শেষ পরিণতি এই লিঙ্গরাজ দেউল। কী আকার-আয়তন, কী স্থাপত্য, কী ভাস্কর্য—সব পরীক্ষায় ভুবনেশ্বর-শিল্পী এখানে তাঁর চরম সাফল্যের পরি-চয় দিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে শুধু উড়িষ্যারই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই মন্দিরটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ-সারির দেব-দেউল। শ্রেষ্ঠত্ব তার পরিকল্পনায়, আয়-তনে, উচ্চতায় এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকৃতিতে।

কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায় যথারীতিতে চার দেউল : বিমান, জগমোহন, নাট-মন্দির ও ভোগমণ্ডপ। বেশ বোঝা যায়, সবগুলি সমকালীন নয়। মূল গর্ভ-গৃহের উপর একটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির বোধকরি প্রথম নির্মাণ করেছিলেন গৌড়াধিপতি শশাঙ্কদেব। কারণ বিভিন্ন পুরাণে তাঁকে একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) ত্রিভুবনেশ্বর মন্দিরের নির্মাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই আদি ত্রিভুনেশ্বর বিগ্রহটিই হচ্ছে লিঙ্গরাজের গর্ভমন্দিরস্থিত অনাদি-লিঙ্গ। এমন অনুমান করার অনেকগুলি যুক্তি। প্রথম কথা, পুরাণ-অনুসারে শশাঙ্কদেব নাকি কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি ; স্বয়ম্ভু প্রস্তরখণ্ডকেই শিবলিঙ্গ বলে চিহ্নিত করেন। ভুবনেশ্বরে এই লিঙ্গরাজেই আছে তেমনি স্বয়ম্ভু লিঙ্গ—যেমন আছে কাশীর কেদারে, অথবা হিমালয়ের কেদারতীর্থে। দ্বিতীয়তঃ, শশাঙ্কদেবের মন্দিরটিকে এত সম্মান দেওয়া হয়েছে যে, অন্য কোনও ক্ষুদ্র মন্দিরকে ত্রিভুবনেশ্বর বলে চিহ্নিত করতে সংকোচ হয়। ফলে অনুমান করা যায়, শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত মূল দেউলটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হলে কোনও পরবর্তী কলিঙ্গরাজ—সম্ভবতঃ কেশরীবংশীয় কোন নৃপতি সেটি পুন-নির্মাণ করেন। ক্রমে তার সঙ্গে জগমোহন, নাট-মন্দির ইত্যাদি যুক্ত হয়।

বর্তমানে মন্দির-চত্বর প্রকাণ্ড—158 মিঃ×142 মিঃ মাপের আয়তক্ষেত্র। সমস্ত মন্দির-চত্বর উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। চিত্র—9.1-এ তার বাস্তু-নক্শা দাখিল করা গেছে। লক্ষণীয়, চারটি দেউলের কেন্দ্রস্থ কক্ষ বর্গক্ষেত্র এবং তারা বড়-দেউল থেকে ভোগমণ্ডপের দিকে আকারে ক্রমবর্ধমান। অথচ উচ্চতার বিচারে বড়-দেউল থেকে ভোগমণ্ডপে দেউল ক্রমশঃ ছোট হয়েছে। মন্দির-চত্বরে শতাধিক ছোট-বড় দেব-দেউল। প্রাচীরের তিনদিকে তিনটি প্রবেশদ্বার—তার ভিতর পূর্বদ্বারই প্রধান প্রবেশদ্বার। মন্দিরটি ঠিক পূর্বাভিমুখী নয় ; দক্ষিণদিকে 18° সরে আছে কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা। তার তাৎপর্যটি আমি বুঝে উঠ্তে পারিনি। হিসাবমতো আন্দাজ বারই জানু-য়ারী সূর্য বর্তমানে ঐ কেন্দ্রীয় অক্ষরেখা বরাবর উদয় হন। চত্বরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি ভেট-মণ্ডপ, যার উপর রথযাত্রার দিন বিকল্প আর একটি মূর্তির সম্বর্ধনা করা হয়। পূর্বদিকের মূল সিংহদ্বারে দুটি সিংহমূর্তি। কয়েকটি ধাপ অতি-ক্রম করে প্রথমে কিছু নিচে নামতে হবে। এটাই সে আমলের ভূমি-সমতল। তারপর পুনরায় ধাপ বেয়ে উপরে উঠ্তে হবে।

মূল রেখ-দেউলটির উচ্চতা 54.8 মিটার অথবা প্রায় 188 ফুট। পরিকল্পনা—পঞ্চরথ দেউলের। পঞ্চ অঙ্গ। বাড় অংশের মাপ 13.25 মিঃ। তার পরিচয় নিম্নোক্ত প্রকারের :

বরাণ্ড......দশকাম ...	3.35 মিঃ
উপর-জঙ্ঘা...(কাখরমুণ্ড ও কুলুঙ্গি)	2.81 "
বন্ধন (পাটা-কাণি-বসন্ত) তিনকাম	0.91 "
তল-জঙ্ঘা......(কুলুঙ্গি) ...	3.00 "
পা-ভাগ (পাদ-কুমুদ-কুম্ভ-কাণি-বসন্ত) পাঁচকাম ...	3.18 "
	13.25 মিঃ

তল-জঙ্ঘাতে রাজারানীর মতো কাখরমুণ্ডি। কুলুঙ্গিতে অষ্টদিকপালের মূর্তি। কোথায় কোনটি আছে তা চিত্র—9.1-এ দেখতে পাবেন। এ-ছাড়া অসংখ্য অলসকন্যা, মিথুন ও দেবমূর্তিতে বাড় অংশ পরিকীর্ণ। নানান জাতের গজ-বিরাল, নর-বিরাল, গন্ধর্ব, কিন্নর, ঋষি ও দেবমূর্তিতে মন্দিরের গায়ে বিচিত্র শোভা। উপর-জঙ্ঘাতে দেবমূর্তি-গুলিকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হবে না। রাজা-রানী বা বৈতালের মত এ মন্দির নির্জন নয়—পাণ্ডাই আপনাকে চিনিয়ে দেবে, যদি সন্দেহ থাকে। উপর-জঙ্ঘা অংশে কাখর মুণ্ডি ; কুলুঙ্গিতে আছেন—সূর্য, গণেশ, কার্ত্তিক, পার্বতী, অর্ধনারীশ্বর, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি। অলসকন্যাদের ভঙ্গিগুলিও রাজারানী মন্দিরে বর্ণিত মূর্তির অনুরূপ। কয়েকটির রূপ-মাধুর্য অপরূপ। দুটি ক্ষেত্রে খাঁজের মধ্যে দুটি অপূর্ব মূর্তি স্বতঃই দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায়—স্থানীয় পাণ্ডাকে বলে রাখলে সে আপনাকে দেখিয়ে দেবে।

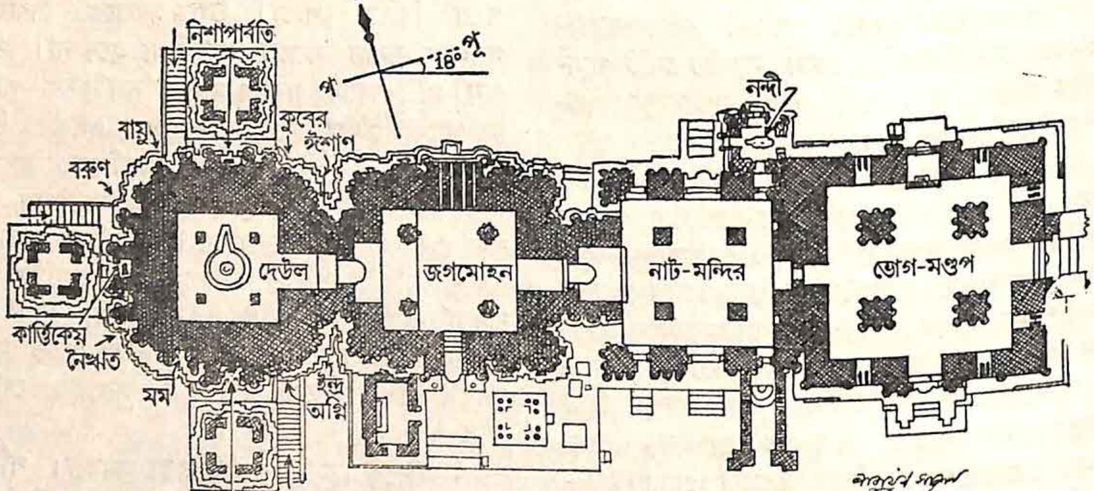
তিনদিকে তিনটি পার্শ্বদেবতা অনবদ্য। পশ্চিম-রাহাপাগের কুলুঙ্গিতে বৃহদায়তন কার্ত্তিকেয়র মূর্তি। দক্ষিণ পদতলে ময়ূরের মুণ্ডটি ভেঙ্গে গেছে। দু পাশে দুই সহ-দেবতা। উপরে উড্ডীয়-মান দুই গন্ধর্ব এবং সর্বোপরি কীর্তিমুখ। কার্ত্তি-কের পোশাক, অলংকার এবং মুখভঙ্গি অনবদ্য। উত্তরদিকের পার্শ্বদেবী চতুর্ভুজা নিশা-পার্বতীর স্থাণক মূর্তি—পদতলে পদ্ম এবং তার নিচে ঊর্ধ্ব-মুখ একটি সিংহ। এ মূর্তির কাপড়ের সূক্ষ্ম কারুকার্য খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করার জিনিস। আগেই বলেছি, দেবীর শুধুমাত্র বাম চরণে নূপুর আছে—দক্ষিণ চরণে নাই, অথচ পার্বতীর সঙ্গিনী

এবং অন্য সমস্ত স্ত্রী-মূর্তির হয় দুই পায়েই নূপুর আছে, অথবা কোন পায়েই নাই। দক্ষিণদিকের রাহাপাগে দণ্ডায়মান গণেশ—চতুর্ভুজ! সেটিও অপূর্ব (চিত্র—5·8)।

অন্যান্য মূর্তির মধ্যে দুটি দৃশ্য বেশ মন মাতায়। জগমোহনের দক্ষিণ দ্বারের কাছে আছে শিবের বিবাহ দৃশ্য। 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন'। শিল্পীর সূক্ষ্ম রসজ্ঞান লক্ষ্য করার মত—শিবের মাথায় তিনি টোপর পরিয়েছেন, ওদিকে ভোলানাথ যে দিগম্বরই রয়ে গেছেন সে খেয়াল তাঁর নেই। পার্বতীকে অগ্নির কাছে অগ্রসর হতে দেখছি। ব্রহ্মাও উপস্থিত। অন্যান্য দেবতাদেরও সনাক্ত করা যায় তাঁদের আয়ুধ এবং বাহন দেখে। দুঃখের কথা, মন্দির কর্তৃপক্ষ মেরামতের নামে আধুনিক রঙ মাখিয়ে মূর্তিগুলিকে সঙ সাজিয়েছেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্যানেলটি দেখতে পাবেন বিমানের দক্ষিণ প্রান্তদেশে। মা যশোদা দধিমন্থন করছেন—যশোদার অঞ্চল

তিনটি সিংহ মূর্তি। লক্ষ্য করে দেখুন, এই সিংহের সামনের দুপায়ের মধ্যে বাঁ পা মাটিতে এবং ডান পা থাবাতোলা অবস্থায়। এই জাতীয় অলঙ্করণের নাম ঝাম্পা-সিংহ বা ঝাম্পান-সিংহ। লিঙ্গরাজে এবং পরবর্তী যুগের রেখ-দেউলে এই সমতলে মন্দিরের তিন রাহাপাগে তিনটি ঝাম্পা-সিংহ দেখতে পাবেন। শুধু মাত্র পূর্বদিকের রাহাপাগে অর্থাৎ জগমোহনের দিকে দেখবেন আরও উঁচুতে—লিঙ্গরাজের ক্ষেত্রে সপ্তম ভূমি-আমলকের সমতলে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি সিংহ মূর্তি। তার পদতলে আছে একটি হস্তী,—দুই থাবা শূন্যে তুলে সে যেন ঝাঁপ দিচ্ছে ;—এই অলঙ্করণটির নাম উড়-গজ সিংহ।

গণ্ডী-অংশের রাহাপাগের কথা বলেছি ; কোণাপাগ বিভিন্ন ভূমিতে ভাগ করা। লিঙ্গরাজ মন্দিরের প্রত্যেকটি কোণাপাগে সর্বসমেত দশটি ভূমি ও দশটি ভূমি-আমলক আছে। অনুরথপাগের গঠন বৈচিত্র্য আবার অন্য ধরনের। সেখানে দেখছি চারটি



চিত্র—9·1 লিঙ্গরাজ মন্দিরের ভূমি-নক্শা, ভুবনেশ্বর।

হাওয়ায় উড়ছে, নন্দ বসে আছেন গালে হাত দিয়ে সম্মুখস্থ দু-চালা কুঁড়েঘরে। আর দিগম্বর বালকৃষ্ণ কলসের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ননী চুরি করে খাচ্ছেন।

গণ্ডী-অংশে দেখছি রাহাপাগ ভূমি-আমলকে ভাগ করা নয়—ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে—দ্বিতীয় ভূমির সমতলে তিন পার্শ্বদেবতার উপর

ক্ষুদ্রায়তন রেখ-দেউল মাথায় মাথায় বসানো। প্রতিটি ক্ষুদ্রায়তন রেখ-দেউল স্বয়ংসম্পূর্ণ ; এমন কি তাদের রাহাপাগে পার্শ্বদেবতাও আছেন।

বিসম-সমতলে এবার আর বামন নয়—চার কোণাপাগের উপর চারটি সিংহ এবং চার রাহাপাগে চার দেবমূর্তি।

জগমোহনটি পঞ্চরথ পীড় দেউল। এবার দেখছি,

চারটি স্তম্ভ আমদানি করা হয়েছে। উড়িষ্যা-স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্তম্ভের অনুপস্থিতি ; কিন্তু মন্দিরের আকার বৃদ্ধি করতে করতে লিঙ্গরাজে উপনীত হয়ে এবার বাস্তুবিদ স্তম্ভের আমদানি করতে বাধ্য হয়েছেন। নাটমন্দিরেও চারটি স্তম্ভ আছে, সেটিও পীড় দেউল ; কিন্তু ঘণ্টা-কলস ইত্যাদি সেখানে অনুপস্থিত। তার পরের দেউল ভোগমণ্ডপে কিন্তু আবার ঘণ্টা-কলস ইত্যাদি বসানো হয়েছে। জগমোহনেও দেখছি ঝাম্পা-সিংহ আছে চার প্রান্তে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সভয়ে নিবেদন করব। সভয়ে বলছি এ জন্য যে, ইতিপূর্বে যে-সব পণ্ডিতেরা কলিঙ্গ-ভাস্কর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে তাঁদের কোন মতামত অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি।

শিল্পী সচরাচর দুনিয়ায় যা দেখেন কল্পনায় তাঁরই উপর রঙ চড়ান এবং শিল্পে তাই ফুটে ওঠে। সাপ, হাতী আর বৃষ তাই ভারতীয় চিত্রে এবং ভাস্কর্যে বারে বারে উপস্থিত হয়েছে। আসিরীয় এবং মিশরী শিল্পীর দল তাই বারে বারে সিংহ মূর্তি রূপায়িত করেছেন—রোমান শিল্পে তাই অশ্বের প্রাবল্য। কলিঙ্গ শিল্পী যখন সাপ আর হাতী নিয়ে মাতামাতি করেন তখন তার কারণটা অনুধাবন করতে পারি ; কিন্তু কলিঙ্গ ভাস্কর্যে সিংহের এত প্রাবল্য কেন? কলিঙ্গের বাইরে এমনকি গিরনার স্থাপত্যেও কিন্তু এত সিংহ নেই! ভারতীয় প্রাচীন চিত্রে সিংহ নেই বললেই হয়। অজন্তায় বাঘ-সিংহের চিত্র অতি অল্প। তাহলে এখানে এত সিংহ এল কোথা থেকে? আমার ব্যক্তিগত ধারণা ময়ূর যেমন মৌর্য বংশের প্রতীক, তেমনি কেশরী বংশ কলিঙ্গে সিংহের আমদানি করেন। লক্ষ্য করে দেখছি, প্রাক-কেশরী যুগে—ভরতেশ্বরে, শত্রুঘ্নেশ্বরে, পরশুরামেশ্বরে, বৈতালে সিংহ মূর্তি দুর্লভ ; কিন্তু কেশরী বংশের আগমনের পরেই এল ঝাম্পা-সিংহ এবং উড়-গজ সিংহ। এই প্রসঙ্গে আরও মনে হয় ভৌমকরদের প্রতীক কি হাতী? না হলে হস্তীকে কেন বারে বারে দেখছি সিংহের দ্বারা পরাস্ত হতে?

অনেক গাইড ও পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা হিসাবে বলতে শুনেছি—এমনকি কোন কোনও গ্রন্থেও দেখেছি—হস্তী হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের প্রতীক, যেহেতু বুদ্ধদেব শ্বেত-হস্তীর রূপে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন, এবং সিংহ নাকি হিন্দুধর্মের প্রতীক (হেতুটা উহ্য), তাই বৌদ্ধধর্মের অপসারণের পরে হিন্দুধর্মের বিজয়-চিহ্নরূপে এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল। আমি তা মানি না। আমাদের যুক্তি—অষ্টম শতাব্দীর পরে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের পুরীধামে গোবর্ধন-মঠ প্রতিষ্ঠার পরে, এই বৈরীভাব আদৌ ছিল না। বুদ্ধদেব ততদিনে বিষ্ণুর নবম-অবতাররূপে স্বীকৃত। মুক্তেশ্বরেই এ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তাই আমার মতে—হস্তী ভৌমকদের প্রতীক, হয়তো ঐ আদিবাসী সম্প্রদায় হস্তিব্যবসায়ী ছিল এবং সিংহ কেশরী বংশের প্রতীক। এই পরিকল্পনাটি কেশরী বংশের পতনের পর গঙ্গবংশের যুগেও 'মোটিফ্' হিসাবে প্রচলিত ছিল।

অনন্তবাসুদেব :

বিন্দুসরোবরের পাশে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরটি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু মন্দির। কপিল সংহিতায় বলা হয়েছে, অনন্ত এবং বাসুদেব উভয়ে বারানসীক্ষেত্র থেকে মহাদেবকে একাম্রকাননে, অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন। যে মহাদেবের মহিমা মহাজ্ঞানী প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারেন না, অন্য দেবতারা তাঁর স্বরূপ অনুধাবন আর কেমন করে করবেন :

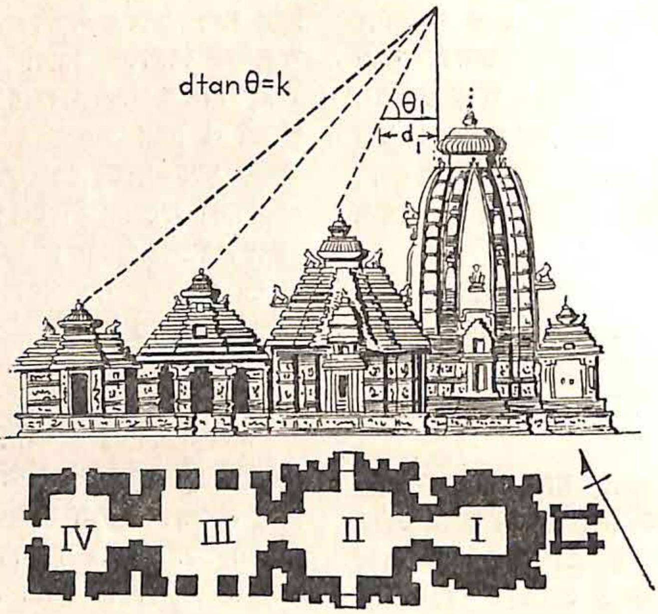
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীনেকাকী বিজনে বনে॥
তৎস্থানং পরমং গুহ্যং জ্ঞানাদাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা॥[1]

বিন্দুসরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই মন্দিরেরও চারটি অংশ : বিমান, জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ। প্রথমটি রেখ-দেউল, বাকি তিনটি পীড় দেউল। বিমানে পুরী মন্দিরের সেই চিরন্তন ত্রয়ী। বলরামের মস্তকের উপর অনন্তনাগের বহুশিরোমণ্ডিত ফণা ছত্ররূপ শোভা পাচ্ছে। পুণ্যার্থীরা বিন্দুসরোবরে অবগাহন করে প্রথমে অনন্তবাসুদেব মন্দিরে পূজা দেন এবং তারপর ত্রিভুবনেশ্বর বা লিঙ্গরাজ মন্দির দর্শন করতে যান।

কেউ কেউ বলেছেন, এ মন্দির লিঙ্গরাজের অন্ধ অনুকরণ এবং এখানে কলিঙ্গ স্থপতি কোনও মৌলিকতার পরিচয় দেননি। আমাদের তা আদৌ মনে হয়নি। লিঙ্গরাজ নিঃসন্দেহে ভুবনেশ্বর মন্দির-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শেষ কথা। কিন্তু অনন্তবাসুদেব তার অন্ধ অনুকরণ নয়। মন্দিরের বিভিন্ন অংশের ভাগ ও অলঙ্করণে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নেই। লিঙ্গরাজ মন্দিরের সঙ্গে অনন্তবাসুদেবের

দেউল চিত্রটি (চিত্র—9·2) মিলিয়ে দেখলে মনে হবে পরিকল্পনা বুঝি একই ধরনের।

দেউল তিনটির পার্শ্বরেখা ঊর্ধ্বদেশে বর্ধিত করে সে ছন্দের সূত্রটি আমরা পেয়েছি—দেখেছি প্রতিটি



চিত্র—9·2 অনন্তবাসুদেব

I—ভোগমণ্ডপ
II—নাটমন্দির
III—জগমোহন
IV—বিমান (বড়-দেউল)

পার্থক্যটা সেখানে নয়। পার্থক্য—চারটি মন্দিরের গণ্ডী-অংশের পরিকল্পনায়। লিঙ্গরাজে ভোগমণ্ডপের অপেক্ষা নাটমন্দির উচ্চতায় কম ; কিন্তু এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চতা বেড়েই গেছে। পীড়-দেউল আলোচনাকালে বলেছিলাম যে, তার গণ্ডী আসলে একটি পিরামিডের কর্তৃতাংশ। এখন পিরামিডের আকার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। পিরামিডের পাদমূলের (base) আপেক্ষিকে উচ্চতাকে কমিয়ে বাড়িয়ে আকারটা চ্যাপ্টা বা সূচালো করা যায়। তার ফলে পীড়-দেউলের প্রান্তভাগের রেখাটি জমির সঙ্গে কম থেকে বেশী কোণ রচনা করবে। অনন্তবাসুদেব মন্দিরে লক্ষ্য করে দেখুন, পরপর তিনটি পীড়-দেউলে ঐ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে উচ্চতার এমন সুন্দর অনুপাত করা হয়েছে যে, চারটি মন্দির মিলিয়ে ভারী মনোরম একটা ছন্দ রচিত হয়েছে। ঐ সুষম-ছন্দের মূল কোথায় তা পণ্ডিতেরা বলেননি—কিন্তু এমন নয়নাভিরাম ছন্দ ভুবনেশ্বরের অন্য কোনও মন্দিরে, এমন কি লিঙ্গরাজেও দেখিনি। বাস্তুবিদ হিসাবে ঐ সুষম-ছন্দের মূলসূত্রটা আবিষ্কার না করা পর্যন্ত যেন তৃপ্তি পাইনি। পীড়-রেখাই একই বিন্দুতে এসে মিশেছে ; এবং আকাশে অবস্থিত সেই বিন্দুটির অবস্থান এমন যে, সেখান থেকে ভূমির উপর একটি লম্ব টানলে তা রেখ-দেউলের গণ্ডী-সমাপ্তি সূচিত করে। অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী বলতে পারি ঐ সুষম-ছন্দের মূলসূত্রটি হচ্ছে $d \tan A = k$, যেখানে d হচ্ছে গর্ভগৃহ থেকে পীড়-দেউল-প্রান্তের দূরত্ব, A হচ্ছে পিরামিডের ঢাল—অর্থাৎ ভূমি-রেখার সঙ্গে সেটি যে কোণ রচনা করছে এবং k হচ্ছে একটি ধ্রুবক।

প্রসঙ্গত বলি, রাজারানী মন্দিরে জগমোহন ছাড়া অন্য পীড়-দেউল নেই। সেখানেও পীড়-দেউলের প্রান্তরেখা বর্ধিত করলে দেখছি রেখ-দেউল যে বিসমে শেষ হয়েছে সেইখানে এসে মিশছে (চিত্র—7·3)। লিঙ্গরাজে এমন কোন ছন্দ পাই না। তাই অনন্তবাসুদেবকে লিঙ্গরাজের অন্ধ অনুকরণ বলতে আমার আপত্তি। কলিঙ্গ-স্থপতির দল নিশ্চয়ই লিঙ্গরাজে থেমে থাকেননি। পরবর্তী যুগেও নূতন পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন—না হলে আরও পরবর্তীকালে কোণার্ক মন্দির লিঙ্গরাজকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। □

দশম পরিচ্ছেদ

পুরী

[দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ—ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ]

জগন্নাথদেবের মহিমা অনস্বীকার্য, কিন্তু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিরিখে কোন পণ্ডিতই কোন যুগে পুরীর মন্দিরটিকে উচ্চমানের বলে চিহ্নিত করেননি। ফার্গুসন থেকে পার্সি ব্রাউন সকলেই এবিষয়ে একমত। দশ-পনের বছর পূর্বে প্রকাশিত আমারই লেখা 'কলিঙ্গের দেব-দেউল' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই :

"ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির দর্শন শেষ করেছি—দেখতে যাচ্ছি কোণার্কের সূর্যমন্দির। কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের এই দুই উৎকৃষ্টতম উদাহরণের মাঝখানে কালানুক্রমিকভাবে এসে পড়বে : পুরীর জগন্নাথের মন্দির। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, শুধুমাত্র স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মূল্যায়নে পূর্বোক্ত দুটি দেব-দেউলের সঙ্গে পুরী-মন্দিরের কোন তুলনাই চলে না। একমাত্র সাদৃশ্য তার আয়তনে। পুরীর মন্দিরও প্রকাণ্ড, কিন্তু কী স্থাপত্য-শৈলীতে, কী ভাস্কর্য-সম্পদে লিঙ্গরাজ বা কোণার্ক মন্দিরের সঙ্গে পুরী-মন্দিরকে এক সারিতে বসানো চলে না। ভাবতে অবাক লাগে, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের পরে যাদের হাতে পুরীর মন্দির নির্মিত হল সেই অবক্ষয়ী শিল্পীর দল আবার কেমন করে তার পরেও কোণার্কের পরিকল্পনা করলেন।"[1]

অত্যন্ত বিস্ময় ও আনন্দের কথা দেড় শতাব্দী-ব্যাপী এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে অতি সাম্প্রতিক-কালে। প্রায় দশ বৎসরকাল যখনই পুরীতে গেছি, দেখেছি, মূলমন্দিরের চতুর্দিকে ভারা বাঁধা। এজন্য "ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন" গ্রন্থে[2] আমি বাধ্য হয়ে পুরী-মন্দিরের মিথুন-বিষয়ে আলোচনা করিনি। করতে পারিনি। মূর্তিগুলি ভালো করে দেখতে পাইনি বলে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ এ মন্দিরের বহির্গাত্র মার্জনা করছেন। চুনাবালির একটি পলেস্তারার আস্তর অতি সাবধানে উঠিয়ে ফেলছেন। বেশ বোঝা যায়, সপ্তদশ বা অষ্টদশ শতাব্দীতে—ইংরাজ-আমলের পূর্বেই—কোনও উড়িষ্যারাজ এই পলেস্তারা দিয়ে মূল ভাস্কর্যগুলি আবৃত করে দিয়েছিলেন। কেন, তা এখনো সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এতদিনে মন্দিরগাত্রের অনেকটাই মার্জিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ঐ স্থূল শিল্পের অন্তরালে অবস্থিত মূল ও আদিম মূর্তিগুলি অতি অনবদ্য। সেগুলি অবক্ষয়ী ভাস্কর্যের হাতের কাজ নয়। নব-আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির বিষয়ে আপনাদের কিছুই জানাতে পারছি না বলে আমি নিরতিশয় দুঃখিত। আমার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কলকাতার ব্রেবোর্ণ রোডে পুরাতত্ত্বের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক অধিকর্তার দপ্তরে আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, সেগুলি সাধারণকে বিক্রয় করা হচ্ছে না। ওঁদের দপ্তরে বসে রেখাচিত্র আঁকবারও অনুমতি পাওয়া গেল না। আমাকে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হল। সেখানে লিখে জানা গেল—ওঁদের দপ্তরে বসে রেখা-চিত্র আঁকবার জন্য দিল্লিস্থিত কেন্দ্রীয় অফিস থেকে অনুমতি আনাতে হবে। মন্দিরে আলোকচিত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্কেচ করতে চাই-লাম—তাতে পাণ্ডাদের আপত্তি। জানা গেল, অর্থ-মূল্যে চিত্রকরকে অনুমতি হয়তো দেওয়া যাবে। আমি সে চেষ্টা করিনি। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ থেকে যখন রিপোর্ট ছাপা হবে তখনই আপনি-আমি তা জানতে পারব। তার পূর্বে নয়।

অনধিকারী হিসাবে যেটুকু দেখেছি, বুঝেছি, তা এবার নিবেদন করি।

স্বতই অনুমান করা হয়েছিল, প্রাগ্বতী মূর্তি-গুলিকে 'অশ্লীল' বিবেচনা করে কোন কলিঙ্গরাজ বুঝি এ কাজে ব্রতী হন। সে যুক্তিটি মেনে নেওয়া চলে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যে মূর্তিগুলিকে আবৃত করা হয়েছে তা 'অশ্লীল' বা 'যৌনতা-বিষয়ক' নয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেবদেবীর মূর্তি আবৃত করে চুনবালির আস্তরে যে নতুন মূর্তি খোদাই করা হয়েছে তা আদিরসাত্মক। আবার ক্ষেত্র-বিশেষে এর উল্টোটাও আছে। অর্থাৎ আদিরসাত্মক মূর্তি ঢেকে দিয়ে নূতন করে দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং এ কাজের জন্য 'আদি-রস'কে দায়ী করা যাচ্ছে না।

আমাদের মনে হয়েছে এ-কাজের মূল লক্ষ্য ছিল মন্দিরের নিরাপত্তা।

সম্ভবতঃ দু-তিন শত বছর আগে কলিঙ্গরাজ দেখতে পান মন্দিরের বহির্গাত্রে ফাটের দাগ দেখা দিয়েছে। মন্দির ভেঙে পড়ার আশঙ্কা হল। প্রতি-বিধানের অন্যতম উপায় মন্দিরের দেওয়াল আরও চওড়া করা। ফাটের ভিতর চুনবালির মশলা ঢুকিয়ে দিয়ে মোটা করে আস্তর দেওয়ার ব্যবস্থা হল। এ জন্য আস্তরের বেদ কোথাও কোথাও বারো থেকে পনের সেণ্টিমিটার!

পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে যতদিন না এ বিষয়ে জন-সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে ততদিন আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্ততঃ এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, লিঙ্গরাজের পরে এবং কোণার্কের পূর্বে যে ভাস্করদল পুরী-মন্দিরকে অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁরা আদৌ অর্বাচীন বা অব-ক্ষয়ী-শিল্পের শিকার নন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব-তন শিল্পগুলি অনবদ্য।

একথা স্বীকার্য যে, স্থাপত্য-ভাস্কর্যই জাতীয়-জীবনের সব কিছু নয়। তাই বলব, পুরী-দেউলের মহিমা আয়তন বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয়—সে মহিমা অন্যত্র। জগন্নাথ-মন্দির উড়িষ্যা-সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র।

গুণকর্মের বিভাগ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অতি প্রাচীনযুগ থেকে জাতিভেদের আয়োজন করেছিল সহস্রাব্দির অপপ্রয়োগে তা মধ্যযুগে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। জাত্যভিমানের সঙ্কীর্ণতা ভারত-সংস্কৃতিকে ভরাডুবি করাতে বসেছিল। পুরী-মন্দির তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অসীম শক্তিধর যুগাবতারেরা একক বা গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টায় বারে বারে এই জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতার কুফল সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন—আমাদের নাড়া দিতে চেয়েছেন; কিন্তু ধর্মান্ধ বর্ণহিন্দু কিছুতেই তার গোঁড়ামিকে ত্যাগ করেনি। কবীর-দাদুর-শ্রীচৈতন্য-গুরুনানক থেকে রামমোহন-বিবেকানন্দ-গান্ধীজী পর্যন্ত যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যে গোঁড়ামিকে বিতাড়িত করতে পারেননি জগন্নাথ নিজ-মহিমায় তা অনায়াসে পেরেছেন। কেমন করে, কার প্রেরণায় এটা প্রথম প্রচলিত হয়েছে জানি না। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই—মহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট হয় না—জল-অচল জাতের হাত থেকে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তা সানন্দে আহার করেন। আসমুদ্র হিমাচলের সহস্রাব্দি-পুঞ্জীভূত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীক্ষেত্রের এই সোচ্চার সবল প্রতিবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি তেমন কিছু তো গোটা ভারতবর্ষে দেখি না।

দুরন্ত কৌতূহল হয় জানতে—এ-প্রথার প্রবর্তক কোন মহামানব! শ্রীচৈতন্যের আমলে যে এটি প্রচ-লিত ছিল তা সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত। না হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে এই উদারতার ভগীরথ বলে চিহ্নিত করা চলত। তাঁর পূর্বযুগ থেকে প্রচ-লিত হলেও এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম এই জাতিভেদের কলুষতা থেকে পুরীধামকে মুক্ত করতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। তবে কি অষ্টম শতাব্দীতে যখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য পুরীধামে তাঁর অদ্বৈত-বেদান্তের মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই এর প্রচলন? নাকি তারও পূর্বযুগ থেকে? জানি না! ইতিহাস নীরব!

জগন্নাথ-মন্দির : মাদলাপঞ্জী মতে বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা হচ্ছেন গঙ্গবংশের দ্বিতীয় রাজা গঙ্গেশ্বর। মাদলাপঞ্জীর সাল-শতাব্দীর হিসাব যে নির্ভুল নয়, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। মাদলা-পঞ্জী মতে : কেশরী বংশের শেষরাজা সুবর্ণকেশ-রীর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুর পর চোড়গঙ্গ দক্ষিণ দেশ থেকে এসে গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকাল 1132-1152 খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বংশের দ্বিতীয় নৃপতি (1152-1166 খ্রীঃ) গঙ্গেশ্বর কোনও পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পিপলি ও খুর্দা রোডের মাঝখানে কৌশলগঙ্গা নামে একটি খাল খনন করেন, এবং জগন্নাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিকদের মতে চোড়গঙ্গ এবং গঙ্গেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের কাল 1118 খ্রীষ্টাব্দ। পুরীর মন্দির-স্থলে পূর্বযুগ থেকে

অবস্থিত একটি ভগ্নপ্রায় দেউল তিনি আদ্যন্ত নূতন করে নির্মাণ করান, যা এখন দেখতে পাওয়া যায়। এই গঙ্গেশ্বর ওরফে অনঙ্গবর্মন চোড়গঙ্গদেব ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের তেলেগুভাষী রাজ্যের একজন ভাগ্যান্বেষী মহাযোদ্ধা। তিনি নির্ভীক, রণকুশল এবং বিচক্ষণ শাসক। দেবদ্বিজে তাঁর অচলা ভক্তি। মন্দির তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। অসমাপ্ত কাজ আরও কিছুটা অগ্রসর হয় পরবর্তী নৃপতি দ্বিতীয় অনঙ্গভীমদেবের (1190-1196 খ্রীঃ) সময়ে। কিন্তু তিনিও তাঁর জীবদ্দশায় মন্দির সম্পূর্ণ করতে পারেননি। সেটি সমাপ্ত হয় চোড়গঙ্গর প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের আমলে (1211-1238 খ্রীঃ)। অর্থাৎ বর্তমানে দৃষ্ট পুরীর মন্দির তিনজন রাজার অর্থানুকূল্যে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সমাপ্ত।

ওড়িয়া ভাষায় প্রাচীনতম শিলালিপিটি পাওয়া যাচ্ছে কোণার্ক মন্দির-নির্মাতা লাঙ্গুলীয় নরসিংহ-দেবের পরবর্তী নৃপতি রাজা ভানুদেবের (1263-1269 খ্রীঃ) একটি শাসনে ; সেটি সীমাচলমে নৃসিংহ-দেবের মন্দিরে অবস্থিত। কিন্তু গঙ্গবংশের যে দুটি শিলালিপি ইতিহাসবেত্তাদের প্রচুর পরিমাণে রসদ যুগিয়েছে সে-দুটি ভুবনেশ্বরে অবস্থিত চতুর্থ নরসিংহদেবের[3] এবং পুরীতে অবস্থিত তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের[4]।

আমরা ইতিহাসের ছাত্র নই, তাই এইসব শিলালিপি-তাম্রশাসন খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন এবং ক্ষমতা আমাদের নেই। অপরপক্ষে মাদলাপঞ্জীতে লিখিত একটি কথোপকথন আমরা আরও মনোনিবেশ সহকারে দেখব। মাদলাপঞ্জীর মতে এ-কথোপকথন হয়েছিল রাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেব (1212-1238 খ্রীঃ) এবং তাঁর সভাসদদের মধ্যে। এই বিবরণ সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলছেন, "Although such comparisons have no meaning, one cannot help thinking of the great speech of Pericles of Athens during the early stages of the Peloponnesian War which has been recorded by the Greek historian Thucydides."[5]

আচার্য সুনীতিকুমার সমেত অনেক পণ্ডিতের ধারণা যে, যদিও মাদলাপঞ্জীতে এ ভাষণ তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের প্রতি আরোপ করা হয়েছে তবু বাস্তবে হয়ত এ ভাষণ গঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং চোড়গঙ্গদেবেরই। এই ভাষণে সেই বীর দিগ্বিজয়ী কলিঙ্গেশ্বরের চরিত্রটিই শুধু নয়, এর মাধ্যমে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ওড়িয়া ভাষার কী রূপ ছিল তাও আমরা জানতে পারব। আমরা ঐ দীর্ঘ ভাষণের অংশবিশেষ বাঙলা-হরফে মূলরূপে[6] এবং তার বঙ্গানুবাদ[7] কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"রাজ-ভোগ-ইতিহাস

"ভো ভবিষ্য মহারাজ-মানে,

"দেবতা-ব্রাহ্মণ-ন-কু, বল-ভণ্ডার-কু, রাজনীতিছায়া-কু মধ্যকরি মু যেমত প্রকারে ভিয়ান করি দেউ অছি, এথিকি তুমে-মানে ন পুনি বোল—সে দই গল, আমহর কি হইলো, আমহে কিম্পা দবু ;—এমত ন বলিব।

"এ তি ওড়িশা-রাজ্য, যে কেশরি-রাজা-মানংকু আদি করি গঙ্গবংশে আম্ব চপাট সরিকি রাজ্য আয়ে হৈ থিলা, পূর্ব দিগে অর্ক-ক্ষেত্র..."

অর্থাৎ :

"হে ভবিষ্যৎ রাজন্যবর্গ,

দেবতা-ব্রাহ্মণ সমর-বিভাগ রাজকোষ প্রভৃতির ভিতর যেভাবে আমি রাজ্যের সম্পদ ও আয় বণ্টন করে দিয়ে গেলাম সে সম্বন্ধে তোমরা যেন এভাবে কথা বল না—তিনি দিয়ে গিয়েছেন, তাতে আমাদের কি ? আমরাও কেন (ঐভাবে) দিতে থাকব ? এ-ভাবে তোমরা বল না।

এই তিন উড়িষ্যা রাজ্য যা কেশরী রাজাদের কাছ থেকে গঙ্গবংশের আমরা ছিনিয়ে নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি, যার পূর্ব সীমানায় অর্ক ক্ষেত্র"—ইত্যাদি।

মহারাজ অতঃপর তাঁর রাজ্যসীমার বর্ণনা করেছেন, রাজ্যের আয়ের কথা বলেছেন এবং কী-ভাবে রাজসম্পদ দেবতা-ব্রাহ্মণ, সেনা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র-বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করা হবে তার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, "সেই প্রকারে পুষ্টি-নষ্টি দেখি, কর ঘেনি, পরজাংকু পরিপালন করি, পৃথিবী ভোগ করি, সুখে স্বর্গকু জিবা। ভো-মহারাজ-মানে, সবুথারু ধর্ম্মহিঁ সে কারণ—" অর্থাৎ "এই প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করে এবং নিজেরা পৃথিবীকে ভোগ করে তোমরা সুখে স্বর্গে যাবে। (কিন্তু) হে (ভবিষ্যৎ যুগের) মহারাজ, (মনে রেখ) ধর্মই একমাত্র মূল-কারণ।"

তাই সেই আদি ধর্মের প্রতীক দেব-দেউলের দিকে নজর দিতে হবে। মহারাজ তাই অবশেষে বলছেন, "যযাতি-রাজা জেঁ পাটল তোলাই পরমেশ্বরকু বিজে করাই আছন্তি সে পাটল গোটিক অতি বৈষম হইলা। এহা ভাঞ্জি শয় উচ্চে প্রাসাদ গোটিকে

তোলাইবা পরমেশ্বরংকু। আয়তন-ভিতর দেবতা-মানংকর দেউল গোটামানা আনকরি তোলাইবা।" [রাজা যযাতি যে মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন, যার গর্ভে পরমেশ্বর (অর্থাৎ জগন্নাথ) আছেন, সেই দেউল অত্যন্ত ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ঐ খানে একশ হাত উঁচু মন্দির নির্মাণ করাব।]

মাদলাপঞ্জী বলছেন, এ কথা শুনে সভাসদেরা বলেছিলেন—মহারাজ, এ আপনার উপযুক্ত প্রস্তাব। এ কথা ইতিপূর্বে কেউ চিন্তা করতে পারেননি। কিন্তু 'ধর্ম্মস্য ত্বরিতগতি—ধর্ম্ম বিচারিলে বড় বেগ করি।' তাই আমাদের প্রস্তাব শত হস্ত উচ্চ দেউল নির্মাণের সংকল্প ত্যাগ করে আমরা যদি উচ্চতাটাকে দশ হাত কম করি—দশ থেকে নয় হাত—তাহলে শীঘ্রই এ মন্দির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবে। এ প্রস্তাবে মহারাজ প্রথমে আপত্তি করেছিলেন কিন্তু প্রজাবর্গের নির্বন্ধাতিশয্যে (তাঁরা যুক্তি দেখান—মন্দির যদি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত না হয় তাহলে সমস্তই পণ্ডশ্রম হবে) রাজা বললেন, "হেী, নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হেী (তথাস্তু, তবে নয় হাত উঁচু উচ্চ প্রাসাদই হোক)।

এখানে একটি ফুটনোট সসঙ্কোচে যোগ করতে বাধ্য হচ্ছি। মহাপণ্ডিত ডঃ আর্তবল্লভ মোহান্তির মূল ওড়িয়া এবং আচার্য সুনীতিকুমারের ইংরাজী অনুবাদমতে সভাসদেরা বলেছিলেন, "নয় হাত উঁচু মন্দির বানানো হক" এবং মহারাজ প্রত্যুত্তর করেন, "তথাস্তু।" কিন্তু সেটা যে নিতান্ত অসম্ভব! ওঁরা দুজনেই ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন, বাস্তুবিদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়; তাই এ ব্যাখ্যা দিয়ে যাননি যে, রাজনির্দেশ অনুসারে মাত্র নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ কেমন করে অত প্রকাণ্ড মন্দিরের রূপ নিল।

আমাদের মনে হয়েছে অনুবাদটি নির্ভুল নয়। প্রাথমিক প্রস্তাবের ঐ 'দশ হাত' শব্দটি মন্দিরের উচ্চতাসূচক নয়; মন্দিরের প্রাথমিক 'মডুল' (module)-এর উচ্চতা-সূচক। অর্থাৎ প্রতি 'ভূমি' দশ হাতের পরিবর্তে নয় হাত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেজন্য লক্ষ্য করে দেখুন, রাজ-নির্দেশ "নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ হেী" (নয় হাত উচ্চ প্রাসাদ হোক) নয়, বরং 'নয় হাত উচ্চ উচ্চে প্রাসাদ হেী' (নয় হাত উচ্চতা-বিশিষ্ট প্রাসাদ-উচ্চতা হোক)। সুতরাং সুনীতিকুমারের অনুবাদ "Let the temple be 9 cubits high"-কে পড়তে হবে "Let the (module of the) temple be 9 cubits high." যার অর্থ সম্পূর্ণ উচ্চতা $10\times10=100$ হাতের পরিবর্তে হবে $10\times9=90$ cubits। প্রসঙ্গতঃ বড়-দেউলের অর্থাৎ বিমানের সম্পূর্ণ উচ্চতা 144 হাত; তার ভিতর নয়ভূমি-বিশিষ্ট গণ্ডী-অংশের বাস্তব উচ্চতা 90 হাত! এ প্রসঙ্গটি নিয়ে আমি আচার্য সুনীতিকুমারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তিনি মৌখিক জানিয়েছিলেন, খুব সম্ভবতঃ আমার অনুমান ঠিক।

উচ্চতার সম্বন্ধে নির্দেশ দান করা সত্ত্বেও মহারাজ নিজে নির্ধারণ করে যাননি ঠিক কোন জাতের প্রাসাদ তৈরী হবে। তিনি তাঁর শিল্পবিশারদদের সেটা নির্ধারণ করতে বলেন। মহারাজের বক্তব্য—"এমন্তকু শিল্পশাস্ত্রমান দেখ, কেউং প্রাসাদ হেলে বিষ্ণু-যোগ্য" (এখন তোমরা শিল্পশাস্ত্রগুলি দেখ, বিষ্ণুর উপযুক্ত মন্দির কীরকম হবে তা নির্ণয় কর)। তখন শিল্পবিশারদ ভট্টমিশ্ররা যুক্তি করে বললেন, দেউল ছত্রিশ প্রকারের হতে পারে; তার ভিতর কুড়িটি নকশা তুল্যমূল্যের, তবু ঐ বিংশতি প্রকার দেউলের ভিতর শ্রীবিষ্ণুর উপযুক্ত মন্দির হওয়া উচিত: শ্রীবৎস খণ্ডশালা। মহারাজ সে-কথা শুনে তৎক্ষণাৎ মন্দির নির্মাণ কার্যে দশ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রার ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করলেন। দেবমূর্তির অলঙ্কার-বাবদ পৃথকভাগে আরও আড়াইলক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রার অনুমোদন দিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীই হোক অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদলাপঞ্জীর এ ভাষা বর্তমান ওড়িয়া ভাষা থেকে খুব কিন্তু পৃথক নয়। ওড়িয়া ভাষা যাঁরা জানেন না এমন বাঙালী পাঠক মোটামুটি বুঝতে পারছেন চোড়গঙ্গদেবের কথ্য-ভাষা। অন্ততঃ চর্যাপদের বাঙলা বুঝতে আজ সাধারণ বাঙালীর যেটুকু অসুবিধা হয় এ-ভাষা বুঝতে তার চেয়ে অনেক কম বেগ পাবেন বর্তমান-কালের উড়িষ্যাবাসী।

চোড়গঙ্গ যে পুরীমন্দিরের আদিনির্মাতা নন, এ তথ্যের সমর্থন মাদলাপঞ্জী ছাড়া সংস্কৃতে লেখা পুরাণেও স্বীকৃত:

প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাম কর্তুংক্ষম।
স্তস্যেতাদ্য নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেয় গঙ্গেশ্বরঃ ॥[8]

বলেছেন, পুরুষোত্তমের এই দেব-দেউলের সংস্কারকার্য, যা পূর্ববতী রাজন্যবর্গ কর্তৃক এতদিন উপেক্ষিত হয়েছিল গঙ্গেশ্বর সেই সংস্কারকার্যই করেছেন মাত্র। শাস্ত্র বা মাদলাপঞ্জীর নির্দেশ ছাড়াও নানান কারণে এই তথ্যটি সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা মানতে বাধ্য। নীলাচলের মহিমা মহাভারতে আছে, বহু প্রাচীর শাস্ত্রে আছে, যা চোড়গঙ্গ উড়িষ্যাধিপতি

হবার অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে লিপিবন্ধ হয়েছে। বর্তমান পুরীতে নীলাচল নেই—অর্থাৎ পাহাড় নেই ; কিন্তু পুরীর মন্দিরটি সংলগ্ন ভূভাগ অপেক্ষা অনেক উঁচুতে অবস্থিত। যেন ছোট একটি পাহাড়ের উপর উঠে আসতে হয়। ফার্গুসন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—হয়তো পুরীই সেই বৌদ্ধশাস্ত্র-সম্মত দন্তপুর, যেখানে কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের শব-দন্তের উপর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর মতের সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, বৌদ্ধধর্মে জাতি-ভেদ নেই। শ্রীক্ষেত্রেও জাতিভেদ নেই। ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র স্থান যেখানে অন্ন উচ্ছিষ্ট হয় না! হীনযানী বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা করতেন না—তাঁরা গৌতম বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ কখনও করেননি—জগন্নাথ দেবের মূর্তিও কি তাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত? বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র ত্রি-রত্নে বিধৃত—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' পুরী মন্দিরেও পাশাপাশি তিন রত্ন! বলরাম—সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণ। হীনযানী বৌদ্ধরা সংযমী সন্ন্যাসী ছিলেন—স্ত্রী দেবতা বা শক্তির পরি-কল্পনা পরবর্তী মহাযানী যুগের। তাই কি পুরী মন্দিরের পরিকল্পনায় রাধা পরিত্যক্ত? শুধু ভাই-বোনের সমাহার? এ ছাড়া 'ধৃ' ধাতু থেকে এসেছে অর্থাৎ ধারণ করেন বলেই বোধহয় সংস্কৃত 'ধর্ম' এবং পালি 'ধম্মে'র স্ত্রীরূপই কল্পনা করেছেন বৌদ্ধ শাস্ত্রকারেরা। অথচ 'বুদ্ধ' এবং 'সঙ্ঘ' পুংলিঙ্গ শব্দ। আশ্চর্যের কথা, জগন্নাথদেবের মন্দিরে মধ্য-স্থিত 'ধম্মে'র প্রতীক সুভদ্রাদেবীই স্ত্রীলোক—দুই পাশে পুরুষ। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবের সঙ্গেও হয়তো বৌদ্ধধর্মের কিছু সম্পর্ক আছে। ফা-হিয়ান তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে মধ্য এশিয়ার খোটানে এক রথযাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "শহর থেকে তিন অথবা চার লি দূরে নগরবাসীরা একটি চার-চাকার রথ নিয়ে এল ; উচ্চতায় সেটি ত্রিশ হাত।...মূল বিগ্রহকে কেন্দ্রস্থলে বসানো হল এবং তাঁর দুই পাশে বসানো হল দুই বোধিসত্ত্বকে।"

সিংহলে বুদ্ধদেবের শব-দন্ত—যা নাকি এই দন্তপুর থেকেই সমুদ্রপারের দেশে চলে গেছে—নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল আজও রথযাত্রা উৎসব করেন।

জগন্নাথদেবের মূর্তি কেন অসমাপ্ত রয়ে গেছে সে কাহিনী সকলেই জানেন। রানী গুণ্ডিচা দেবীর নির্বন্ধাতিশয্যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে মূর্তি-নির্মাতার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মন্দিরের দ্বার খুলে দেখেছিলেন। ফলে—'দারুভূত জগন্নাথ!' এ কাহিনী যে প্রাচীন ওড়িয়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সেই শ্রীমাগুনিয়া দাসের কিছুটা উদ্ধৃতি দিই, সেখানেও দেখা যায়—সাকার বুদ্ধদেব যেমন স্তূপ-পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তেমনিভাবেই সাকার জগন্নাথ পিণ্ডবৎ হয়ে যাবার ইঙ্গিত আছে :

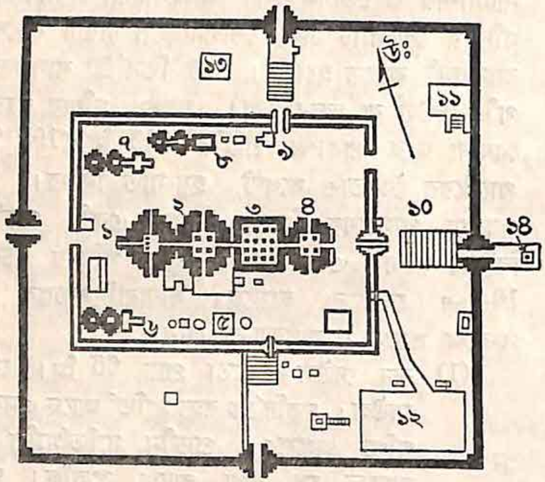
"মুই বউদ্ধ রূপহই কলিযুগের থিবু রহি।
সুবর্ণ হাত গোড়করি গড়াহি দেহ দণ্ডধারি॥
দেখিলে সিংহাসন পরে বিজয়ে বউদ্ধ রূপরে।
পদ অংগুলি নাহি হাত শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥"

সে যাই হোক, বর্তমান পুরী মন্দিরের পরি-কল্পনায় দেখছি কলিঙ্গ স্থাপত্যের প্রত্যেকটি শাস্ত্র-সম্মত লক্ষণই মেনে চলা হয়েছে। পূর্বমুখী (এখানেও নয় ডিগ্রি দক্ষিণে হেলানো) মন্দিরে পশ্চিম থেকে পূর্বে সাজানো যথাক্রমে দেউল, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ। জগমোহনে চারটি, নাট-মন্দিরে ষোলোটি এবং ভোগমণ্ডপে চারটি স্তম্ভের আমদানী করতে হয়েছে। এই তিনটিই শাস্ত্রসম্মত পীড়-দেউল বা ভদ্র-দেউল। সমস্ত মন্দির চত্বরকে বেষ্টনা করে প্রকাণ্ড প্রাচীর 203 মি×195 মি। প্রাচীরের উচ্চতাও যথেষ্ট, ছয়-সাত মিটার। এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের ভিতর আবার একটি প্রাচীর। বিভিন্ন মন্দির ও সংলগ্ন বস্তুর পরিচয় চিত্র—10·1-এ দেখানো হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি :

(1) বড় দেউল—উচ্চতা প্রায় 66 মি। রেখ-দেউল। চতুর্দিকে বহু মূর্তি আছে এমনকি গণ্ডি অংশেও। প্রাচীন মূর্তিগুলি যে আবৃত সে কথা আগে বলেছি। তাই বিস্তারিত আলোচনায় আপাতত বিরত থাকলাম।
(2) জগমোহন—পঞ্চরথ পীড়-দেউল।
(3) নাটমন্দির—একরথ পীড়-দেউল। প্রকাণ্ড হলঘর 20·74 মি×20·74 মি। দাক্ষি-ণাত্যের স্তম্ভ-শোভিত নাটমন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।
(4) ভোগমণ্ডপ—পঞ্চরথ পীড়-দেউল। হলদে রঙের বালি পাথরে নির্মিত, উপরে লালচে রঙ—গোলা-রঙ ব্যবহারের জন্য।
(5) মুক্তিমণ্ডপ—জগমোহনের দক্ষিণে 11·6 মি×11·6 মি মাপের চতুষ্কোণ হল-ঘর ; ষোলোটি স্তম্ভ। এটি প্রতাপরুদ্র-দেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদে নির্মাণ করান। এখানে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রপাঠ করেন।

(6) বিমলাদেবীর মন্দির—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিমলার উল্লেখ আছে। যথা, মৎস্যপুরাণে "গয়ায়াম্ মঙ্গলা নাম বিমলা পুরুষোত্তমে" অথবা কপিল সংহিতায় "নটস্য পশ্চিমে ভাগে বিমলা বিমলে প্রদা" এবং উৎকল-খণ্ডে "মঙ্গলা বটমূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা।" এখানে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের ঠিক পশ্চিমে বিমলার মন্দির। তান্ত্রিক দেবী। মহাষ্টমীতে এখানে ছাগ বলি হয়। এই মন্দিরই একমাত্র স্থান যেখানে শ্রীক্ষেত্রেও বৎসরে একদিন বলিদানের অনুমতি আছে।

(7) লক্ষ্মীদেবীর মন্দির—মহারাজ চোড়গঙ্গ-কৃত এই মন্দিরটি মূল মন্দিরের সমসাময়িক। এ মন্দিরের নিজস্ব চারটি অঙ্গই



চিত্র—10·1 পুরী-মন্দিরের ভূমি নক্শা।

(1) বিমান
(2) জগমোহন
(3) নাটমন্দির
(4) ভোগমণ্ডপ
(5) মুক্তিমণ্ডপ
(6) বিমলাদেবীর মন্দির
(7) লক্ষ্মীদেবীর মন্দির
(8) ধর্মরাজ বা সূর্যনারায়ণ
(9) পাতালেশ্বর
(10) আনন্দবাজার
(11) স্নানবেদী
(12) রন্ধনশালা
(13) বৈকুণ্ঠ (যাত্রীশালা)
(14) অরুণ স্তম্ভ

আছে, অর্থাৎ দেউল-জগমোহন-নাটমন্দির-ভোগমণ্ডপ।

(8) ধর্মরাজ অথবা সূর্যনারায়ণ—ভিতরে অষ্টধাতুর সূর্য ও চন্দ্র মূর্তি আছে ; মাঝখানে সূর্যনারায়ণ। পুরাতত্ত্ব-বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে কোণার্কের মূল বিগ্রহটি সম্ভবত পুরী মন্দিরের বিরিঞ্চি মন্দিরে লুক্কায়িত আছে ;—বলা হয়েছে, "মাদলাপঞ্জী মতে (কোণার্কের মূল বিগ্রহ) মূর্তিটি জগন্নাথ মন্দির চত্বরে নীত হয়েছিল। সেই মন্দির চত্বরে অবস্থিত বিরিঞ্চি সূর্যদেবের একটি মূর্তি আছে, যা নাকি পাণ্ডাদের মতে কোণার্ক থেকে আনীত। মন্দিরের মূর্তির পিছনে কষ্টিপাথরের একটি ভাস্কর্য নিদর্শন আছে, উচ্চতায় 1·83 মিটার এবং প্রস্থে 91·5 সে. মি।...সামনের দুটি হাতই ভেঙে গেছে, মাথার উপরে ত্রিভঙ্গ খিলানে অগ্নিশিখা খোদাই করা, তার উপর কীর্তিমুখ ও ধর্মছত্র।...যদিও শিল্পীর দক্ষতা কোণার্কের পার্শ্বদেবতাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য স্মরণ করিয়ে দেয় তবু মূর্তিটির সামনের বাধা অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে সনাক্ত করা সম্ভব-পর নয়।"[9] পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে টর্চের আলোয় যতদূর সম্ভব মূর্তিটি পরীক্ষা করলাম। শুধুমাত্র বাম অঙ্গই দেখা যাচ্ছে। রত্নোপবীত, মুকুট, কর্ণাভরণ এবং চামর-ধারিণীদের দেখা যায়। পদতলে অরুণ অথবা সপ্তাশ্ব আছে কিনা বোঝা যায় না ; পায়ের বুট জুতো এবং হাতের প্রস্ফুটিত পদ্ম—যেগুলি দেখে সূর্যমূর্তি সনাক্ত করা যাবে তা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হয়েছে এটি সূর্যমূর্তি ; কিন্তু এও মনে হয়েছে যে, এটি কোণার্কের মূল বিগ্রহ নয়। কোণার্কের মূল দেউলের তিন পাশে যে তিনজন পার্শ্বদেবতা আছেন তাঁদের গঠন পারিপাট্যে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় আছে। তাছাড়া, কোণার্কের মূল দেউলে যে সিংহাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে এ মূর্তির তুলনায় সেটা আকারে বড়।

(9) পাতালেশ্বর—শিবমন্দির, ধর্মরাজ মন্দিরের পূর্বদিকে, ভূগর্ভে।

(10) আনন্দবাজার—যেখানে ভোগ বিতরণ হয়।

(11) স্নানবেদী।

(12) রন্ধনশালা।

(13) বৈকুণ্ঠ—দ্বিতল বাড়ি ; বস্তুত ধনীদের যাত্রীশালা।

(14) অরুণ স্তম্ভ—এই স্তম্ভটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়রা কোণার্ক মন্দির

থেকে পুরীতে আনিয়ে পুরী মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরের অক্ষরেখা থেকে সামান্য দক্ষিণে সরে বসেছে সেটা।

পুরীর সন্নিকটস্থ অন্যান্য দেব-দেউল,—সাক্ষী-গোপাল, সোনার গৌরাঙ্গ, গুন্ডিচা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য নয়। সে-গুলির মূল্যও ভক্তির রাজ্যে। পুরীর বিভিন্ন মন্দির ও বিগ্রহের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি প্রচলিত আছে তাও পান্ডাদের কাছে সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিবিজড়িত যে-সব স্থান ও চিহ্ন পুরীতে আছে তার সন্ধানও সহজে পাবেন। সেগুলি সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প বস্তুত পুরীর হাওয়ায় ভাসছে। সুতরাং পুরীর বিবরণ এই পর্যন্তই। তবু একটি কথা বলতে চাই ; প্রতাপরুদ্র দেবের মায়ের সম্বন্ধে একটি কাহিনী আমি শুনেছি যা গল্পের মত মধুর। সে কাহিনীটি কথাসাহিত্যের রসে অভিষিক্ত করে পরিবেশনের লোভ সামলাতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি কাহিনীটি উৎকলের একটি বিখ্যাত লোকগাথা। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের একটি ওড়িয়া কাব্যগ্রন্থে এ কাহিনীটি পাবেন, পাবেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যগ্রন্থে (শ্রীসুকুমার সেন ও সুনন্দা সেনের টীকাসহ)। আমি যে কাহিনী লোকমুখে শুনেছি তা ঠিক ঐ গল্পটি নয়—কিছু পাঠান্তর আছে। গল্পটাই শুনুন আগে।

প্রতাপরুদ্র দেবের পিতা পুরুষোত্তম দেব তখন কলিঙ্গের সিংহাসনে আসীন। পুরুষোত্তম ছিলেন শালপ্রাংশু মহাভুজ সুপুরুষ ব্যক্তি। তাঁর সুশাসনে রাজ্যে কারো কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে—রাজ্যের একমাত্র দুঃখ মহারাজার কোন সন্তান নেই, বংশধর নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দোষ কোন বন্ধ্যা রাজমহিষীর নয়, রাজা আদপে বিবাহই করেননি। রাজকার্যে পুরুষোত্তম এত ব্যস্ত যে, বিবাহ করার সময় পান না। কিন্তু তা বললে তো চলে না। রাজন্যবর্গের পীড়াপীড়িতে অবশেষে মহারাজ বিবাহে সম্মতি দিলেন। তবু সম্মতি পেলেই তো আর বিবাহ হতে পারে না—সন্ধান আনতে হবে উপযুক্ত পাত্রীর। কলিঙ্গরাজ বিবাহে সম্মতি জানিয়েছেন এ সংবাদ প্রচারিত হতে নানান্ দেশ থেকে রাজসভায় দূতের আমদানী হতে থাকে। এমন সুপাত্রকে কে না চায় জামাই করতে ? কিন্তু মহারাজের প্রধানমন্ত্রীর কিছুতেই আর মন ওঠে না। মহামন্ত্রী বৃদ্ধ—মহারাজের পিতার আমল থেকেই তিনি কলিঙ্গ-রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মহারাজকে পুত্রসম স্নেহে মানুষ করেছেন তাঁর পিতৃবিয়োগের পর। কন্যাদায়-গ্রস্ত পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের দূত যখন এসে মহারাজকে পীড়াপীড়ি করে, তিনি বলেন মহামন্ত্রী যা স্থির করবেন তাই হবে।

তাই হল। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ মহামন্ত্রীই সন্ধান আনলেন উপযুক্ত পাত্রীর। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিভরমের মহারাজ নরসিংহদেবের একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আছেন—পদ্মাবতী। পদ্মের মতই তাঁর সৌন্দর্য, সৌরভ। ভাটের মুখে সেই পদ্মাবতীর বর্ণনা শুনে এতদিনে মহারাজ সম্মতি দিলেন। মহামন্ত্রীর আদেশে দূত ছুটল কাঞ্চিরাজ্যে।

কলিঙ্গ রাজ্যে লাগল উৎসবের হাওয়া। তৈরী হল পুষ্পতোরণ, পতাকা উড়ল প্রাসাদ শীর্ষে। আসন্ন বিবাহের সংবাদে দলে দলে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রজাবৃন্দ আসতে থাকে পুরী শহরে।

কিন্তু হঠাৎ এল দুঃসংবাদ। দূত ফিরে এসেছে। কাঞ্চিরাজ এ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কলিঙ্গ-রাজের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে তিনি অসম্মত।

ক্রোধে জ্বলে উঠলেন পুরুষোত্তম দেব, বললেন—হেতু ?

দূত মাথা নিচু করে বললে,—মার্জনা করবেন মহারাজ, সে-কথা আমি বলতে পারব না।

ক্রোধে আত্মজ্ঞান হারিয়ে চীৎকার করে ওঠেন মহারাজ—বলতে তোমাকে হবেই, আমি অভয় দিচ্ছি—বল, কেন কাঞ্চিরাজ অস্বীকার করেছেন।

দূত অস্ফুটে বললে—সে কথা আপনাকে জনান্তিকে নিবেদন করব মহারাজ। প্রকাশ্য দরবারে সে-কথা বলা চলে না।

মহামন্ত্রী বললেন—বেশ তাই হোক। আপনি সভাসমাপ্তি ঘোষণা করুন মহারাজ।

পিতৃতুল্য মহামন্ত্রীর অনুরোধ মানেই আদেশ ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহারাজ শিরশ্চালন করে বললেন—তা হয় না। এ বিবাহ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানমাত্র নয়—এ রাষ্ট্রনৈতিক মিলন। সে মিলনে বাধা কোথায় তা জানার অধিকার অমাত্যদের আছে। দূত, তুমি নির্ভয়ে সব কথা খুলে বল।

অগত্যা অপ্রিয় কাজটি দূতকে করতে হল। বিস্তারিতভাবে সে বর্ণনা দিল। কাঞ্চিরাজ নরসিংহদেবের সে উচ্চহাস্য দূতের কানে যেন তখনও বাজছে। নরসিংহদেব প্রস্তাব শুনে বলেছিলেন—এ তুমি কী অসম্ভব কথা বলছ হে দূত! আমার কন্যা ক্ষত্রিয় তনয়া। ঝাড়ুদারের সঙ্গে তার বিবাহ

দেব ? শুনেছি তোমার রাজা প্রকাশ্যে রাজপথ ঝাড়ু দেন।

মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিল দূত।

পুরুষোত্তম দেব কিন্তু মাথা খাড়া রেখেই বললেন—উত্তম! কাঞ্চিরাজকে এর প্রতিফল পেতে হবে। হ্যাঁ, আমি প্রকাশ্যে রাজপথে সমার্জনী চালনা করি—জগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা করি সে সৌভাগ্য যেন আমার বংশে চিরকাল থাকে। সেনাপতি, আপনি সৈন্য সমাবেশ করুন—কাঞ্চিরাজ্য আক্রমণ করব আমরা। অমাত্যবর্গ, আপনারা ক্ষুব্ধ হবেন না—প্রকাশ্য সভায় আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কাঞ্চিরাজের সেই দর্পিতা কন্যাকে আমি অপহরণ করে আনব এবং এ রাজ্যের এক সত্যিকারের ঝাড়ুদারের সঙ্গে তার বিবাহ দেব। যদি না পারি, আমি জীবনে বিবাহ করব না!

মহামন্ত্রী হাহাকার করে ওঠেন—এ আপনি কী করলেন মহারাজ!

কিন্তু রাজপ্রতিজ্ঞার তো নড়চড় হতে পারে না। অনতিবিলম্বেই কলিঙ্গরাজের ঝটিকাবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিল কাঞ্চিরাজ্য। মাগুনিয়া দাসের মতে স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম ছদ্মবেশে যুদ্ধ করেছেন কলিঙ্গ পক্ষে। নিরুপায় কাঞ্চিরাজ নরসিংহ বহু উপঢৌকন দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠালেন। কন্যা সম্প্রদানেও আর আপত্তি রইল না। সন্ধি হল। পাল্কীতে করে পদ্মাবতীকে নিয়ে আসা হল কলিঙ্গরাজের সমর শিবিরে। কিন্তু এবার আপত্তি করলেন স্বয়ং মহারাজ পুরুষোত্তম দেব। বললেন, অমাত্যবর্গের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—এ কন্যাকে আমি বিবাহ করতে পারি না। মহামন্ত্রী, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ। একটি সত্যিকারের ঝাড়ুদারের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ আপনাকে দিতে হবে।

সাশ্রুলোচনে মহামন্ত্রী বলে ওঠেন—এ কী বলছেন মহারাজ—এ কন্যা যে সত্যই পদ্মিনী কন্যা—আমি এ কাজ কেমন করে করব? আমি যে দেখছি পদ্মাবতী মা-কে।

পল্যঙ্কিকার আবরণ উন্মোচন করে মহামন্ত্রী বললেন—এ মায়ের এতবড় সর্বনাশ আমি কেমন করে করব মহারাজ?

কিংখাবের পর্দা সরিয়ে পল্যঙ্কিকা থেকে নেমে এলেন রাজকন্যা। নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন মহারাজকে, বললেন—আমি আপনার শরণাগতা!

শিউরে উঠলেন মহারাজ! এ যে সত্যই দেবকন্যা! অপাপবিদ্ধ এ সরলা বালিকার কী অপরাধ? তবু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে এই অনাঘ্রাতা তরুণীটিই আজ বলি হতে বসেছে! সমরবিজয়ের সমস্ত আনন্দ নিঃশেষে হারিয়ে গেল মহারাজের অন্তর থেকে—একটা হাহাকারের আর্তক্রন্দনে ভেঙে পড়তে চাইল সে পাষাণ হৃদয়। বিনাবাক্যে স্থানত্যাগ করলেন তিনি।

কলিঙ্গরাজ্যে ফিরে এল বিজয়ীবাহিনী। হস্তিপৃষ্ঠে মহারাজ পুরুষোত্তম চলেছেন সর্বাগ্রে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সুবর্ণখচিত পল্যঙ্কিকা—তাতে বন্দিনী রাজকন্যা। রাজধানী পুরীধামে ফিরে এসে মহামন্ত্রী সভয়ে প্রশ্ন করেন, মহারাজ?

দু-হাতে মুখ ঢেকে পুরুষোত্তম দেব বললেন—ভুলে যাবেন না, আমি রাজা হলেও মানুষ। বারে বারে একই আদেশ দিতে আমাকে বাধ্য করবেন না। সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি, তার অন্যথা হবে না ; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার অন্তরে একটা প্রবল ঝটিকার সঞ্চার হয়েছে—তাই কালবিলম্ব করতে সাহস পাই না। আগামীকাল সন্ধ্যাতেই রাজকন্যার সঙ্গে এ রাজ্যের কোনও ঝাড়ুদারের বিবাহের ব্যবস্থা করুন!

বিনা বাক্যব্যয়ে মহামন্ত্রী নতমস্তকে চলে গেলেন নিজ আবাসে। বৃদ্ধ মন্ত্রীর গৃহেই আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রাজকন্যাকে!

রাত্রি প্রভাতে কিন্তু একটি অদ্ভুত সংবাদ শোনা গেল। মহামন্ত্রী এবং রাজকন্যা উভয়েই নিরুদ্দেশ! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহারাজ পুরুষোত্তম। বৃদ্ধ মহামন্ত্রীর এভাবে মতিচ্ছন্ন হল? কিন্তু না, তিনি ক্ষত্রিয় রাজা—এর প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। রাজাদেশে গুপ্তচরের দল সমস্ত কলিঙ্গ রাজ্যে তল্লাসী শুরু করে। কিন্তু আশ্চর্য, বৃদ্ধ মহামন্ত্রী এবং রাজকন্যা পদ্মাবতী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন!

মহামন্ত্রীর সন্ধান অবশ্য শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন পুরুষোত্তম দেব, বিচিত্র পরিবেশে। তিন মাস পরে। রথযাত্রার পুণ্য দিনে। লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর ভীড় হয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। রথের উপর বিগ্রহ স্থাপন করার আয়োজন হচ্ছে। প্রধান পুরোহিত মন্দিরদ্বার উন্মোচন করে দিলেন। কলিঙ্গের মহামহিম অধিপতি পুরুষোত্তম দেব সুবর্ণ সম্মার্জনী হস্তে এগিয়ে এলেন সামনে। দেবতা যে পথ দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবেন সে পথ মহারাজ স্বয়ং সাফা করে দেন। এই ওঁদের বংশের প্রচলিত রীতি—বংশানুক্রমিকভাবে এই পবিত্র কাজ করার সম্মানলাভ করে আসছেন গঙ্গবংশের রাজন্যবর্গ। মহারাজ সুবর্ণ-সম্মার্জনী চালিত করে রাজ-

পথ পরিষ্কার করে সবে মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন অমনি জনতার একাংশ ভেদ করে এগিয়ে এলেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, বললেন—মহারাজ! এতদিনে আমার আরব্ধ কাজ শেষ হল।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত লোচনে মহারাজ দেখলেন ধূলিমলিন চীরবসনাবৃত পলিতকেশ বৃদ্ধ আর কেউ নয় তাঁরই নিরুদ্দিষ্ট মহামন্ত্রী। চমকে উঠলেন মহারাজ—বৃদ্ধ কি বিকৃতমস্তিষ্ক? তবু প্রশ্ন করেন —কী আপনার আরব্ধ কাজ?

—বহুদিন পূর্বে রাজাদেশ পেয়েছিলাম, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ঝাড়ুদারের সঙ্গে কাঞ্চিরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ দিতে হবে। তাই দীর্ঘদিন অজ্ঞাতবাস করেছি। লক্ষাধিক দর্শক আজ সাক্ষী—মহারাজ পুরুষোত্তম দেবও একজন ঝাড়ুদার। তাই তাঁরই হস্তে সমর্পণ করলাম আমার এই গচ্ছিত ধন!

পার্শ্ববর্তী অবগুণ্ঠাবৃতা রাজকন্যার ওড়না খুলে দিয়ে সর্বসম্মুখে মহারাজের করে সমর্পণ করলেন তার করপদ্ম।

লক্ষাধিক কণ্ঠের আনন্দ উচ্ছ্বাসে শোনা গেল মহামন্ত্রীর সে কার্যের সমর্থন! জয় মহারাজ পুরুষোত্তম দেব, জয় মহারানী পদ্মাবতী! জয় জগন্নাথ!

এই পুরুষোত্তম দেব এবং এই পদ্মাবতীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব অমর হয়ে আছেন বৈষ্ণব সাহিত্যে। নীলাচলে মহাপ্রভুর অসংখ্য কাহিনীতে!

কাহিনীর প্লাবনে আমরা কোণার্ক তীর্থপথ থেকে অনেকটা সরে এসেছি।

এবার সেই কোণার্ক মন্দির আমাদের দ্রষ্টব্য। □



একাদশ পরিচ্ছেদ

কোণার্ক

[ত্রয়োদশ শতাব্দী]

কোণার্কের সূর্যমন্দির নিঃসন্দেহে কলিঙ্গ স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কী পরিকল্পনা, কী বিরাটত্ব, কী সূক্ষ্ম কারিগরী! এ স্থাপত্য-বিস্ময়ের সম্মুখে আপনিই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

কোণার্কের পরিকল্পনাকার কলিঙ্গ-ঐতিহ্য মোটামুটি মেনে চলেছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মত করে সাজিয়েছেন তাঁর কীর্তিকে। লিঙ্গরাজ-অনন্তবাসুদেব-জগন্নাথে যে বাঁধা ফর্মুলা দেখেছি কোণার্ক পরিকল্পনাকার তা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। নাট-মন্দিরকে তিনি বাদ দিয়েছেন এবং দেউল ও জগমোহনকে সম্মিলিতভাবে একটি য়ুনিট বলে ধরেছেন। সেই সম্মিলিত স্থাপত্য-কর্ম একটি রথের রূপ নিয়েছে। মূল বিগ্রহ হচ্ছেন সূর্যদেব—উদয়াচল থেকে নিত্য তাঁর যাত্রা অস্তাচলের দিকে। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, ব্যতিক্রম নেই—চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষিত মহাতেজস্বী মার্তণ্ডদেব সৃষ্টির আদি থেকে শেষ মহাপ্রলয় পর্যন্ত ঐ চলার ছন্দে বাঁধা। উপনিষদকার যাঁর সম্মুখে যুক্তকরে বলেছিলেন, 'কর কর অপাবৃত হে পূষণ, আলোক আবরণ' সেই রথারূঢ় ভাস্কর হচ্ছেন এ মন্দিরের উপাস্য দেবতা। তাই কোণার্ক মন্দিরের পরিকল্পনাকার মন্দির গড়তে গিয়ে রথ গড়েছেন। রথের দুটি অংশ—মূল অংশ যেখানে বসেন রথী, এখানে দেখছি সেটি বড়-দেউল; কিন্তু রথীর সম্মুখে অপর একটি আসন চাই, যেখানে বসবেন সারথী, এখানে, সেটি জগমোহন। এই মিলিত দেউল-জগমোহন যে সূর্যের স্বর্গীয় রথ তাতে সাতটি অশ্ব। সপ্তাহের সাত বার; তাই রথের সম্মুখভাগে দেখছি সাতটি অশ্ব। সে রথে এক এক দিকে দ্বাদশটি চক্র, সর্বসমেত চব্বিশটি চক্র। এক একটি চক্র এক এক পক্ষকাল, প্রতি জোড়া চক্রে যেন এক মাস। এই প্রকাণ্ড রথটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 66 মি, প্রস্থে বিস্তৃততম অংশে 30.5 মি এবং জগমোহনের উচ্চতা যা পাচ্ছি তা 39 মি—মূল মন্দিরটি ছিল অন্তত 77 মি উচ্চ। সূর্যদেবের উপযুক্ত রথ বটে!

এই বিজন প্রান্তরে এত বড় একটা প্রকাণ্ড মন্দির এমন সুন্দরভাবে কে করেছিলেন, কেন করেছিলেন ঠিক জানি না। এ তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যই বা কি? ইতিহাস কিছু বলে, কিছু বলে শাস্ত্র, কিছু আছে কিম্বদন্তীতে—একমাত্র মহাকালই হয়তো জানেন এর প্রকৃত ইতিহাস! এই স্থাপত্য-বিস্ময়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোন কিছুকেই আর অবিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। সব খুঁটিয়ে জানতে ইচ্ছে করে। জবাব আমি জানি না, যেটুকু জেনেছি লিপিবদ্ধ করি—তারপর আপনাদের মন যা বলে তাই মেনে নেবেন।

প্রথমেই কিম্বদন্তীর কথা। সে লোকগাথার পিছনে অবশ্য আছে কপিল-সংহিতা, মাদলাপঞ্জী এবং প্রাচী-মাহাত্ম্যের দেবনাগরী হরফের অনুমোদন। পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ছিলেন অত্যন্ত সুপুরুষ। সে জন্য তাঁর এবং শাম্বপত্নী জাম্ববতীর অত্যন্ত অহঙ্কার ছিল। নারদ-মুনি কোন কালেই সুন্দর নন দেখতে। একদিন শাম্ব সর্বসমক্ষে নারদ-মুনির দাড়ি অথবা ভুঁড়ি নিয়ে কি একটা রসালো ইঙ্গিত করেছিলেন। নারদ-মুনিকে নিশ্চয়ই আপনাদের চিনতে বাকি নেই। নারায়ণভক্ত নারদ চটে গেলে আর রক্ষে নেই—তাঁর মাথায় খেলে নানান্ ফন্দি। মনে মনে চটে গেলেও মুখে হাসিটি বজায় রেখে তিনি বললেন—কুমার শাম্ব, তোমার ধারণা তুমি অত্যন্ত সুপুরুষ—স্ত্রীলোক মাত্রেই তোমার রূপে মুগ্ধ হবে, কিন্তু আমি তোমাকে এমন স্ত্রী-রাজ্যে নিয়ে যেতে পারি যেখানে কেউ তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

কৌতূহল হল শাম্বের। বললেন, বেশ দেখাই যাক পরখ করে।

নারদ সুকৌশলে শাম্বকে নিয়ে এলেন এক সরোবরে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ষোড়শ গোপিনী স্নান করছেন। শাম্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন গোপিনীরা, শাম্বও ভুলে গেলেন নারদের উপস্থিতি। নারদ এই সুযোগই খুঁজছিলেন—তিনি তৎক্ষণাৎ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন অকুস্থলে। পিতৃদেবকে দেখে সংযত হলেন শাম্ব ; তিনি তখনও জানতেন না স্নানার্থিনীরা তাঁর বিমাতা।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বোধকরি বিশ্বাস করেননি। পুত্রের অশালীন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি অভিসম্পাত দিলেন—শাম্বের অনিন্দ্যকান্তি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কঠিন কুষ্ঠরোগে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অনন্যোপায় শাম্ব তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব শুরু করলেন। ক্রোধ প্রশমিত হলে কৃষ্ণও বুঝতে পারলেন শাম্ব সজ্ঞানে পাপ করেনি, তাই তুষ্ট হয়ে বললেন—তুমি চন্দ্রভাগা নদীতীরে মিত্র বনে গিয়ে সূর্যের উপাসনা কর। একমাত্র তিনিই পারবেন তোমাকে রোগমুক্ত করতে।

অনুজ্ঞা অনুসারে শাম্ব এলেন চন্দ্রভাগা নদীতীরে। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল সূর্যোপাসনা করে তিনি রোগমুক্ত হলেন। দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে শাম্ব সূর্যদেবের একটি মন্দির তৈরী করে দেবেন স্থির করলেন। ঘটনাচক্রে চন্দ্রভাগা নদীতেই স্নানকালে তিনি সূর্যদেবের একটি অপূর্ব মূর্তি আবিষ্কার করেন, যে মূর্তি তৈরী করেছিলেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। শাম্ব সেই মূর্তিটিরই প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রভাগা নদীতীরে কোণার্ক-তীর্থে। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পূজারীগণ সূর্যপূজার মন্ত্র জানত না বলে কুমার শাম্ব উত্তরখন্ড থেকে মাঘ-বংশীয়[1] কিছু পুরোহিত নিয়ে এসে দেবপূজার ব্যবস্থাও করলেন।

কিংবদন্তী তথা প্রাচীন পুরাণমতে এই হচ্ছে কোণার্ক মন্দিরের ইতিকথা। এবার আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি এ কাহিনীর আদৌ কোন ভিত্তি আছে কি না।

কোণার্ক মন্দিরের অনতিদূরে একটি মরা নদীর মোহনা আছে যার নাম চন্দ্রভাগা। মাঘী শুক্লা-সপ্তমীতে এখনও পুণ্যার্থীর দল ওই নদীর মজে যাওয়া কুন্ডে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে মন্দিরে পূজা দিতে আসে। একটি দিনের জন্য সহস্র সহস্র পুণ্যার্থী যাত্রীতে পূর্ণ হয়ে যায় মন্দির প্রাঙ্গণ ; সেদিন আর ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ নেই, ট্রানজিস্টারে লারে-লাপ্পা গান শোনা যায় না—একটি দিনের জন্য সমস্ত মন্দির-চত্বরে ধ্বনিত হতে থাকে মন্ত্র : 'জবা-কুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।' কপিল-সংহিতায় এ অর্কক্ষেত্রে আরও অনেক দর্শনীয় তীর্থের উল্লেখ আছে—মৈত্রেয় কানন, শ্রীমঙ্গল বাপী, শ্রীশাল্মলীভান্ড, সূর্য-গঙ্গা, সমুদ্র, রামেশ্বর মন্দির এবং সমুদ্রতীরে কল্পতরু বৃক্ষ। এগুলির চিহ্নমাত্র বর্তমানে নেই। আছে শুধু সমুদ্র আর সূর্যমন্দিরের ভগ্নাংশ।

মনে হয়, শাম্বের যে মূল-কাহিনীটি পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে সেটি কলিঙ্গের সূর্যমন্দির সম্বন্ধে নয়। পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা নদীতীরে আছে শাম্বপুর—আধুনিক মুলতান। সেখানকার বিখ্যাত সূর্য-মন্দির, যার বিবরণ পাই হিউ-এন-ৎসাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তে—শাস্ত্র সেই সূর্যমন্দিরের উপাখ্যানই বিবৃত করেছেন। কোণার্কের সূর্যমন্দির যাঁরা নির্মাণ করান তাঁরাই সম্ভবত স্থানীয় প্রাচী-নদীর শাখা নদীটির নাম রাখেন চন্দ্রভাগা এবং শাস্ত্রোক্ত কাহিনীর সঙ্গে নাম মিলিয়ে মৈত্রেয়-কানন, কল্পতরু বৃক্ষ ইত্যাদির প্রবর্তন করেন। নবদ্বীপের নব বৃন্দাবনের মত কোণার্ক হয়ে উঠল নব অর্ক-ক্ষেত্র।

মাদলাপঞ্জী-মতে এই অর্ক-ক্ষেত্রে শাম্ব প্রতিষ্ঠিত সূর্যমূর্তির উপর কেশরী বংশের নৃপতি পুরন্দর কেশরী একটি মন্দির নির্মাণ করান এবং আটটি গ্রাম দান করে দেব-বিগ্রহের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। প্রাচী ও চন্দ্রভাগা নদীতীরে তখন এ অঞ্চলে অনেকগুলি সমৃদ্ধ গ্রাম ও জনপদ ছিল। কেশরী বংশের পতনের পর কলিঙ্গে নূতন গঙ্গ-রাজবংশের রাজন্যবর্গও এই অর্ক-ক্ষেত্রে বাৎসরিক উৎসবে আগমন করতেন মাঘী-শুক্লা সপ্তমীতে—কোণার্কদেবকে পূজা দিতে। মাদলাপঞ্জী বলছেন, রাজা অনঙ্গভীমদেব দেবপূজার বার্ষিকীর অঙ্ক বাড়িয়ে দেন—মহাদেবী, অষ্ট শম্ভু, অষ্ট চন্ডী, অরুণ প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার জন্যও বাৎসরিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। অনঙ্গদেবের পরবর্তী গঙ্গরাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয় পুরন্দর কেশরী নির্মিত পূর্বতন মন্দিরের সম্মুখে নূতন একটি মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁর পাত্র (অমাত্য) শিবসামন্ত রায়কে কোণার্কে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে, বহু স্বর্ণমুদ্রার ব্যয়ে এবং বহু শিল্পীর নিরলস পরিশ্রমে নূতন মন্দির নির্মিত হল—মন্দির তো নয় যেন সূর্যের সপ্তাশ্ব-চালিত স্বর্গীয় রথ। নরসিংহদেব আদিম সূর্য-মন্দির থেকে প্রাচীন সূর্যমূর্তিটি এনে এই নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন—শিবসামন্ত রায় পাত্রকে দিলেন নূতন খেতাব—'মহাপাত্র'।

মাদলাপঞ্জীর বিবরণকে যাঁরা আদৌ আমল দিতে রাজী নন তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে এ

তথ্যের সমর্থন আছে ইতিহাসে, আছে স্থাপত্য-নিদর্শনে। নরসিংহদেব (1238-64) এবং তাঁর বংশধরেরা নানান্ তাম্রশাসনে নরসিংহদেবকেই এ মন্দিরের নির্মাতা বলে বর্ণনা করেছেন। 'ত্রিকোণ-ক্ষেত্রে' উষ্ণরশ্মির (সূর্য) উদ্দেশে একটি 'মহৎ-কুটীরের নির্মাতা' বলে নরসিংহদেব উল্লিখিত হয়েছেন বারে বারে। কোণার্ক মন্দিরের প্রায় 8 কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে কুশভদ্রা নদীতীরে 'ত্রিকোণা' নামে একটি প্রাচীন জনপদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। কোণার্ক মন্দিরের চৌহদ্দিতে, বর্তমান মন্দিরের অনতিদূরে—দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীনতম একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। নরসিংহদেবের পুত্রের নাম ছিল 'ভানুদেব'—গঙ্গবংশে সূর্যের অষ্টোত্তর শত নামের মধ্যে থেকে এই প্রথম একটি নাম বেছে নেওয়া হয়েছিল। ভানুদেবের একটি শিলালিপি আছে সীমাচলমে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত রথোপম এই মন্দিরটির খ্যাতি যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল তার প্রমাণ পাই আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে। প্রায় তিনশ বছর পরে মুঘল-সম্রাট আকবরের (1556-1605) সভাসদ আবুল-ফজল এ মন্দিরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

"জগন্নাথের অনতিদূরে সূর্যের একটি মন্দির আছে। ঐ রাজ্যের দ্বাদশবর্ষের আয় এই মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হয়েছিল।[2] যাঁদের সহজে সন্তুষ্ট করা চলে না সেই ধরনের কঠিন বিচারকও এই মন্দিরটি দর্শনে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। প্রাচীরের উচ্চতা 150 হাত, বেধ উনিশ হাত। তিনটি প্রবেশ দ্বার। পূর্বদ্বারে সুনিপুণ হাতে গড়া দুটি হস্তি-মূর্তি, শুঁড়ে করে তারা প্রত্যেকে জড়িয়ে ধরেছে একজন মানুষকে। পশ্চিমদ্বারে দুটি অশ্বমূর্তি—সুসজ্জিত এবং সহিস সমন্বিত। উত্তরদ্বারে দুটি ব্যাঘ্রমূর্তি—তারা দুজন পদানত দুটি হস্তীর উপর উল্লম্ফনরত। মন্দির-সম্মুখে কালো আটকোণা পাথরের একটি শতহস্ত স্তম্ভ। নয়টি ধাপ অতিক্রম করার পর দেখা যাবে একটি প্রশস্ত সভামণ্ডপ, যার খিলানে সূর্যাদি গ্রহের মূর্তি খোদিত। সভামণ্ডপের চতুর্দিকে নানা শ্রেণীর ভক্তের মূর্তি। সকলেই শ্রদ্ধাবিনম্র—তাদের কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। তারা হাসছে, কাঁদছে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অথবা গভীর নিষ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে আছে নানান্ জাতের নর্তকী, সঙ্গীতমগ্নার দল অথবা বিচিত্র সব জন্তু জানোয়ার—শিল্পীর কল্পনা ছাড়া যাদের অস্তিত্ব অবাস্তব। শোনা যায় প্রায় 730 বৎসর পূর্বে রাজা নরসিংহ দেও এই অপূর্ব মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন এবং উত্তরপুরুষদের উদ্দেশ্যে রেখে যান।"

আবুল-ফজলের বর্ণনাটি অবশ্যই নিষ্ঠাভরে করা। দুটি বিষয়ে ভ্রান্তি নজরে পড়ছে। প্রথমতঃ, মন্দিরের তিনদিকে মূর্তিগুলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দিক-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে। হস্তিমূর্তি ছিল উত্তরদ্বারে, অশ্বমূর্তি দক্ষিণদ্বারে এবং হস্তিদলনকারী শার্দুলমূর্তিদ্বয় পূর্বদ্বারে। দ্বিতীয়তঃ, নরসিংহদেবের সময়কাল 730 বৎসর পূর্বে নয়, আবুল-ফজলের রচনাকালের প্রায় 300 বৎসর পূর্বে। কেউ কেউ বলেছেন, দুটি কারণে এই ভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। সুদূর আগ্রা থেকে কোণার্ক মন্দিরের নির্মাণকালের সঠিক নির্দেশ পাওয়া আবুল-ফজলের পক্ষে সহজ ছিল না, তাছাড়া নির্মাণকালটা হয়তো তিনি পুরী মন্দিরের পুরোহিতদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁরা মাদলাপঞ্জী-মতে কেশরী বংশের পুরন্দর কেশরীর সময়কালটাই জানিয়েছিলেন।

তবু যেহেতু আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা তাঁর সমগ্র বিবরণে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তাই এক কথায় ঐ '730 বৎসর' সংখ্যাটিকে উড়িয়ে দেওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। আসুন একটু বিচার করে দেখা যাক।

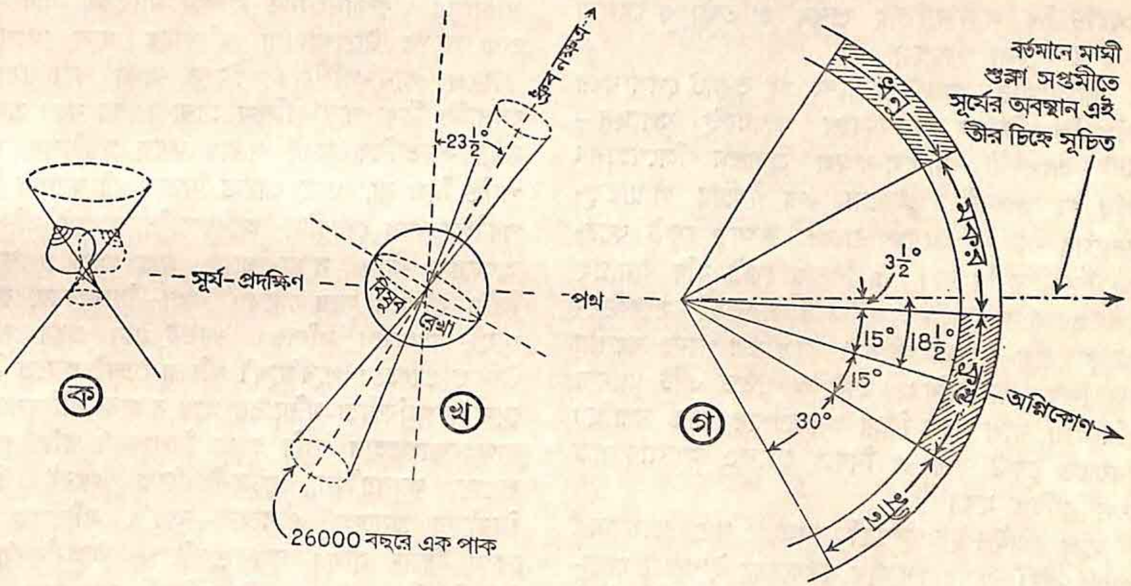
কোণার্ক-তীর্থের বার্ষিক উৎসব ও মেলা হয় মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে। অতি প্রাচীনকাল থেকে এই মেলা প্রচলিত। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ঐ তিথিতেই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পৌরাণিক যুগে। দশদিকের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণকে বলা হয় অগ্নিকোণ, যার অধিদেবতা অগ্নি তথা সূর্য। রাশিচক্রে অগ্নিকোণ হচ্ছে কুম্ভরাশির মাঝামাঝি অবস্থান অর্থাৎ কুম্ভের 15°। রাশিচক্র প্রদক্ষিণকালে সূর্যদেব যখন কুম্ভের 15°-তে অবস্থান করেন তখনই তিনি কোণার্ক। ঐ পুণ্য তিথিতেই কোণার্কের মহাযোগ এবং সম্ভবত সূর্যের ঐ অবস্থান সময়েই মেলার মাহেন্দ্রক্ষণ নির্ধারিত। আমরা কিন্তু বর্তমানে দেখছি সূর্যদেব যখন কুম্ভরাশির 15° অবস্থানে অধিষ্ঠিত তখন মাঘী শুক্লা সপ্তমী নয়। ফাল্গুন মাসে প্রচুর বিয়ের নিমন্ত্রণ পাই, তখন পুরোহিতদের মন্ত্র পড়তে শুনি,—'কুম্ভ রাশিস্থে ভাস্করে...'। অর্থাৎ হিন্দু শাস্ত্রমতে সূর্য বর্তমানে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি কুম্ভরাশির 15°-তে অগ্নিকোণে থাকছেন। তাহলে ঐ মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিটা এল কোন সুরঙ্গ পথে ?

এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখতে গেলে জ্যোতির্বিদ্যার একটি তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে। আমরা জানি, পৃথিবীর অক্ষরেখা সূর্য প্রদক্ষিণ-পথের তল থেকে 23°27′ অর্থাৎ প্রায় 23½° হেলে আছে। এ থেকেই কল্পিত হয়েছে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখা—এ জন্যই সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। পৌষ সংক্রান্তিকে বলি মকর-সংক্রান্তি, ঐ-দিন অতিক্রমণে ভাস্করদেব মকররাশিতে প্রবেশ করেন। শাস্ত্র মতে তারপর মাঘে মকররাশি, ফাল্গুনে কুম্ভরাশি, চৈত্রে মীন, বৈশাখে মেষ ইত্যাদি। এক এক সৌর মাসে সূর্য এক এক রাশিতে অবস্থান করেন। এটা সহজ তথ্য—এই ধ্রুব সত্যটি আমরা সকলেই জানি।

এই মাত্র একটা ভুল কথা বললাম। এটা ধ্রুব সত্য নয়। শুধু তাই নয়, 'ধ্রুব সত্য' বলতে আমরা যা বুঝি সেটাও অধ্রুব। 'ধ্রুব সত্য' কাকে বলি? আমরা জানি, পৃথিবীর আহ্নিকগতি যে অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে সেই কেন্দ্রস্থ অক্ষরেখাটিকে মহাকাশে বর্ধিত করলে সেটা ধ্রুব নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে লাগবে। ফলে অন্যান্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র আপাতদৃষ্টিতে যে-ভাবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ধ্রুব নক্ষত্র তা করে না। ঐ গতিহীনতাই 'ধ্রুবর ধ্রুবত্ব'! কিন্তু সেটাও শাশ্বত সত্য নয়। কেন তাই বলি :

একটা ঘূর্ণ্যমান লাট্টুর যখন দম ফুরিয়ে আসে তখন সেটা মাতালের মত টল্‌তে থাকে। তার 'আলটা' মাটিতে একটা বৃত্ত রচনা করে। অর্থাৎ তার অক্ষরেখা একটা শঙ্কু (cone) রচনা করতে থাকে (চিত্র—11·1ক)। পৃথিবীর অক্ষরেখাও নিরবধিকাল ঠিক অমনিভাবে অতি ধীরগতিতে একটি শঙ্কু রচনা করে চলেছে (চিত্র—11·1খ)। এভাবে পৃথিবীর অক্ষরেখা সম্পূর্ণ এক পাক দেয় দীর্ঘ 26000 বছরে।

এর ফলটি মারাত্মক। এতে ধ্রুব নক্ষত্রও তার ধ্রুবত্ব হারিয়ে ফেলে। বলতে পারি, আজ থেকে দশ-বারো হাজার বছর আগে বর্তমানে যে নক্ষত্রটিকে ধ্রুব নক্ষত্র বলছি, সেটিও প্রত্যহ চক্রাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত অর্থাৎ ধ্রুব নক্ষত্রের উদয়-অস্ত হতো। সে যাই হোক, পৃথিবীর অক্ষরেখার এই চক্রাবর্তনের জন্য সূর্য প্রত্যেক বৎসর নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে রাশিচক্রের ঠিক একই স্থানে থাকছে না। অতি ধীরে ধীরে সূর্যদেব রাশিচক্রে পিছিয়ে পড়ছেন। এই পিছিয়ে পড়ার বার্ষিক গতি প্রায় এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ বা এক মিনিট (1′)। এই তথ্যটির বৈজ্ঞানিক নাম অয়নচলন বা precession of the equinox.



চিত্র—11·1 'অয়ন-চলন' (Precision of the Equinar)-এর ব্যাখ্যা।

এবার আমরা কোণার্ক-মেলার প্রসঙ্গে ফিরে আসতে পারি। মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথি সাতই থেকে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আসে। মলমাস ও লীপ-ইয়ারের সংশোধন করে বলতে পারি, তারিখটা মোটামুটি দশই ফেব্রুয়ারী। বর্তমানে হিন্দু জ্যোতিষ অনুসারে দেখছি দশই ফেব্রু-

য়ারী সূর্যের অবস্থান মকর রাশির $26\frac{1}{2}°$-তে। অর্থাৎ কুম্ভের মাঝামাঝি অবস্থিত অগ্নিকোণ থেকে (মকরের $3\frac{1}{2}°$ এবং কুম্ভের $15°$ একুনে) $18\frac{1}{2}°$ সরে গেছে। চিত্র—11·1গ-তে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে। যেহেতু সূর্য প্রতি বৎসর $1/_{60}°$ ডিগ্রি করে পিছিয়ে যাচ্ছেন, তাই $18\frac{1}{2}°$ পিছিয়ে যেতে সূর্যের সময় লেগেছে $18\frac{1}{2}° \times 60 = 1110$ বৎসর। অর্থাৎ হিসাবে দাঁড়ালো যে,—যদি ধরে নিই দীর্ঘদিন পূর্বে কোন এক পুণ্য মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্যদেবের অগ্নিকোণে সংক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণে এই মেলার সূচনা হয়েছিল, তাহলে সেদিন আজ থেকে প্রায় 1110 বৎসর পূর্বে। সোজা কথায় নবম শতাব্দীর ষাটের দশকে। এবার বলি, আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল 1596 খ্রীষ্টাব্দ। আবুল-ফজলের হিসাব যদি নির্ভুল হয়, তবে তাঁর রচনাকালের 730 বৎসর পূর্বে ছিল 866 খ্রীষ্টাব্দ, নবম শতাব্দীর ষাটের দশক !!

আমার প্রশ্ন, আবুল-ফজলের ঐ '730 বৎসর' সংখ্যাটি কি সূর্যমূর্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা ও মেলার প্রবর্তন সূচনা করছে ?

'কলিঙ্গের দেবদেউল' গ্রন্থে এই তত্ত্বটি পেশ করে আমি লিখেছিলাম, 'অধিকাংশ গবেষকই বলছেন—'730' সংখ্যাটি আবুল-ফজল ভ্রমক্রমে লিখেছেন। আমি যে প্রশ্নটি তুললাম এর বিচার পুরাতত্ত্ব-বিভাগের কোনও গবেষণা-গ্রন্থে কোথাও কেউ করেছেন কিনা জানি না। এ বিষয়ে কেউ যদি অনুগ্রহ করে আলোকপাত করেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে সেটুকু যোগ করতে পারি।' গত দশ-পনের বৎসরে কেউ কিছু জানাননি। তাই আপাতত এটি আমার আবিষ্কার বলে ধরে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। ভবিষ্যতে কেউ যদি এ বিষয়ে কোনও আলোকপাত করেন বাধিত হব।

মূল আইন-ই-আকবরী পড়ার মত ভাষাজ্ঞান আমার নেই। স্যার যদুনাথ সরকারের ইংরাজী অনুবাদে দেখছি লেখা আছে—"It is said that somewhat over 730 years ago, Raja Narasing Deo completed this stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity."[3] স্যার যদুনাথের অনুবাদে ভুল থাকতে পারে এ-কথা কল্পনা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ! কিন্তু অনুবাদটা কি এ-ভাবে হতে পারত—"It is said that Raja Narasing Deo completed this stupendous fabric started somewhat over 730 years ago and left this mighty memorial to posterity."

স্টার্লিং সাহেবের মতে রাজা লাঙ্গোয়া নরসিংহ দেব তাঁর মন্ত্রী সিবাই সৌত্রের তত্ত্বাবধানে এ মন্দির নির্মাণ করান 1241 খ্রীষ্টাব্দে।[4] উইলিয়াম হাণ্টার বলছেন, মন্দির নির্মিত হয়েছিল 1237 থেকে 1282 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।[5]

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা সভয়ে নিবেদন করি। সভয়ে বলছি এই কারণে যে, এটিও অনধিকারী বর্তমান গ্রন্থকারের উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। এ-বিষয়েও পূর্বাচার্যরা কেউ বিচার করেছেন বলে জানি না। অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ্যে এটিও নিবেদন করে গেলাম। বিষয়টা ভুবনেশ্বরে অবস্থিত মন্দিরগুলির দিক্-নির্ণয় বা 'ওরিয়েণ্টেশান্'।

মোটামুটিভাবে বলা চলে মন্দিরগুলি পূর্বমুখী। তিনটিমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম : পরশুরামেশ্বর আর মুক্তেশ্বর পশ্চিমমুখী এবং কেদারেশ্বর দক্ষিণমুখী। কেদারেশ্বর না হয় অন্যান্য নিকটস্থ মন্দিরের অবস্থানজনিত কারণে ব্যতিক্রম—বাদ বাকি প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মূল অক্ষরেখা তাহলে পূর্ব-পশ্চিম। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখছি, সেগুলি ঠিক পূর্ব-পশ্চিম রেখা-বরাবর নয়। ভ্রমণের সময় স্বাভাবিকভাবেই আমার কাছে জরীপের যন্ত্রপাতি ছিল না, তবু আমার নিত্যসঙ্গী কম্পাস দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, অনেকগুলি ক্ষেত্রেই মন্দিরের অক্ষরেখা অতি সামান্যভাবে, মাত্র আট থেকে নয় ডিগ্রি দক্ষিণে সরে গেছে। যথা—সিদ্ধেশ্বর, রাজারানী, জগন্নাথ মন্দির। স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে, উন্মুক্ত প্রান্তরে পূর্বমুখী মন্দির তৈরী করতে গিয়ে কেন বাস্তুবিদেরা মন্দিরের মুখ সামান্য বাঁকিয়েছেন। নাগর-স্থাপত্যের আদি গুরু বিশ্বকর্মা তাঁর বাস্তুশাস্ত্রে ভূ-পরীক্ষা, কাল-নির্ণয়ের পরেই দিক-নির্ণয়ের প্রসঙ্গে এসেছেন,—অর্থাৎ মন্দিরের মুখ কোন দিকে হবে। ভুবন-প্রদীপেও কাল-নির্ণয় ও দিক-নির্ণয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার কিছুটা বোঝা যায়, কিছুটা বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তাধারায় দুর্বোধ্য। শাস্ত্রকারের মতে বনিয়াদের নিচে আছেন বাস্তুনাগ—তিনি ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছেন। গৃহারম্ভের কাল ও দিক-নির্ণয় সেই চক্রাবর্তনের ছন্দে বাঁধতে হবে। কিন্তু বাস্তুবিদেরা তো গৃহারম্ভের কালটা আগিয়ে পিছিয়ে পাশাপাশি মন্দিরগুলিকে সমান্তরাল করতে পারতেন ? পর পর তিনটি প্রায় সমসাময়িক মন্দিরের ক্ষেত্রে মন্দিরের মুখ পূর্ব থেকে $8\frac{1}{2}°$ দক্ষিণে সরে গেছে কেন ? ভুল এটা কিছুতেই নয়। খ্রীষ্টপূর্ব

1680 অব্দে স্টোন হেঞ্জের বাস্তুবিদ যে দিক-নির্ণয়ে ভুল করেননি, পিরামিডের নির্মাতা যে ভুল করেননি, এত পরে কলিঙ্গ-স্থপতি সেটা করেছেন এটা অবিশ্বাস্য। তাহলে ?

আবার আমরা অয়নচলনের হিসাবটি পরীক্ষা করে দেখতে পারি। 21শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় হচ্ছে পূর্ব দিগন্তের $23\frac{1}{2}°$ দক্ষিণে। 21শে মার্চ হচ্ছে ঠিক পূর্বদিকে। সুতরাং ঐকিক নিয়মে পূর্বদিক থেকে $8\frac{1}{2}°$ দক্ষিণ-ঘেঁষে সূর্যোদয় হবে 16ই ফেব্রুয়ারী। অর্থাৎ মন্দিরের সব কয়টি দরজা খোলা থাকলে ঐ তিনটি মন্দিরের দেব-বিগ্রহে উদয়ভানুর স্পর্শ লাগবে যে তারিখে সেটা 16ই ফেব্রুয়ারী। বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে ঐ তারিখে সূর্যের অবস্থান কুম্ভরাশির 1°-তে। যদি এক্ষেত্রেও ধরে নিই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সূর্যদেব যখন কুম্ভরাশির মধ্যস্থলে ঐ অগ্নিকোণে, তাহলে আমরা বলতে পারি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়টা আজ থেকে $14 \times 60 = 840$ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ 1130 খ্রীষ্টাব্দে। সিদ্ধেশ্বর ও রাজারানী মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলেই মনে হয়।

জানি না, এ হিসাব কাকতালীয়ভাবে মিলে গেল কিনা। আমার বক্তব্য মন্দিরগুলি এই যে বিভিন্ন দিকে মুখ করে আছে এটার কারণ সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশ আছে। প্রকৃত অধিকারীই সে কাজ করতে পারেন।

সে যাই হোক, কোণার্ক মন্দির সম্বন্ধে পরবর্তী উল্লেখটি পাচ্ছি 1628 খ্রীষ্টাব্দে। সেটিও মাদলা-পঞ্জীতে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে খুর্দার রাজা, তিনিও নরসিংহদেব (খুর্দার ভোই বংশের তৃতীয় রাজা) কোণার্ক মন্দির দর্শন করতে যান 1628 খ্রীষ্টাব্দে। সে সময় উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন বাখর খাঁ, যিনি দিল্লীশ্বর শাহ সেলিমের[6] প্রতিনিধি হিসাবে উড়িষ্যার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মাদলা-পঞ্জী বলছেন, খুর্দার রাজা কোণার্ক মন্দিরে কোনও বিগ্রহ দেখতে পাননি—কারণ পূর্ববর্তী যবন আক্রমণের আগেই অর্কতীর্থের বিখ্যাত মৈত্রেয়াদিত্য-বিরিঞ্চিদেবের (সূর্যদেবের) মূর্তিটি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে (পুরীতে) অবস্থিত নীলাদ্রিমহোৎসব-মন্দিরে (জগন্নাথদেবের মন্দিরে) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মহারাজ তাঁর অমাত্য নাথমহাপাত্রের সাহায্যে শূন্য মন্দিরটির মাপ নেন ও লিপিবদ্ধ করেন। মহারাজের দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অষ্টবিংশতি অঙ্গুলি-বিশিষ্ট একটি দণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন অংশের মাপ নেওয়া হয়। মহারাজের অষ্টবিংশ অঙ্গুলিতে কত মিটার বা কত সেণ্টিমিটার হয়েছিল তা আমরা জানি না ; কিন্তু ঐকিক নিয়মের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হিসাব থেকে আমরা অনায়াসেই ভেঙে-পড়া দেউলের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি। সে হিসাব যথাসময়ে করা যাবে।

খুর্দার রাজার ঐ মাপ ও বিবরণ থেকে দেখছি যে, দেউলের শীর্ষে আমলকের উপরে কলসটি নাই, পদ্মধ্বজাটিও অপহৃত, তবু তখনও কলস ও আয়ুধের যে দণ্ড (চুম্বক-লোহা-ধারণ) সেটি স্বস্থানে আছে। কলস ও আয়ুধটি ছিল তামার। যবনরা সেগুলি অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—হয়তো সেটা সোনার ভেবে, অথবা তামার লোভেই, কিম্বা শুধুমাত্র ধর্মবৈরিতার কারণে।

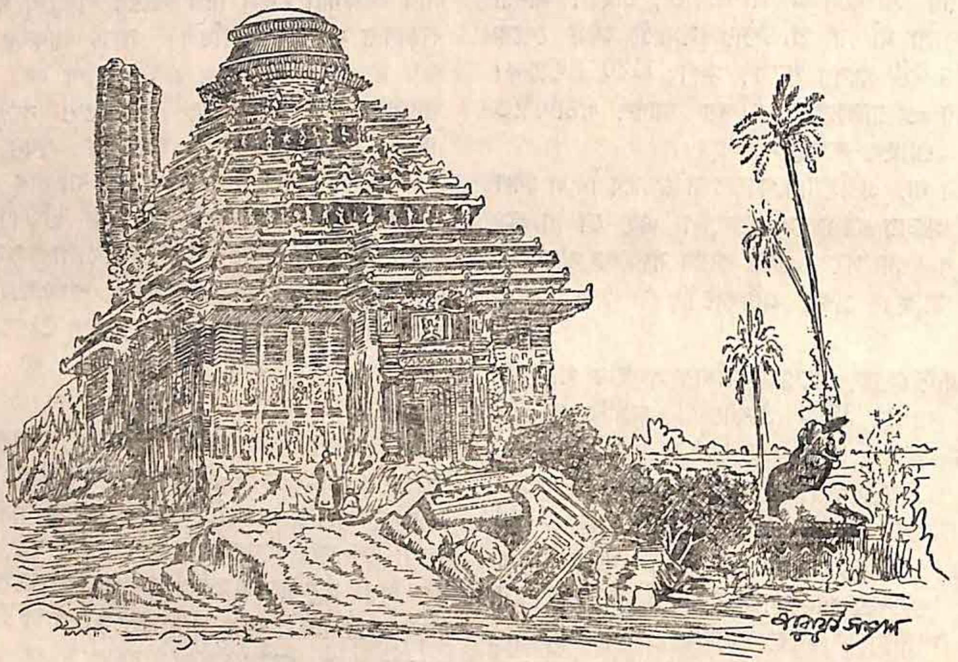
এই যবন আক্রমণের সময়কালটা আকবরের শাসনকালেই, ষোড়শ-শতাব্দীর শেষপাদে। সে সময়ে বাঙলার আফগান নবাব দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ খুঁজছিল। সম্রাট আকবর উড়িষ্যা-রাজ মুকুন্দদেবের সঙ্গে একটি সন্ধি করে আফগান আক্রমণের বিষয়ে তাঁকে আশ্বস্তও করেছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মুগলসম্রাট যখন পশ্চিম সীমান্তের রণক্ষেত্রে ব্যস্ত তখন বাঙলার আফগান নবাব সুলেমান করনানী অতর্কিতে উড়িষ্যা আক্রমণ করে। নবাবের সেনাপতি ধর্মান্ধ কালাপাহাড়কে এই অভিযানের নেতৃত্ব করতে পাঠায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারে বারে যে দুর্ভাগ্যকে ঘনিয়ে উঠতে দেখেছি উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এবারও তাই হল। এই দুঃসময়ে মুকুন্দদেবের অমাত্যরাও সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মুকুন্দদেবের পক্ষে কালাপাহাড়কে প্রতিহত করা সম্ভবপর হল না। মুকুন্দদেব নিরুপায় হয়ে কোণার্কের বিগ্রহটি পুরীর মন্দিরে স্থানান্তরিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। সে যুদ্ধে বুকের রক্ত দিয়ে মুকুন্দদেব তাঁর অমাত্যদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যান। আর কালাপাহাড়ের অপকীর্তি মহাকালের বুকে চিরস্থায়ী হয়ে রইল উড়িষ্যার নানান্ দেব-দেউলে। এই মুকুন্দদেবই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা।

সে যাই হোক, কোণার্ক মন্দিরের পরবর্তী উল্লেখ যেটি পাচ্ছি সেটি এ. স্টারলিং-এর। খুর্দা রাজার কোণার্ক দর্শনের দুইশত বৎসর পরে, 1825 খ্রীষ্টাব্দে। স্টারলিং তাঁর বিবরণে বলছেন—জগমোহনটি অটুট থাকলেও মূল দেউলটি ছিল ভগ্নাবস্থায়। তবু সেই রেখ-দেউল "তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। উচ্চতায় প্রায় 125 ফুট। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পালতোলা একটি জাহাজ।" জেমস্

ফার্গুসন মন্দিরটি দেখেন তার বারো বৎসর পরে। 1837 খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মতে রেখ-দেউলের যে উচ্চতা তিনি দেখেছিলেন তা 140 থেকে 150 ফুট—অর্থাৎ বর্তমান জগমোহনের চেয়েও বড়। ফার্গুসনের অনুমানই যে ঠিক অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্টারলিং যে ঠিকমত আন্দাজ করতে পারেননি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে ফার্গুসনের 1837 খ্রীষ্টাব্দে হাতে-আঁকা একটি ছবিতে। পুরাতত্ত্ববিদ ফার্গুসনের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান ছিল—তিনি ঐ চিত্রে মন্দিরটিকে পতঙ্গ-দৃষ্টিকোণ (worm's eye-view) থেকে এঁকেছেন। ফলে বেশ বোঝা যায়, রেখ-দেউলের উচ্চতা জগমোহনের চেয়ে বেশী। ফার্গুসন-সাহেবের ঐ চিত্রটির একটি অনুলিপি সাধ্যমত এঁকে দেখানোর চেষ্টা করেছি চিত্র—11·2-এ।

প্রকাণ্ড পাথরগুলি বসানোর আগেই নিশ্চয় বনিয়াদ ধ্বসে যেত।"

আমরা ব্রাউন-সাহেবের সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারছি না। "নিশ্চয় বনিয়াদ ধ্বসে যেত" এটা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ (fairly clear proof) মোটেই নয়—এটা লেখকের নিছক অনুমান—এবং সে অনুমানের সমর্থনে তিনি ঐ জমির ভারবাহী ক্ষমতা (bearing power of soil) পরীক্ষা করে যে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তারও কোনও প্রমাণ নেই। মন্দির যদি অসমাপ্ত থাকত তাহলে আবুল-ফজল নিশ্চয় সে কথা উল্লেখ করতে ভুলতেন না। তাছাড়া, মন্দির সমাপ্ত না হলে দেব-পূজা শুরু হত না এবং সেক্ষেত্রে হিন্দু-পুরাণে এটিকে মহাতীর্থ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। মাদলাপঞ্জীও নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করতেন।



চিত্র—11·2 কোণার্ক—1837
[ফার্গুসনের স্কেচ থেকে লেখক কর্তৃক অনুকৃত।]

মূল রেখ-দেউলটি কেন ভেঙে পড়েছিল এ সম্বন্ধে নানা মুনি নানা কথা বলেন। কারও কারও মতে ঐ রেখ-দেউলটি আদৌ সমাপ্ত হয়নি। পার্সি ব্রাউন বলেছেন[7]—"এ গ্রন্থে কোণার্ক মন্দিরের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে হয়তো সেভাবে মন্দিরটি আদৌ শেষ করা সম্ভবপর হয়নি। এ সন্দেহ করার পিছনে প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। কারণ রেখ-দেউলের উপরকার

সুতরাং পার্সি ব্রাউন-সাহেবের 'প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-নির্ভর' সিদ্ধান্তটিই বরং ধ্বসে গেল!

এ ছাড়াও প্রমাণ আছে। ফার্গুসনের চিত্রে[8] দেখছি অন্যূন দ্বাদশটি ভূমি-আমলক টিকে আছে (1837-এ)। কোন রেখ-দেউল দ্বাদশ ভূমি পর্যন্ত নির্মিত হলে সেটা কখনই পাঁচশ বছর টিকে থাকতে পারে না, যদি না তার উপর আমলক-শিলাটি বসানো

হয়। খুর্দা রাজার কলসদণ্ডের সুস্পষ্ট উল্লেখও যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি বড়-দেউলের উচ্চতা মেপে লিপিবন্ধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় দেউলটি ভেঙে গেছে। সেটা অসম্ভব মনে হয়েছে আমাদের কাছে। বনিয়াদ বসে যাবার কোন লক্ষণ সংলগ্ন জমিতে দেখা যায় না, তাছাড়া সেক্ষেত্রে সন্নিকটস্থ জগমোহনটি কিছুতেই টিকে থাকত না। ভূকম্পনের যুক্তিও অনুরূপ কারণে মেনে নেওয়া চলে না। বজ্রাঘাতে এ মন্দিরের অতবড় ক্ষতি হতে পারে না। মন্দিরটি ভেঙে পড়ার বিষয়ে শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্র[9] যে যুক্তি দেখিয়েছেন আমরা তাকেই সর্বান্তঃকরণে মেনে নিই। তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নোক্তরূপ :

যবন আক্রমণের আশঙ্কায় দেব-বিগ্রহটি পুরীতে অপসারিত হবার পরে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজাদের কাল শেষ হয়েছিল। হিন্দুর কাছে বিগ্রহহীন মন্দিরের কোন মূল্যই নেই। ওদিকে যবনরা কলস অপহরণ করে নিয়ে যাবার পর উপর থেকে বর্ষার জলধারা মন্দিরে প্রবেশ করতে থাকে। কালে সেখানে বট-অশ্বত্থ গাছ জন্মগ্রহণ করে। বিগ্রহহীন মন্দিরের অবহেলিত দেউলে সে গাছ ক্রমে বাড়তেই থাকে। ফলে কোন এক সময় কর্বেল-করা দেউলের গণ্ডী অংশ ভেঙে পড়ে। দেউলের উপর জগমোহনের দিকে ঝুঁকে থাকা প্রকাণ্ড উড়-গজসিংহটি পড়ে জগমোহনের উপর। ঐ ভদ্র-দেউলের কিছুটা ক্ষতি করে গড়িয়ে পড়ে উত্তরদিকে। সেই প্রকাণ্ড উড়-গজসিংহটিকে তিন টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে। সেটি এখনও পড়ে আছে জগমোহনের উত্তর প্রান্তে। প্রশ্ন হতে পারে—যবন আক্রমণের পরে নূতন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কেন হল না? মন্দির তো তখনও অটুট ছিল। কাশী বিশ্বনাথে, সোমনাথে তো তা হয়েছিল। সম্ভবত ষোড়শ-শতাব্দী থেকেই এ অঞ্চলের আর্থিক অবনতি হতে থাকে। নাব্য-নদী শুকিয়ে যাওয়ায় বাণিজ্যের পথ বদলে যায়। জনপদগুলি জনশূন্য হতে থাকে। তার ফলে এ মন্দিরে আর নূতন বিগ্রহ বসানো হয়নি। দেবতাহীন দেউল পড়েছিল উপেক্ষিত হয়ে।

ফার্গুসন মন্দিরের ঐ চিত্রটি আঁকেন 1837 সালে। পর বৎসর কিট্টো ঐ মন্দির দর্শন করে লিখেছিলেন[10]—"(রেখ-দেউলটির) একটা কোণা এখনও দাঁড়িয়ে আছে—উচ্চতায় 80 থেকে 100 ফুট, এবং দেখলে মনে হয় যেন বাঁকা একটি স্তম্ভ।"

পরবর্তী দর্শক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 1868 সালে তিনি রেখ-দেউলটি সম্বন্ধে বলছেন,[11]—"প্রস্তরাকীর্ণ প্রকাণ্ড এক ভগ্নস্তূপ, শুধু এখানে-ওখানে বট-অশ্বত্থের চারা।" রাজেন্দ্রলাল রেখ-দেউলের কোন চিহ্ন দেখতে পাননি, তার কারণ 1848 সালে উড়িষ্যায় যে প্রচণ্ড সাইক্লোন এসেছিল সম্ভবত তাতেই রেখ-দেউলের চূড়াটি ভেঙে পড়ে।

একটা কথা। স্টারলিং অথবা ফার্গুসন কোণার্ক মন্দিরের রথের পরিকল্পনা বুঝতে পারেননি। এ মন্দিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শন—চক্রগুলি এবং রথাশ্ব তাঁরা দেখতে পাননি, কারণ মন্দিরের প্রায় পাঁচ মিটার তখনও বালির মধ্যে অবলুপ্ত ছিল।

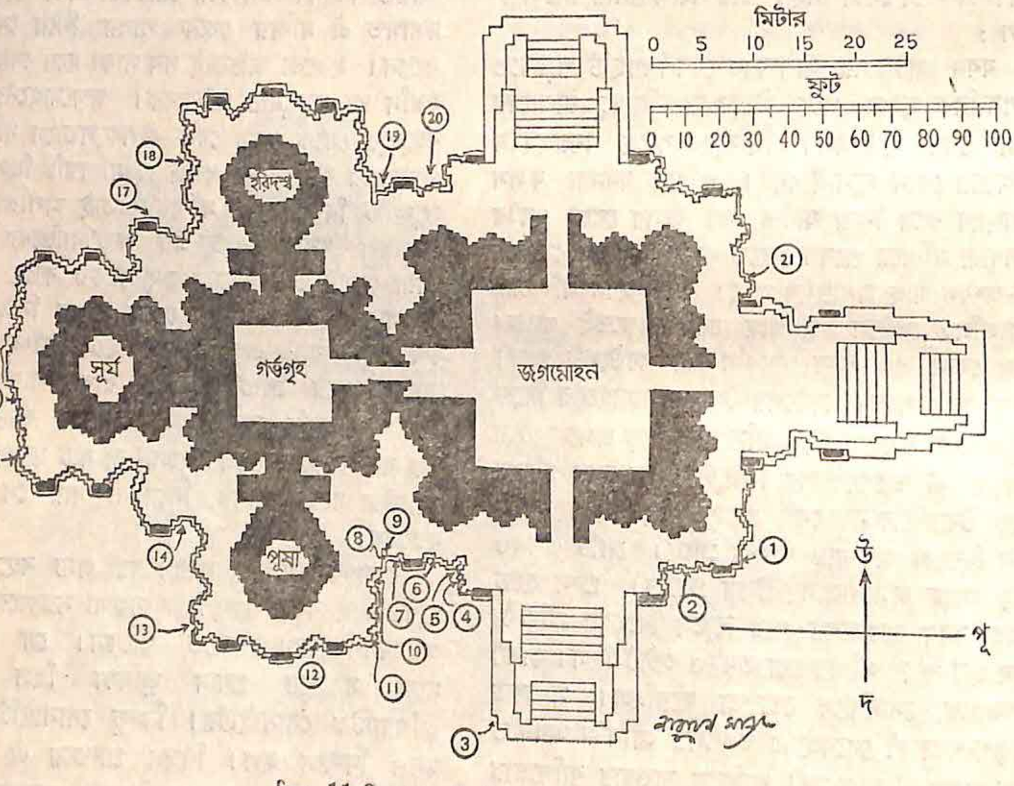
রেখ-দেউলটি ভেঙে গেছে মহাকালের অঙ্গুলি-হেলনে ; কিন্তু জগমোহনটির দুঃখের কাহিনী আরও করুণ। স্থানীয় লোকেরা এবং খুর্দার রাজা ক্রমাগত ঐ মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যেতে শুরু করেন। হয়তো অচিরেই সব সাফা হয়ে যেত—তা যে হয়নি তা শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে। জগমোহনের চূড়াটি বহুদূর থেকে দেখা যেত—উপকূলভাগে বণিকদলের জাহাজের কাপ্তেনদের কাছে ঐ মন্দিরটি ছিল একটি সুস্পষ্ট দিক্‌চিহ্ন। মন্দিরটি তাই অপরিহার্য মনে হয়েছিল 'মেরিন-বোর্ড'-এর কর্তাব্যক্তিদের কাছে। তাঁরা ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন যাতে ঐ মন্দির থেকে পাথর নিয়ে যাওয়া বন্ধ করা হয় ; এবং সম্ভব হলে মন্দিরটি যেন মেরামত করে সেটি টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।[12] গভর্ণর জেনারেল মেরামতের জন্য কোনও ব্যয় বরাদ্দ করতে রাজী হলেন না বটে তবে স্থানীয় লোকেরা যাতে পাথর নিয়ে না যায় সে ব্যবস্থা করলেন।

কোণার্ক মন্দির সংরক্ষণের জন্য বহু জ্ঞানী-গুণী এবং বহু সাংস্কৃতিক সংস্থা সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে থাকেন। সে প্রচেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল বাঙলার এশিয়াটিক সোসাইটির। কিন্তু সোসাইটির আবেদনও নিষ্ফল হল। বিজন প্রান্তরে ঐ মন্দিরটি সংরক্ষণের কোনও প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি তদানীন্তন বিদেশী সরকার। ইতিমধ্যে জগমোহনের পূর্বদ্বারে অবস্থিত নবগ্রহের প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডটি ভেঙে পড়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সেটি কলকাতার যাদুঘরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন—কিন্তু মন্দির চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে আসতে গিয়েই সোসাইটির বরাদ্দ ব্যয় নিঃশেষিত হয়ে গেল। সেটা 1867 সালের কথা। ইতোমধ্যে ছোটলাট স্যার অ্যাস্‌লি ইডেন সরেজমিনে মন্দিরটি দেখতে এলেন। এবার সরকার থেকে সামান্য ব্যয়বরাদ্দ

মঞ্জুর হল। ফলে 1881 সালে অর্থাৎ স্টারলিং-এর প্রথম দর্শনের ছাপ্পান্ন বছর পরে আমাদের সহৃদয় বিদেশী শাসক মন্দিরটির মেরামতিতে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে এলেন। প্রথম দু-তিন বছরে কাজ হল যৎসামান্য। কিছুটা জঙ্গল কাটা হল এবং মন্দিরদ্বারের তিন-দুগুণে ছয়টি প্রকাণ্ড মূর্তিকে (হস্তী, অশ্ব এবং হস্তিদলনকারী শার্দুল)—মন্দিরের অনতিদূরে এক একটি পাদপীঠ তৈরী করে বসানো হল। ক্রমক্রমে হস্তী এবং অশ্বকে বসানো হল মন্দিরের দিকে মুখ করে—আসলে তারা ছিল মন্দিরের দিকে পিছন করে; এবং শার্দুলের জোড়াটিকে বসানো হল জগমোহনের পূর্বদিকে উঁচু একটি বালির ঢিবির উপর। এই বালির ঢিবির তলা থেকেই পরে আবিষ্কৃত হয়েছে ভোগমণ্ডপটি—ফলে এই শার্দুলদ্বয়কে পুনরায় স্থানচ্যুত করে বসানো হয়েছে ভোগমণ্ডপের সামনে। মজার কথা, সেখানেও পুরাতত্ত্ব অথবা পূর্ত-বিভাগের কর্তারা লক্ষ্য করে দেখেননি যে, পাদপীঠের প্রস্তর-খণ্ডটি উল্টো করে বসানো হয়েছে। এ ভুল আর সংশোধিত হয়নি। তাই আজও দেখতে পাবেন দক্ষিণদিকের শার্দুলের পাদপীঠে খোদাই করা হাতীর সারি আকাশের দিকে পা তুলে হাঁটছে।

কোণার্কের প্রকৃত সংস্করণ শুরু হল 1901 খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের সৌভাগ্য যে, বঙ্গভঙ্গকামী কার্জন-সাহেবের পুরাতত্ত্বের প্রতি সত্যিই দরদ ছিল। পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্ণধাররূপে জন হাণ্টারও তখন সবে এসেছেন। ফলে এবার সত্যিকারের কাজ হল। বালির স্তূপ সরানো হল—আবিষ্কৃত হল কোণার্কের রথের স্বরূপ। বহু শতাব্দীর পর রথের চাকা, রথাশ্ব আবার সূর্যের মুখ দেখল বালির সমাধি বিদীর্ণ করে। এর পরই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জগমোহনটিকে চিরকালের জন্য ভরাট করে দেওয়া হয়। পনের ফুট চওড়া (4·57 মিটার) পাঁচিল তোলা হল জগমোহনের ভিতর চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে। উপর থেকে বালি ঢেলে সেটিকে একেবারে নিরেট করে দেওয়া হল। একমাত্র দুঃখের কথা, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার আগে ভিতরে কী ছিল, তার স্কেচ এবং বিস্তারিত বিবরণ বোধহয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ থেকে রাখা হয়নি। অন্ততঃ আমি সন্ধান পাইনি।

কোণার্ক মন্দিরের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত করে



চিত্র—11·3 কোণার্ক মন্দিরের বাস্তু-নক্শা।

এবার আমরা বরং মন্দিরটি দেখতে শুরু করি। কোণার্ক-দর্শকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা সময়াভাব। যদিও সেখানে মধ্যবিত্তদের জন্য একটি পান্থ-নিবাস ও উচ্চবিত্তদের জন্য একটি টুরিস্ট লজের ব্যবস্থা হয়েছে এবং কিছু হোটেলও নির্মিত হয়েছে —কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সে সুযোগ নিতে চান না। তাঁরা পুরী থেকে ঝটিকা-গতি বাসে করে এসে একই-দিনে কোণার্ক, ভুবনেশ্বর দেখে কলকাতায় ফিরে আসেন। কোণার্ক মন্দিরে সংখ্যাতত্ত্ব রাখা হয় না—কিন্তু আমার তো মনে হয় শতকরা আশীজন বাঙালী যাত্রী কোণার্ক দেখার জন্য ব্যয় করেন ঘণ্টা তিন-চার। অন্ততঃ আট ঘণ্টার কম সময়ে কোণার্ক মন্দির মোটামুটি দেখা, তার থেকে রসাস্বাদন করা সম্ভবপর নয়। তবু যেহেতু অধিকাংশ যাত্রী অতি অল্প-সময়ে দর্শনীয় শিল্পনিদর্শনগুলি দেখে নিতে চাইবেন, তাই তাঁদের সুবিধার জন্য চিত্র—11·3-এ বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দ্রব্যের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিলাম। এই চিত্রটি সংযুক্ত জগমোহন ও বড়-দেউলের। চিত্রে সমগ্র মন্দির-চত্বরের প্রধান দ্রষ্টব্যের অবস্থান সূচিত হয়েছে। আমরা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে দ্রষ্টব্য বিষয়ের অবস্থানসূচক চিহ্নটি উল্লেখ করে যাচ্ছি যা থেকে অনায়াসে পরিদর্শনকালে অল্পসময়ে শিল্পনিদর্শনটি খুঁজে নেওয়া যায়।

চিত্র—11·3-এ গাঢ় কালো রঙে আঁকা অংশটাই মন্দিরের বাস্তু-নক্শা, তার চারপাশে খোলা রকের মত। এই খোলা চাতালের বাহির দিক দিয়ে জমির সমতলে প্রথমে আমরা যুগ্ম-দেউলকে প্রদক্ষিণ করব পূর্বপ্রান্তের সোপানের কাছ থেকে। এই খোলা চাতালের শেষপ্রান্তে যে খাড়া অংশ, ইংরাজীতে যাকে বলে বাড়ির প্লিন্থ—বাঙলায় কোন কোন জেলায় বলে 'পোতা'—সেই অংশের নাম পিষ্ঠ। আমরা প্রথমে বাইরের দিক থেকে এই 'পিষ্ঠ'টি ঘুরে ঘুরে দেখব। এইখানেই আছে বৃহদায়তন রথচক্রগুলি। জগমোহনের পূর্বদিকে যে সিঁড়ি আছে তার প্রত্যেক দিকে দুটি করে সর্বসমেত চারটি চক্র আছে। দক্ষিণ-দিকে ছিল চারটি রথাশ্ব। তার ভিতর মাত্র দুটির মাথা আছে—দ্বিতীয়টির অনেকটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। চক্রগুলির বহিরঙ্গ মোটামুটি একই, যদিও কারুকার্যে তফাত আছে। রথচক্রগুলির ব্যাস 2·74 মি ; এতে আটটি বড় অর (স্পোক) এবং আটটি ছোট অর আছে। বড় অরগুলি সরু থেকে মোটা এবং আবার মোটা থেকে সরু হয়ে নেমিতে (রিম অংশে) গিয়ে মিশেছে। ফলে বড় অরগুলির মধ্যাংশে গোলাকার একটি নক্শা কাটা সম্ভবপর হয়েছে। প্রতিটি চক্রে এই রকম আটটি গোলাকার নক্শা এবং অক্ষাগ্রে (অ্যাক্সেল-প্রান্তে) আর একটি নক্শা নিয়ে সর্বসমেত নয়টি নক্শার স্থান। তাতে স্ত্রী, পুরুষ, মিথুনচিত্র, দেবদেবীর মূর্তি আছে। নেমি অংশে পল-তোলা ফুল-লতা-পাতা এবং সরু অরে গোলাকৃতি বলের মত মুক্তার সারি।

সবার নিচে উপানে আছে হাতীর সারি, শিকারের দৃশ্য, শোভাযাত্রার দৃশ্য ইত্যাদি। হাতীই বেশী —গুণে দেখা গেছে একমাত্র উপান-অংশেই বিভিন্ন অবস্থানে অন্যূন এগারো শত হাতীর মূর্তি খোদাই করা আছে। হাতী শিকারের দৃশ্য, দলবন্ধ বন্য-হস্তীর জীবনযাত্রা, হাতীর যুদ্ধ ইত্যাদি। উপানের উপরে পা-ভাগের পাঁচকাম—খুর-কুম্ভ-পাটা-কাণি ও বসন্ত। এর ভিতর পাটায় জীবজন্তুর চিত্র এবং বসন্ত নক্শা-কাটা।

তল-জঙ্ঘাতে কিছু দূরে কাখর-মুণ্ডি সম্বলিত স্তম্ভ। তার কুলুঙ্গিতে নানান্ দৃশ্য। দুটি কাখর-মুণ্ডি স্তম্ভের মাঝে মাঝে কখনও দুটি কখনও বা তিন-চারটি খাড়া পাথর। এই খাড়া পাথরগুলিতেও নানান্ জাতের ভাস্কর্যের নিদর্শন। সেগুলি অধিকাংশই মিথুন-মূর্তি, অলসকন্যা, বিরাল, অথবা নাগ-মূর্তি।

তল-জঙ্ঘার উপরে বন্ধনের তিনকাম—পাটা-কাণি-বসন্ত। পাটা ও বসন্তে নক্শা কাটা, ফুল-লতা-পাতা অথবা জীবজন্তু। কিছু দূরে দূরে এই তিনটি উপভাগকে যুক্ত করে একটি খাড়া পাথরে নক্শার কাজ।

উপর-জঙ্ঘাতে দেখছি—নিচের তল-জঙ্ঘার কাখর-মুণ্ডি স্তম্ভের উপর-উপর আবার একটি করে পদ্ম-শীর্ষ অর্ধস্তম্ভ। এই অর্ধস্তম্ভগুলি পঞ্চরথ পর্যায়ের। তল-জঙ্ঘার মূর্তিগুলির ঠিক উপর-উপর এখানেও এক সারি মূর্তি।

উপর-জঙ্ঘার উপরে হচ্ছে বড়ণ্ডির স্থান। সেটি অক্ষত নেই, শুধুমাত্র নিচের উপভাগ—একটি পাটা, অনেকাংশে অটুট আছে। ঝোলা-বারান্দার (ক্যাণ্টি-লিভার) মত অনেকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। তার খাড়া গায়ে অপূর্ব নক্শার কাজ, অনেকটা উপানের মতো। উভয়ের আকারও প্রায় সমান। এবার আমরা ঘুরে ঘুরে মূর্তিগুলি দেখব। অধিকাংশ মূর্তি অথবা নক্শায় অবশ্য বোঝাবার কিছু নেই—তাদের সৌন্দর্য স্বয়ং-প্রকাশ। অলসকন্যা, বিরাল, নাগিনী অথবা মিথুন-মূর্তিতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অজন্তাতে যেমন ধারাবাহিক কাহিনী-চিত্র দেখতে পাওয়া যায় এখানে সে রকম নেই। ফলে

আমরা শুধু বিশেষ মূর্তি—যা নাকি দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে তার দিকেই এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, চিত্র—11.3-এ বর্ণিত সংখ্যা অনুসারে অবস্থান নির্দেশ করে।

(1) উপান-অংশে এইখানে লক্ষ্য করে দেখুন খেদার সাহায্যে বন্য হাতী ধরার দৃশ্য।

(2) শৈব-শাক্ত এবং বিষ্ণু উপাসকদের এই শিল্প-নিদর্শনে সমপর্যায়ে দেখান হয়েছে। দেখছি, একটি মন্দিরে পাশাপাশি পূজা পাচ্ছেন মহিষমর্দিনী, জগন্নাথ এবং শিবলিঙ্গ। তার বামে দেখছি, রাজা এসেছেন পূজা দিতে, সঙ্গে রাজানুচরও আছে—পূজার্থী রাজা মন্দির-পুরোহিতের হাতে একটি বরমাল্য প্রদান করছেন। তার তলায় দেখছি, মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করছে দুটি রাজহস্তী—মাহুতও আছে সঙ্গে। সূর্যমন্দিরে এই ভাস্কর্য-নিদর্শনটিতে সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের একটা ইঙ্গিত রয়েছে—আরও লক্ষণীয় যে, ঐ সঙ্গে সূর্যমূর্তি কিন্তু নেই।

(3) উপান-অংশে এতক্ষণ শুধু হাতীর শোভা-যাত্রা দেখতে দেখতে আসছিলেন। এখানে শিল্পী কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন—দড়ি টানাটানির একটি কৌতুকতর দৃশ্য খোদাই করে।

(4) পঞ্চম চক্রের কাছে উপর-জঙ্ঘা অংশে একটি মূর্তি দেখবার মতো। মনে হয়, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মহারাজা অথবা সেনাপতি দর্পণে নিজ সাজশয্যা দেখে নিচ্ছেন। যোদ্ধার কোমরবন্ধে তরবারি, সর্বাঙ্গে যুদ্ধের উপযুক্ত সাজ।

(5) উপর-জঙ্ঘা অংশে একটি সম্ভ্রান্ত দম্পতির ভাস্কর্য নিদর্শন। গাছের নিচে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলার ঘোমটা দেওয়ার ভঙ্গিটি দেখবার মতো। কিন্তু এ শিল্প-নিদর্শনটির সবচেয়ে বড় আবেদন দম্পতির মুখের পূর্ণ পরিতৃপ্তির হাসিতে। সদ্যবিবাহিত দম্পতি যখন আজও স্টুডিওতে ফটো তুলতে যান, তখন ক্যামেরাম্যান তাঁদের একটি অনুরোধ করে থাকে—'একটু হাসি-হাসি মুখ করুন'। এক সেকেন্ডের অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশের জন্যও সে হাসিটি অনেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এখানে এই সুখী দম্পতি কিন্তু দীর্ঘ সাতশ বছর ধরে সেটি জিইয়ে রেখেছেন। নোনা হাওয়ায় তাঁদের বালি পাথরের অঙ্গ ক্ষয়ে গেছে—হাসিটি আছে অম্লান।

(6) ঐ উপর-জঙ্ঘা অংশেই আছে একটি মনোরম দৃশ্য। কোন একজন ভারতীয় রাজা বসে আছেন হস্তিপৃষ্ঠে, সঙ্গে তাঁর অনুচরবৃন্দ, চামরধারী এবং ছত্রধারী। রাজার সম্মুখে একদল বিদেশী—তারা হতে পারে বিদেশী বণিক, মহারাজের কাছে বাণিজ্যের অনুমতি চাইতে এসেছে। অথবা হয়তো তারা আফ্রিকার কোনও রাজার দূত। আফ্রিকা বলছি কেন? দেখছি, বিদেশীরা ভারতীয় রাজার জন্য যে সমস্ত উপঢৌকন এনেছে তার মধ্যে আছে একটি জিরাফ। "মার্কো পোলোর সময়ে (1254-1325 খ্রীষ্টাব্দ) আরব, পারস্য হইতে কুইলন, কয়াল (তাম্রপর্ণী নদীর মোহনায়, এখনকার কয়াল-পাটনার ঈষৎ উত্তরে) বন্দরে বণিকেরা আসিত। ইহাদের সহিত আরবদেশ হইতে ঘোড়াও আমদানি হইত। ইহাদের পক্ষে উড়িষ্যা পর্যন্ত আসা একেবারে অসম্ভব নয়।"[13] বিদেশীদের পরিধানে ফ্রক জাতীয় ফ্রিল-দেওয়া ছোট কুর্তা। দৃশ্যটি একটি প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায়—যেন উপহারে প্রীত মহারাজ বিশাল বটগাছের মতো আগন্তুকদের ছত্র-ছায়ায় আশ্রয়দানে স্বীকৃত হচ্ছেন।

(7) ঐ একই সমতলে অর্থাৎ উপর-জঙ্ঘাতে এবার দেখছি একটি ভাস্কর্য, যাতে একটি করুণ দৃশ্যের গোপন মূর্ছনা। রাষ্ট্রবিপ্লবে পরাজিত একজন যোদ্ধা সপরিবারে জনপদ ত্যাগ করে আত্মগোপনে চলেছেন। সৈনিকের আয়ুধগুলি দেখে মনে হয় না সে নীচশ্রেণীর, কিন্তু তার বেশবাস ও অলংকার যেন ধূলিমলিন, জীর্ণ। সৈনিকের ভঙ্গি রণক্লান্ত পথিকের। অদূরে তার হতভাগিনী পত্নী। তার কাঁকালে শিশু, মাথায় একটি পেঁটরা—বোধকরি ওতেই আছে তার যা কিছু সম্পদ! শ্রান্ত পথিক নিভৃতে বিশ্রাম নিতে বসেছে এক বৃক্ষচ্ছায়ে।

(8) ষষ্ঠ চক্রের ঠিক পাশে উপর-জঙ্ঘাতে দেখছি একটি শিকারের দৃশ্য। কোন একজন রাজা একটি বন্যজন্তুকে (বরাহ অথবা ভল্লুক) পা ধরে বাঁ হাতে ঝুলিয়ে ডান হাতে তরবারির সাহায্যে তাকে হত্যা করছেন।

(9) ঐ মূর্তির ঠিক উপরে বরণ্ডিতে সর্বনিম্ন উপভাগ অর্থাৎ পাটায় দেখতে পাবেন হাতী-ধরার একটি দৃশ্য। বন্যহস্তীকে বর্শাঘাতে পর্যুদস্ত করা হচ্ছে।

(10) উপর-জঙ্ঘার একটি স্ল্যাবে দেখছি একজন পরিব্রাজককে। অনেকে বলেন এটি সপ্তম শতাব্দীর বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন্-ৎসাঙ্-এর মূর্তি। মূর্তিটি বৃদ্ধের, তাঁর একহাতে ছাতা অপর হাতে বুঝি কিছু পুঁথি। সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক। লক্ষণীয় বৃদ্ধের কান দুটি কোণার্ক মন্দিরের অন্য কোন মূর্তির মতো নয়—বুদ্ধদেবের মত দীর্ঘায়ত। আমারও মনে হয়, সম্ভবতঃ এটি ঐ চৈনিক পরিব্রাজকের মূর্তি।

(11) সপ্তমচক্রের কাছে উপানে পুনরায় দেখছি খোদিত হয়েছে একটি জিরাফের মূর্তি।

(12) উপান-অংশে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার দৃশ্য। হাতীর পিঠে চলেছেন রাজা, পালকীতে রানী, বাঁকে করে ভারে ভারে রসদ নিয়ে চলেছে বাহকদের দল।

(13) উপান-অংশে একটি বন্যজন্তু শিকারের দৃশ্য। অশ্বারোহী শিকারীর দল তাড়া করেছে এক-পাল হরিণকে। সাতটি হরিণ ছুটে পালাচ্ছে।

(14) তল-জঙ্ঘার কাখর-মুণ্ডির ভিতর ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য। দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার আশঙ্কা যথেষ্ট। অশীতিপরা এক বৃদ্ধার সাধ হয়েছে জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করবেন কোন তীর্থক্ষেত্রে। কৈলাস-কেদারবদ্রী, অথবা হয়তো সেযুগে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবনও ছিল সুদুর্গম তীর্থ। বৃদ্ধার বাম হস্তে যষ্টি, ডান হাতে জড়িয়ে ধরেছেন পুত্রকে—শিরশ্চুম্বন করছেন বংশধরের। বৃদ্ধার পদতলে পুত্রবধূ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। আর সব-চেয়ে করুণ দৃশ্য হচ্ছে নাতিটির ভঙ্গি—বৃদ্ধার দক্ষিণ জানু আঁকড়ে সে যেন বলছে, 'যেতে নাহি দিব'! লবণাক্ত হাওয়ায় বালিপাথরের মূর্তিগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—কিন্তু সপ্ত শতাব্দীর অত্যাচারেও মহা-কাল সেই বিদায় বিধুর মুহূর্তটিকে একেবারে মুছে ফেলে দিতে পারেননি।

(15) উপান-অংশে হস্তি-মূর্তি বরাবরই দেখতে দেখতে আসছেন—এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একটি বাৎসল্যরসের দৃশ্য। হস্তী-হস্তিনী এবং স্তন্যপানরত শিশু হস্তী।

(16) পুনরায় উপান-অংশে দেখছি খেদায় হাতী ধরার দৃশ্য। কিন্তু এবার একটু বৈচিত্র্য আছে। হাতী ধরা দেখতে এসেছেন রাজা-রানী। খেদার বাইরে নির্মিত একটি উঁচু মাচান। নিরাপদ দূরত্বে এবং উচ্চতায় বসে রাজা-রানী খেদায় আটকা-পড়া বন্য-হস্তীদের নিরীক্ষণ করছেন।

(17) উপান-অংশে পুনরায় হাতী ধরার দৃশ্য। এবারও একটু বৈচিত্র্য আছে। খেদায় বন্যহস্তী আটক পড়ার পর কুন্‌কী হাতী নিয়ে মাহুত খেদায় প্রবেশ করে, সঙ্গে যায় এক শ্রেণীর বিশেষ কুশলী হাতী-শিকারী। তাদের বলে ফান্দিয়ার। সে জীবন তুচ্ছ করে মাটিতে নেমে যায় এবং কৌশলে বন্যহস্তীর পায়ে দড়ির ফাঁদ পরিয়ে দেয়! সে-কথা 'গজমুক্তা' গ্রন্থে বিস্তারিত বলেছি। হাতী ধরার সেই পর্যায়টি এখানে বিধৃত। বেশ বোঝা যায় শিল্পীদলের হাতী-শিকার সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা ছিল।

(18) মিথুন-মূর্তি তো ক্রমাগত দেখতে দেখতে আসছেন। এবার তল-জঙ্ঘাতে একটি মিথুন-মূর্তি দেখতে পাবেন যার পুরুষটি হচ্ছেন একজন সাধু। তাঁর মাথায় জটা, আবক্ষ দাড়ি। জানি না, শিল্পীর বক্তব্যটা কী ছিল। হয়তো বামাচারী তান্ত্রিকদের স্বরূপ উৎঘাটন করতে চেয়েছেন শিল্পী, অথবা হয়তো তথাকথিত-সংযমী ভণ্ড সন্ন্যাসীদের প্রতি বক্রোক্তি করতেই এই মূর্তিটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

(19) উপর-জঙ্ঘায় একটি বড় প্যানেলে দেখেছি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সভা। পণ্ডিত উপস্থিত জনমণ্ডলীকে কোনও ভাষণ দান করছেন স্তম্ভ-শোভিত একটি মণ্ডপে। শ্রোতৃবৃন্দের কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। তাঁদের অনেকেই ঘরানা ঘরের লোক, হয়তো বা রাজা অথবা রাজপুত্র—কারণ ঐ প্যানেলের নিচে (অর্থাৎ সভামণ্ডপের বাইরে) অপেক্ষা করছে তাঁদের ঘোড়া, হাতী অথবা চতুর্দোলা। অনুচরবৃন্দও অপেক্ষা করছে—তাদের কারও কারও হাতে রাজচ্ছত্র।

(20) পুনরায় একটি শিকারের দৃশ্য। রাজার বামহস্তে ধনুক—তাঁর পশ্চাতে অন্যান্য অনুগামী শিকারীর দল। অনুচরেরা বন্যজন্তুগুলিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

(21) প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি গার্হস্থ্য চিত্র এখানে খোদাই করা হয়েছে। রাজা ও রানী কোন কারণে কিছু দিনের জন্য প্রাসাদ ছেড়ে যাবেন। তারই আয়োজন হচ্ছে। রাজপুত্রকে নিয়ে যাওয়া হবে না। দেখছি, স্তম্ভশোভিত একটি দ্বিতল সভামণ্ডপে রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। বিদায়ের পূর্বে রাজ-পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করছেন। সভা-মণ্ডপের পাশেই দেখছি রাজা-রানীর যাত্রার অয়োজন হয়েছে। আরোহীবিহীন একটি সুসজ্জিত রাজ-হস্তী, কিংখাবে-মোড়া পাল্কী, চারটি ঘড়ায় পানীয় জল ইত্যাদি নিয়ে জোড়হস্তে অপেক্ষা করছে অনু-চরবৃন্দ।

চাতালের বাহির দিক দিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ এখানেই শেষ হল আমাদের। এবার জগমোহনের উপরাংশটা দেখা যাক।

জগমোহনের বাড়-অংশ : জগমোহনটির তিন-দিকে তিনটি দরজা—জানলা নেই। পূর্বদিকে প্রধান সিংহদ্বার। তিনদিকের তিন দরজার পর বিস্তৃত চাতাল, যার খাড়া অংশটা এতক্ষণ দেখলাম আমরা। তারপর তিনদিকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে।

জগমোহনের চতুর্থ দিক, অর্থাৎ পশ্চিমদিকে বড়-দেউলে যাবার দ্বার।

কলিঙ্গের দেব-দেউলের রীতি অনুসারে জগমোহনটি পঞ্চরথ পীড়-দেউল বা ভদ্র-দেউল। বাড়-অংশে শাস্ত্রসম্মত পাঁচ ভাগ—পা-ভাগ, তল-জঙ্ঘা, বন্ধন, উপর-জঙ্ঘা এবং বরণ্ডি। তিনদিকের রাহাপাগে তিন দ্বারের জন্য এই পঞ্চছন্দ সেখানে ব্যাহত হয়েছে। পা-ভাগের নিচে একটি পিষ্ঠ আছে। পা-ভাগে যথারীতি পাঁচকাম—খুর, কুম্ভ, পাটা, কাণি ও বসন্ত। শুধু রাহাপাগেই নয় মাঝে মাঝে কাখর-মুণ্ডি অলঙ্করণে এই পঞ্চ উপভাগ ব্যাহত হয়েছে। তার ভিতর নানান্ মূর্তি।

পা-ভাগের উপরে তল-জঙ্ঘায় দেখছি দুই জোড়া করে অর্ধস্তম্ভের মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি করা হয়েছে। তাতে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন মূর্তি ছিল। এগুলির অধিকাংশ গত শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থানীয় লোক, পুরীর রাজা বা তাঁদের স্নেহধন্য অমাত্যরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ সেখানে অষ্টদিকপালের মূর্তি ছিল—অলসকন্যা, মিথুন-মূর্তি এখনও কিছু কিছু আছে। রাহাপাগের পাশের খাঁজে দুদিকে দুটি করে বৃহদাকার উল্লম্ফনরত বিরাল। কোণাপাগ ও অনুরথ পাগের খাঁজে গজ-বিরাল অথবা রাক্ষস-বিরাল।

বন্ধন সচরাচর তিনকামের হয়ে থাকে—এখানে পাঁচকাম, যথা—বরণ্ডি-নলি-পাটা-নলি-বসন্ত। এর ভিতর প্রথম ও তৃতীয় এবং পঞ্চম উপভাগের খাড়া অংশে (তাকে মুহান্তি বলে) ফুল-লতা-পাতার নক্শা।

উপর-জঙ্ঘার পরিকল্পনা তল-জঙ্ঘারই অনুরূপ।

সবার উপরে বরণ্ডিতে নয়-কাম—খুরা আকারের বরণি, কাণি-নলি-খুরা-পাটা-নলি-পাটা-নলি ও বসন্ত। বরণির মুহান্তিতে লতা এবং পদ্মদল, খুরা-মহান্তিতে হংশলহরী, পাটায় জীবজন্তু, এবং বসন্তে গজগামিনী (হাতীর সারি)।

বাড়-অংশের সর্বসমেত উচ্চতা 12 মি।

জগমোহন অংশের বর্ণনার শেষে এই স্থাপত্য-কীর্তিটির সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সুপণ্ডিত শ্রীনির্মলকুমার বসু এর ঔৎকর্ষ বিচার করে প্রসঙ্গক্রমে বলছেন, "জগমোহন রচনায় প্রধান দোষ হইল ইহাতে আঁটাআঁটি ভাবের আতিশয্য। বড় দরজা, জানালা প্রভৃতির ফাঁক থাকিলে জমাট ভাবকে আরও নরম ও সুন্দর করিয়া তুলিত, কিন্তু তাহা হয় নাই"।[14] আমরা কিন্তু তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এই আঁটাআঁটি ভাব—যেটা এখন পীড়াদায়ক মনে হচ্ছে তার জন্য দায়ী পুরাতত্ব বিভাগের মেরামতির কেরামতি। উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার বন্ধ করে দেওয়ায় বন্ধভাবটা যেন বেশী মনে হচ্ছে। ফার্গুসন সাহেবের গত শতাব্দীতে আঁকা ছবিতে (চিত্র—11.2) ঐ আঁটাআঁটি ভাবটা নেই। দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চরথ-দেউলের খাঁজগুলি এই বন্ধভাবকে কিছুটা দূরীভূত করে—তাই উড়িষ্যার দেব-দেউলে গবাক্ষের অপ্রতুলতা চোখে ততটা লাগে না। জগন্নাথ, লিঙ্গরাজ অথবা অনন্তবাসুদেবের তুলনায় এখানে পোতালের সংখ্যা বেশী হওয়ায় একটির বদলে দুটি কান্তি (বা পায়রা ঘর) তৈরী হয়েছে। সেগুলি বাইরে থেকে দেখতে 'ক্লিয়ার-স্টোরি' জানলা বা খোলা বারান্দার রূপ নেয়। যদিও সে অংশ দিয়ে জগমোহনে আলো-বাতাস প্রবেশ করে না তবু আপাতদৃষ্টিতে বন্ধতার দোষকে তারা বিদূরিত করে।

জগমোহনের স্থাপত্যগুণের বিষয়ে বসু মহাশয় যা বলেছেন তার অপেক্ষা অল্পকথায় এর গুণ বর্ণনা অসম্ভব মনে করে তাঁর বক্তব্যটুকুই তুলে দিলাম, "প্রধান পিষ্ঠ বিস্তারে উভয় মন্দিরকে ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়া মন্দির যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এই ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার উপর বরণির কৃশ বিভাগগুলির অনুপাতে পা-ভাগের পঞ্চ-কামের অপেক্ষাকৃত অধিক দৈর্ঘ্য এই ভাবকে আরও স্পষ্ট করিয়াছে। অন্যান্য বিভাগের মত যদি আবার কুম্ভে ও খুরায় নক্শার আতিশয্য থাকিত, তবে দর্শকের মনোযোগ অলঙ্কারেই অধিক নিবদ্ধ হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যকে (দৃঢ়তার ভাব পোষণ করা) বিফল করিয়া দিত। ভদ্রগণ্ডীর বিশাল ভার বাড়-অংশ সহ্য করিতে পারিবে কি না এবং হয়তো রথ-গুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া যাইবে এমন আশঙ্কা করার কারণ আছে। কিন্তু বান্ধনা এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। বিভিন্ন রথের সন্ধিস্থলে শক্তির প্রতীক বিরালমূর্তি এই ভাবকে আরও পুষ্ট করিয়াছে।...কণারকের মন্দির যে সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার সৌন্দর্যে বিশিষ্টতা আছে। তাজমহলের মত মেঘ-লোকের অপার সৌন্দর্য উহাতে নাই, তবে তরুলতায় উপশোভিত পাহাড়ের প্রশান্ত সৌন্দর্য এখানে পূর্ণ-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা বিশ্বেরই মত বিরাট ও গম্ভীর, আবার তাহার মত রসে ও প্রাণের আবেগে টল্‌টল্ করিতেছে।"

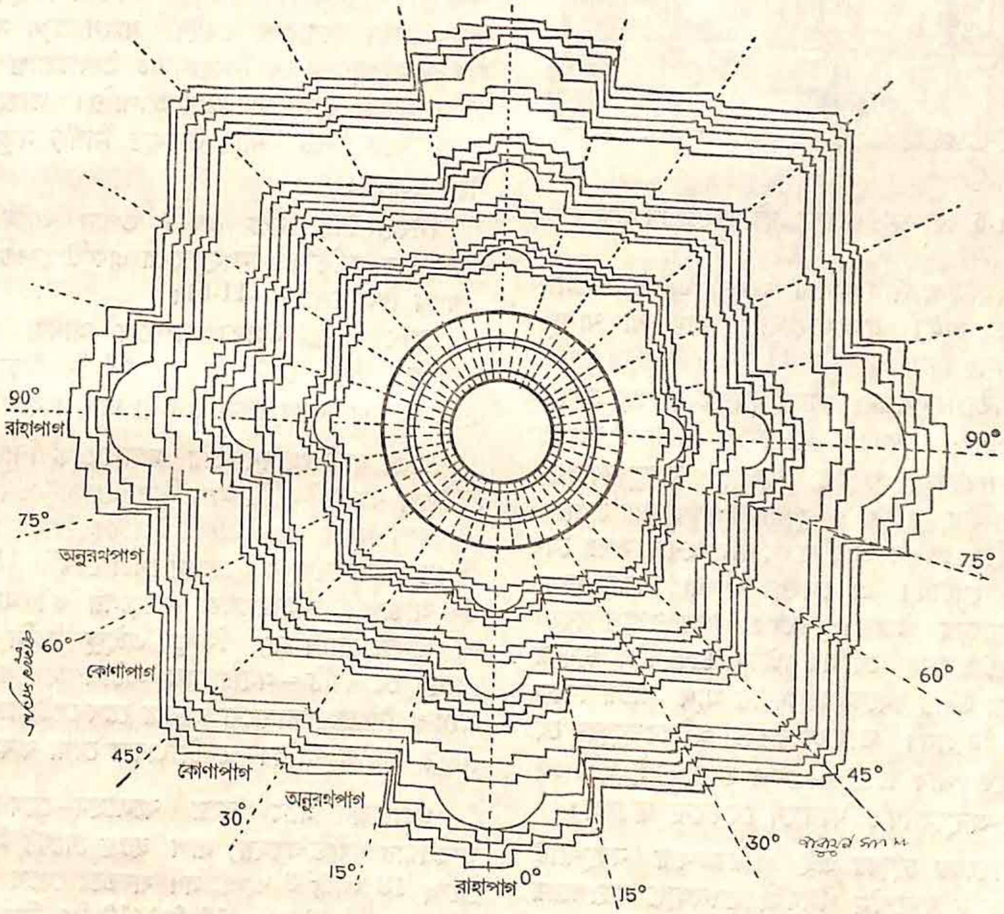
সংক্ষেপে বলতে পারি : তাজমহল যেন মেঘ-লোকে উধাও শৈলীর ভরতপক্ষী, আর কোণার্ক বাড়্-

সবার্থের ভরতপক্ষী—'True to the kindred points of heaven and home' !

জগমোহনের পূর্বদ্বার : জগমোহনের তিনদিকে তিন দ্বার ছিল, পশ্চিমদিকে বড়-দেউলের গম্ভীরায় (গর্ভগৃহে) যাবার উপযুক্ত একটি দ্বার ছিল। তার ভিতর একমাত্র পূর্ব দ্বারটি অনেকাংশে অক্ষত আছে। উত্তর দ্বারে কিছুটা অবশিষ্ট আছে অবশ্য। পূর্বদ্বারের বর্ণনা নিম্নোক্তরূপ :

দ্বারের জ্যাম্ব্-অংশে পাশাপাশি নক্‌শা আছে (চিত্র—5·11A)। ভিতর থেকে বাইরের দিকে প্রথম সারিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য, দ্বিতীয় সারিতে নাগবন্ধী অর্থাৎ জোড়া-সাপের নক্‌শা, তৃতীয় সারিতে ছোট ছোট চৌখুপিতে মিথুন-মূর্তি। চতুর্থ সারিতে একটি লতা বেয়ে যেন ছোট ছেলের দল উপরে উঠছে—এই বিচিত্র নক্‌শাটির ওড়িয়া নাম 'গেলবাঈ' অথবা 'মনুষ্য-কৌতুকী' (চিত্র—5·15)। পঞ্চম সারিতে আবার নূতন জাতের একরকম নক্‌শা, ষষ্ঠ সারিতে চতুর্থ সারির অনুরূপ মিথুন-মূর্তি। সপ্তম ও শেষ সারিতেও একটি প্রচলিত নক্‌শার কাজ—যার নাম বরঝাঞ্‌ঝি। এই সারি দেওয়া নক্‌শাগুলি প্রত্যেকটির নিচে একটি করে মনুষ্য-মূর্তি।

এই প্রকান্ড দরজার ফ্রেমের উপর ছিল একটি লিণ্টেল—তাতে ছিল নবগ্রহের মূর্তি। এই নবগ্রহের মূর্তিসম্বলিত প্রস্তর-খণ্ডখানিকেই কলকাতার যাদুঘরে আনবার প্রচেষ্টা হয়েছিল—বর্তমানে সেটি আছে মন্দিরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের একটি ঘরে, স্থানীয় পুরোহিতদের হাতে নবগ্রহ আজও পূজা পান।

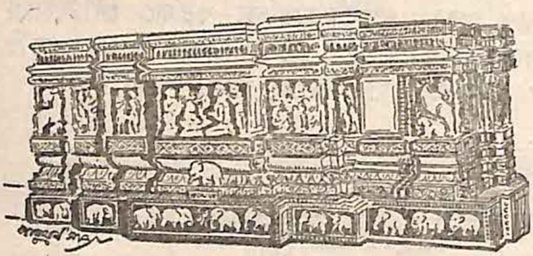


চিত্র—11·4 কোণার্ক মন্দির-চূড়ার 'গরুড়াবলোকন-নক্‌শা'।

ফার্গুসনের হাতে-আঁকা ছবিতে দেখছি নবগ্রহের উপরে কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি প্রকান্ড মূর্তির অর্ধোত্থিত ভাস্কর্য (বাস-রিলিফ)। চিত্র দেখে মনে হয় এ মূর্তিটি কম করেও 2·45 মি×1·83 মি মাপের ছিল। সেটি নিশ্চয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। মূর্তিটি পদ্মাসনে বসা কোন পুরুষের মূর্তি বলে মনে হয়।

যেহেতু নবগ্রহের মধ্যেই সূর্যমূর্তি খোদিত হয়েছে— তাই এটি সূর্যমূর্তি নয়। কৌতূহল হয় জানতে— সেটা কার মূর্তি ছিল। দুপাশে দুটি অর্ধস্তম্ভের (pilaster) উপরেও দুটি বড় মূর্তি ছিল।

জগমোহনের শিল্পনিদর্শনগুলি দেখা শেষ করেছি ; এর পর বড়-দেউল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার পূর্বে কোণার্ক জগমোহনের



চিত্র—11.5 কোণার্ক-বিমানের গর্ভগৃহের সিংহাসন।

চূড়ার জ্যামিতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই। জগমোহনের প্ল্যান বা বাস্তু-নক্শা আমরা দেখেছি, চিত্র—11.3-এ। আমরা জানি, কোন স্থাপত্য নিদর্শনের প্ল্যান বল্‌তে বোঝায় সেক্‌শানাল-প্ল্যান ; অর্থাৎ বাড়িটির জানলা-বরাবর ভূমির সমান্তরালে কর্তৃত অংশের বাস্তু-নক্শা। অথবা বলা যায়, বাড়ির বাস্তু-নক্শায় আমরা দেখতে পাই বাড়িটির জানলা পর্যন্ত গাঁথনি হবার সময় যে-রূপ নেবে সেটাই। এ ক্ষেত্রে আমরা দেখব জগমোহনের চূড়ার প্ল্যান। অর্থাৎ মনে করুন কোন একজন ফটোগ্রাফার হেলিকপটারে চড়ে ঠিক চূড়ার কেন্দ্রবিন্দুর উপর থেকে ক্যামেরার মুখ নিচের দিকে করে ফটো নিলেন। তাহলে আমরা মন্দির-চূড়ার যে ফটো দেখতে পাব চিত্র—11.4-এ প্রায় সেই ছবিটিই বাস্তুবিদ্যা-অনুমোদিত কানুনে দেখানো হয়েছে।

জগমোহনের চূড়ার এই পরিকল্পনা নক্শাটি আমি এঁকেছি ক্যাপ্টেন নির্মল সেনগুপ্ত মহাশয়ের অঙ্কিত নক্শার অনুকরণে। এ বিষয়ে শ্রীসেনগুপ্ত বছর পঁচিশ আগে দেশ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন (দেশ 13.5.61., 28 বর্ষ, 28 সংখ্যা)। প্রথম পোতালে উঠে কিছু মাপজোখ নিয়ে এবং সূর্যালোকে মন্দিরের যে ছায়া মাটিতে পড়ে তাই মেপে দেখেই একক প্রচেষ্টায় নির্মল সেনগুপ্ত মশাই প্রায় নির্ভুল নক্শাই তৈরী করেছিলেন। শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "আমরা লাইব্রেরি খানাতল্লাস করেছি, কিন্তু সে-রকম কোন ফটোগ্রাফ পাইনি। কোন বিশেষজ্ঞ আকাশ থেকে নক্শা তৈরী করেছেন এ রকম সংবাদও পাইনি। অতএব খানিকটা ফটোগ্রাফের ভিত্তিতে একটা কাল্পনিক আকাশী-নক্শা তৈরী করা গেছে।"

পঁচিশ বছর পরেও আমি এ জাতীয় কোন ফটো বা আলোচনার সন্ধান পাইনি।

বড়-দেউল : বড়-দেউলের বাহির দিয়ে আমরা ইতিপূর্বে মন্দির প্রদক্ষিণ করেছি। বাড়-অংশের কিছু কিছু যদিও অবশিষ্ট আছে তবু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কিছু সেখানে নেই। গর্ভগৃহ বা গম্ভীরা সমচতুষ্কোণ, ভিতরে কলিঙ্গ-কানুন অনুসারে কোন কারুকার্য নেই। ধ্বংসস্তূপ সরানোর পর মূলবিগ্রহের যে সিংহাসনটি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে সেটি আমরা ভাল করে দেখতে পারি। ভাঙা অংশে উপর থেকে নিচে নামার উপযুক্ত সিঁড়ি নতুন করে গড়া হয়েছে।

সিংহাসনের নিচে একটি উপান আছে—তাতে গজযূথের মূর্তি। সিংহাসনের একটি স্কেচ এঁকে এখানে দিলাম (চিত্র—11.5)।

বড়-দেউলের উচ্চতা সম্বন্ধে আমরা আন্দাজ করেছি, বলেছি সেটা অন্ততঃ 67 মি উঁচু ছিল। এবার আমরা দেখব, কেন ও-কথা আমরা বলেছিলাম।

রাজা নরসিংহদেব তাঁর মহাপাত্রকে নিয়ে 1628 খ্রীষ্টাব্দে বড়-দেউলটির মাপ নিয়েছিলেন—তখন কলস ও ধ্বজা ছাড়া সমগ্র মন্দিরটি টিকে ছিল। মহারাজ যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়েছেন সেটা দেখছি 116 কাঠি 20 আঙুল। মহারাজের আঙুলের কী মাপ ছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু তিনি জানিয়ে গেছেন যে কাঠি = মহারাজের আঠাশ আঙুল। সহজ ঐকিক নিয়মের সাহায্যে আমরা রেখ-দেউলের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারি। সেটা এবার দেখা যাক :

মহারাজ মাপ করে বলেছেন—রেখ-দেউলের গম্ভীরার (গর্ভগৃহের) মাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্যে 18 কাঠি, প্রস্থে 18 কাঠি 8 অঙ্গুলি। বাস্তবে মেপে দেখলাম সেটা আমার হিসাবে 10 মি×10 মি—নির্ভুল চতুষ্কোণ বর্গক্ষেত্র।

যদি 18 কাঠি=10 মি হয়,

তাহলে 116 কাঃ 20 অঃ=64.7 মি।

তেমনি যদি 18 কাঃ 8 অঃ=10 মি হয়, তাহলে

116 কাঃ 20 অঃ=63.8 মিটার।

এই দুই মাপের গড়=64.25 মি

চিত্রে প্রদর্শিত পিষ্ঠের মাপ যোগ করতে হবে =4·01 মি

কলস ও ধ্বজার মাপ[15] যোগ করা দরকার =1·83 মি

সুতরাং সর্বসমেত উচ্চতা =70·09 মি

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কলস সমেত পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দির (65·3 মি) অথবা লিঙ্গরাজের মন্দির (50 মি) অপেক্ষা কোণার্ক-দেউলের উচ্চতা অধিক ছিল।

বড়-দেউলটি যদিও ধ্বংসস্তূপ, তবু তার তিন-দিকে তিন পার্শ্বদেবতার কথা না বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা চলে না। বড়-দেউলের তিনদিকে সূর্যদেবেরই তিন মূর্তি। দক্ষিণে দণ্ডায়মান পূষা, পশ্চিমে দণ্ডায়মান সূর্যদেব এবং উত্তরে অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হরিদশ্ব। চিত্র—11·3-এ এঁদের অবস্থান সূচিত হয়েছে। ফলে খুঁজে বার করা কঠিন নয়। পূষা ও হরিদশ্ব সূর্যেরই অপর দুই ধ্যানমূর্তি। সূর্য ও পূষার মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প, কিন্তু উত্তর-পার্শ্ব-দেবতা হরিদশ্ব অশ্বারূঢ় সূর্যমূর্তি। একে একে এঁদের এবার দেখা যাক।

সূর্য : এঁর মূর্তি প্লেট—I-এ দেওয়া হয়েছে। প্রায় আট ফুট উঁচু সমভঙ্গ মূর্তি, সপ্তরথ-পাদ-পীঠের উপর দণ্ডায়মান। দুই হাতে দুই পদ্ম ছিল —ভেঙে গেছে। মাথায় মুকুট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে কুণ্ডল, গোমুখকাণ্ডে রত্নোপবীত, কোমরে সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত কটিবন্ধ, পায়ে বুট জুতা। তোরণের উপরে কীর্তিমুখ—দুইপাশে দুইসারি নৃত্যগীত-রতা। তার নিচে—মূল মূর্তির চিবুকের সমতলে দুই দেবমূর্তি দুপাশে সাজানো। স্বস্তিকাসনে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও পালনকর্তা বিষ্ণু। নাভির সমতলে দুই পাশে দুটি করে সর্বমোট চারটি স্ত্রী-মূর্তি। এঁরা চারজন সূর্যের চার পত্নী—রাজ্ঞী, নিক্ষুভা, ছায়া ও সুবর্চসা। এই চারটি স্ত্রী-মূর্তির নিচে দুটি কাখরমুণ্ডি। মন্দিরের সম্মুখে অস্ত্রধারী দুই পার্শ্ব-চর। দুজনেই আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান। সূর্যের দক্ষিণ চরণপ্রান্তে ঊর্ধ্বমুখ নতজানু পুরুষটি হচ্ছে এ মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজের। পাশে পড়ে আছে তাঁর কোষমুক্ত তরবারি। তাঁর বিপরীতে সূর্য-দেবের বাম চরণপ্রান্তে অনুরূপ যুক্তকর ভঙ্গিমায় এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সূর্যের দুই অনুচর—শ্মশ্রুমণ্ডিত দণ্ড ও স্ফীতোদর পিঙ্গলের ক্ষুদ্রায়তন দুটি দণ্ডায়মান মূর্তি রাজা ও রাজপুরোহিতের যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামে। সূর্যের ধ্যানমন্ত্রে দণ্ডী-পিঙ্গল ও খড়্গধারী ঐ দ্বারপালদ্বয়ের উল্লেখ আছে :

দ্বিহস্তস্থ সরোজন্ম শবলাশ্বরথস্থিতঃ
দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ ॥

ঐ সূর্যমূর্তির সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়ান—শ্রদ্ধা-বিনম্রচিত্তে উচ্চারণ করুন ঈশোপনিষদের সেই প্রার্থনা-মন্ত্র :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

তবেই সার্থক হবে আপনার কোণার্ক তীর্থ-দর্শন।



চিত্র—11·6 পূষা ; কোণার্ক।

পূষা : সমভঙ্গ-ঠামে দণ্ডায়মান পূষা-মূর্তির হাত দুটিও ভেঙে গেছে (চিত্র—11·6)। অলঙ্কার,—কণ্ঠহার, রত্নোপবীত, মুকুট ইত্যাদি একই রকম।

এবার তাঁর নাভির সমতলে চার স্ত্রী নেই, আছেন দুজন। রাজা ও রাজপুরোহিত অপসৃত ; কিন্তু দুই দ্বারপাল, দণ্ড ও পিঙ্গল স্বস্থানে আছেন। এবার পূষা-মূর্তির চরণতলে রথের সপ্তাশ্ব ও সারথী



চিত্র—11·7 হরিদশ্ব ; কোণার্ক।

অরুণকে লক্ষ্য করে দেখুন। সপ্তাশ্বের মূর্তিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিন অশ্ব অতীত—তিন অশ্ব ভবিষ্যৎ—তারা বিপরীতমুখী ; 'অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে' তাদের যাত্রা। একমাত্র ব্যতিক্রম কেন্দ্রস্থলের অশ্বটি। সেটি সোজাসুজি দর্শকের দিকে ফিরে আছে—একমাত্র সেই হচ্ছে বর্তমান। গাইড আপনাকে সহজেই বুঝিয়ে দেবে ঐ সপ্ত-অশ্ব হচ্ছে সপ্তাহের সাত বারের প্রতীক। কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নির্দেশ ঠিক তাই নয়। সূর্যদেবের যে হিরণ্ময় মহারথ সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে শেষ মহাপ্রলয়ের সূর্যাস্তের দিকে ছুটে চলেছে তারই রথ-চক্রনির্ঘোষে ছন্দিত হয়ে উঠছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের তাল-মান-লয়—সেই মহাসংগীতের মূলে আছে সপ্তছন্দ! এই সপ্তছন্দেই উদ্‌গীত হয়েছে চতুর্বেদের যাবতীয় সামগান। সেই সপ্তছন্দ হল : গায়ত্রী-উষ্ণিক-অনুষ্ঠুপ-বৃহতী-পংক্তি-ত্রিষ্টুপ আর জগতী। ঐ সপ্তাশ্ব এই সাতটি মূল ছন্দের প্রতীক। ফিরে যাওয়ার আগে দণ্ডায়মান পূষা-মূর্তির সম্মুখেও রেখে যান আপনার ভক্তিভারনম্র প্রণতি। মনে মনে বলুন—

"ঘন অশ্রুবাষ্পেভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি॥"

তাহলেই পাবেন কোণার্ক-তীর্থ-পরিক্রমার আশীর্বাদ!

হরিদশ্ব : উত্তর পার্শ্বদেবতা হচ্ছেন অশ্বারূঢ় হরিদশ্ব (চিত্র—11·7)। সেই কনকমুকুট, স্বর্ণকুণ্ডল, অভেদ্য-কবচ, রত্নোপবীত, কটিবন্ধ। এবারে আঁকবার সময় পার্শ্বস্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সহচরদের মূর্তিগুলি বাদ দিয়ে মূল মূর্তিটিকেই বড় করে এঁকেছি। হয়ারূঢ় হরিদশ্বের ধ্যানমন্ত্রের সঙ্গে আপনারা এ-মূর্তি ব্যঞ্জনা নিজেরাই মিলিয়ে নিতে পারেন :

একচক্রং সসপ্তাশ্বং সসারথীং মহারথম্।
হস্তদ্বয়ং পদ্মধরং কঞ্চুকাশ্চর্যবক্ষসম্॥
সর্বাভরণসংযুক্তা কেশহার সমুজ্জ্বলা।
এবমুক্তরথস্তস্য মকরধ্বজ ঈষ্যতে॥
মুকুটঞ্চাপি দাতব্যমন্যং সর্বং সমণ্ডলম্!
একবক্ত্রাঙ্কিতো দণ্ডো স্কন্দস্তেজস্করাম্বুজম্॥
কৃত্বা তু স্থাপয়েৎ পূর্বপূরুষাকৃতরূপিণৌ।
হয়ারূঢ়স্থ কুর্বীত পদ্মস্থং বার্চনামকম্॥

অরুণ স্তম্ভ : জগমোহনের পূর্বদ্বারের সম্মুখে ছিল একটি ধ্বজস্তম্ভ ; তার শীর্ষে ছিল সূর্য-সারথী অরুণের মূর্তি—যুক্তকর নতজানু ভঙ্গি তাঁর। অরুণের শাস্ত্রসম্মত মূর্তিতে সচরাচর

নিম্নাংগ তৈরী করা হয় না—এ ক্ষেত্রে অরুণ পূর্ণাবয়ব, সম্ভবতঃ সূর্যদেবের বরে বিকলাংগ অরুণ রোগমুক্ত হয়েছিলেন এমন একটা ইংগিত করতে চেয়েছেন শিল্পী। এই স্তম্ভের কথা আবুল-ফজল তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, পরবর্তী মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে এই স্তম্ভটি পুরী মন্দিরে নীত হয় ; এখন সেখানেই এটি দেখতে পাওয়া যাবে।

দ্বাররক্ষক মূর্তি : পূর্বেই বলেছি, জগমোহনের তিন দ্বারের সম্মুখে সোপানের অনতিদূরে এবং মন্দির চত্বরের ভিতরেই নির্মিত হয়েছিল তিন দুকুনে ছয়টি বৃহদায়তন মূর্তি। প্রকাণ্ড পাদপীঠের উপর এগুলি রক্ষিত ছিল। উত্তরদ্বারের দিকে দুটি হস্তী, দক্ষিণদ্বারে দুটি অশ্ব এবং পূর্বদ্বারে হস্তিদলনকারী শার্দুল মূর্তি। এই মূর্তিগুলি জগমোহনের দিকে পিছন করে ছিল, যদিও হস্তী এবং অশ্ব-মূর্তিগুলিকে এখন মন্দিরমুখী করে রাখা হয়েছে। মন্দিরের সংগে সম্পর্কবিমুক্ত এমন প্রকাণ্ড মূর্তির পরিকল্পনা ভারতীয় দেব-দেউলে সচরাচর দেখা যায় না। শিবমন্দিরের সম্মুখে নান্দী বা বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে পৃথক গরুড় মূর্তির ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এখানে এরা বাহন নয়, দ্বারপাল নয়—শুধু শোভাবর্ধনের জন্য এদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর সংগে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের স্থাপত্য-নিদর্শন—মিশরের স্ফিংসের[16] তুলনা করা চলে।

(ক) **হস্তিদলনকারী শার্দুল** : 1838 খ্রীষ্টাব্দে কিট্টোর আঁকা ছবি থেকে দেখা যায় যে, এই মূর্তি দুটি পূর্বদ্বারে রক্ষিত ছিল। ফার্গুসনের চিত্রেও (চিত্র—11·2) এটিকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাদপীঠের মাপ ছিল—দৈর্ঘ্যে 3 মিটার, প্রস্থে 1·8 মি, উচ্চতায় 3·18 মি। চিত্র—11·8-এ এর একটি স্কেচ এঁকেছি। মূর্তিটির মাপ 2·5×1·4×2·8 মি। ওজন অন্ততঃ 280 কুইন্টাল!

(খ) **হস্তী** : হস্তী দুটি বন্যহস্তী নয়—সুসজ্জিত রাজহস্তী। কিন্তু মদমত্ত এই হস্তীদ্বয় শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরেছে একটি হতভাগ্য মানুষকে। ভয়াবহ মূর্তি তার (চিত্র—11·9)।

(গ) **অশ্ব** : অশ্বদ্বয়ও সুসজ্জিত (চিত্র—11·10)। সংগে অশ্বসেবক এবং অশ্বের পদতলে কোন দুর্বৃত্ত।

হ্যাভেল এই অশ্বগুলির ভাস্কর্যনৈপুণ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন "ঘটনাচক্রে যদি এই অশ্বমূর্তিগুলির নিচে কেউ রোমান অথবা গ্রীক শিল্পের লেবেল মেরে দেয় তাহলে বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ যাদুঘরে সেই পরিচয়েই বোধকরি এদের রাখা চলে।"[17]

ভোগমণ্ডপ : জগমোহনের পূর্বদিকে প্রায় নয় মিটার দূরে মন্দিরের অক্ষরেখাতেই এই চতুষ্কোণ (22·5×22·5 মি) মণ্ডপটি নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ এটি ছিল পীড়-দেউল—বর্তমানে ঊর্ধ্বাংশ নেই। চাতালের চারদিকে সিঁড়ি, শুধু পশ্চিমের (জগমোহনের দিকে) দিকে সিঁড়িটি স্থানাভাবের (এর সম্মুখেই ছিল অরুণ স্তম্ভ) জন্য দুপাশে বেঁকে গেছে, অন্যান্য দিকের মত সোজা নামেনি। চাতালটি সংলগ্ন জমি থেকে প্রায় 3 মিটার উচ্চে।



চিত্র—11·8 হস্তিদলনকারী শার্দুল, কোণার্ক ;
পূর্বদ্বার রক্ষী।

চাতালের উপরে ষোলটি স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে—যার উপর মন্দিরটি ছিল। কেউ কেউ[18] এটিকে নাটমন্দির বলে বর্ণনা করেছেন ; এতে এতগুলি স্তম্ভ থাকায় মনে হয় এটি ভোগমণ্ডপ হিসাবেই ব্যবহৃত হত। এরই ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত পাকশালার দরজাটি ঠিক এর উত্তর-দক্ষিণ অক্ষরেখা বরাবর আছে।

মায়াদেবীর মন্দির : মূল-মন্দিরের নৈঋত কোণে (দক্ষিণ-পশ্চিম) অবস্থিত মায়াদেবীর মন্দিরটিও পরে বালির স্তূপ থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। তার দুটি অংগ—জগমোহন ও দেউল। এ মন্দিরের কারুকার্যও খুঁটিয়ে দেখবার জিনিস। কিন্তু কী পরিকল্পনায়, কী স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এমন কিছু

দেখছি না যা বিস্তারিত নির্দেশনার অপেক্ষা রাখে। মন্দিরের জলনিকাশী নালার মুখে কষ্টিপাথরে তৈরী কুমীরের মুখটি নজরে পড়বে। এ মন্দিরেরও তিন রাহাপাগে তিনটি পার্শ্বদেবতার মূর্তি ছিল, সূর্যমূর্তিই। দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের দেবতাদ্বয় এখনও আছেন। পশ্চিমদিকের পার্শ্ব-দেবতার আসনটি শূন্য। ভোগমণ্ডপের উপরে জমা বালুকাস্তূপ অপসারণের সময় একটি সূর্যমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। মনে হয় সেটিই এই মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বদেবতা—

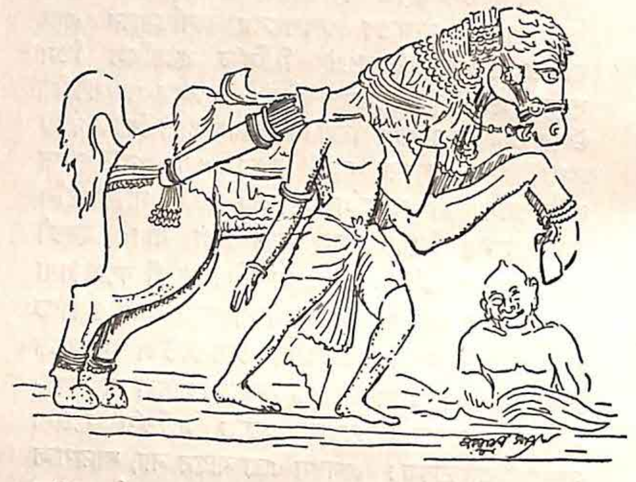


চিত্র—11·9 রাজহস্তী, কোণার্ক ; উত্তরদ্বার রক্ষী।

কারণ, কুলুঙ্গির ফাঁকে মূর্তিটি চমৎকার বসে যায়। এটি বর্তমানে জাতীয় সংরক্ষণশালায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অপর দুটি সূর্যমূর্তির পরিকল্পনা বড়-দেউলের পার্শ্বদেবতাদের অনুরূপ। দক্ষিণদিকের সূর্যমূর্তির মাথা ভেঙে গেছে। এ মন্দিরে আরও একটা দৃশ্য নজরে পড়ল। জগমোহন থেকে গম্ভীরায় যাবার যে দ্বার সেই দ্বারের ডানদিকের জ্যাম্বে একটি মিথুন-মূর্তির অশ্লীল ভঙ্গি। এ জাতীয় মূর্তি পুরী-ভুবনেশ্বর-কোণার্কে যথেষ্ট আছে—কিন্তু গম্ভীরার প্রবেশদ্বারে এ জাতীয় মূর্তি আমি আর কোথাও দেখিনি।

জগমোহনের গণ্ডী : ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজে দেখেছি পীড়-দেউলের গণ্ডীতে ছিল দুই পোতাল। এখানে তিন পোতাল। নিচে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোতালে পীড়ের সংখ্যা যথাক্রমে 6, 6 ও 5। প্রসঙ্গতঃ লিঙ্গরাজের দুটি পোতালে পীড়ের সংখ্যা ছিল 9 ও 7, অনন্তবাসুদেবে 6 ও 5 এবং পুরীর জগমোহনে 7 ও 6। সুতরাং তিন পোতালের এই পরিকল্পনা বেশ অভিনব। পীড়ের মুহান্তিতে নক্‌শা-তোলা।

প্রথম পোতালের চাতালের চারদিকে চারটি করে সর্বসমেত ষোলোটি কন্যামূর্তি আছে। এ ছাড়া রাহা-অবস্থানে ঝুঁকে থাকা অংশে চার-দুকুনে আটটি নৃত্যশীল ভৈরবমূর্তি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পোতালের চাতালে ষোলোটি কন্যামূর্তি আছে—সেখানে ভৈরবমূর্তি নেই। তৃতীয় পোতালের উপর মূর্তি নেই।



চিত্র—11·10 অশ্ব ও মুণ্ডহীন পদাতিক—কোণার্ক ; দক্ষিণদ্বার রক্ষী।

ভৈরব মূর্তিগুলি ষড়ভুজ। নৌকার উপরে নৃত্যরত। চতুর্মুখ ঐ ভয়াল মূর্তিগুলির নৃমুণ্ডমালা, ভীষণদর্শন আয়ুধ, বিকট আস্য এবং বিকশিত শ্ব-দন্ত যেন কন্যামূর্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের পেলবতাকে আরও বিকশিত করে তোলে।

তৃতীয় পোতালের উপরে আর কন্যামূর্তি নেই—করালদংস্ট্রা সিংহ। তার উপর শাস্ত্রসম্মত ঘণ্টা-শ্রী, আমলক প্রভৃতি। কলস ও আয়ুধ অপহৃত।

এই কন্যামূর্তিগুলি কোণার্কের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন। নিঃসন্দেহে এগুলি মুখ্য ভাস্করাচার্যের হাতের কাজ। সম্ভবতঃ এঁদের হাতেই নির্মিত হয়েছিল বড়-দেউলের তিনটি সূর্য-দেবতার মূর্তি। প্রথম পোতালের চাতাল পর্যন্ত ওঠার সিঁড়ি আছে, যাত্রীরা ঐ পর্যন্তই যেতে পারেন—আরও উপরে অবশ্য ওঠা যায়, কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিষেধ। কাছে গিয়ে মূর্তিগুলিকে দেখবেন, (অপারগ হলে যাদুঘরে রক্ষিত কন্যামূর্তিটি দেখবেন) মনে হবে তারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া; বরং বলা উচিত—'শ্রোণীভারাদলসগমনা'। প্রমাণ মানুষের চেয়েও

দৈর্ঘ্যে বেশ বড়। শিল্পশাস্ত্র বলছেন, নারীমূর্তি হবে সপ্ততাল—কিন্তু সে আইন এক্ষেত্রে ভাস্কর মেনে চলেননি। তিনি জানতেন, এ মূর্তিগুলি অনেক নিচে থেকে দেখবার জন্য তৈরী করা। তাই তাল-মান এমন-ভাবে নির্ণয় করেছেন যাতে নিচে থেকে তাদের মোটেই স্থূলকায়া মনে হয় না। এই কন্যামূর্তিগুলি সম্ভবতঃ নৃত্যরতা দেবদাসীর—তাদের হাতে নানান্ জাতের বাদ্যযন্ত্র—পাখোয়াজ, মাদল, বাঁশী, খঞ্জনী, করতাল, ঝাঁঝর ইত্যাদি। অঙ্গে তাদের নানান্ জাতের অলঙ্কার—কঙ্কন, কেয়ূর, শতনরী, কর্ণাভরণ, মুকুট প্রভৃতি। কবরীবন্ধনরীতিতেও কত বৈচিত্র্য। অতি সাম্প্রতিককালে ডোনাট সহযোগে অথবা উইগ্-মন্ত্রে প্রকাণ্ড খোঁপা শিরোধার্য করে যে বরনারীরা কক্‌টেইল পার্টিতে হাজিরা দিতে যান তাঁরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন সাতশ বছর আগেই তাঁদের কবরীবন্ধনরীতি এই নিপুণিকা-চতুরিকার দল অনুকরণ করত! যদি ধরে নিই নাইলনের কৃত্রিমতা নেই ওদের খোঁপার সঙ্গোপনে, তাহলে বলতে হবে ওদের কবরী ছিল সত্যই আগুল্‌ফলম্বিত!

কিন্তু এই পীনোদ্ধত যুবতীদের যৌবনশোভা, অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব অথবা বেশভূষাই শুধু নয় আরও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখব—বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী তাদের রূপারোপে। অবনঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন,—'নিটোল একটি মুক্তার আকার আর আয়তন বোঝানো শক্ত নয় কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে?' শিল্পী মুক্তাটির রূপভেদ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা দিতে পারেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াসলভ্য—কিন্তু ঐ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত করতে পারেন তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক—সেটিই হচ্ছে শিল্পের চতুর্থ অঙ্গ—লাবণ্যযোজনা। এই নারীমূর্তিগুলির লাবণ্যযোজনা তেমনি ভাষায় বোঝাবার নয়, প্রত্যক্ষদর্শনে উপলব্ধি করার জিনিস।

তবু বলব, শুধু লাবণ্যযোজনাই তো এর শেষ কথা নয়। শেষ কথা এদের ভাব। সেটি আবার উপলব্ধির জগতের নয়—অনুভূতির জগতের। সে-কথাই বলি।

ধরা যাক, প্রথম পোতালের উপর উত্তরতম প্রান্তে পূর্বমুখী বংশীবাদিনীর কথা (চিত্র—Plate IV, নিম্ন, বাম)। ফুঁ দিতে গিয়ে মেয়েটির গাল কিছু ফুলেছে। অল্প বয়স, মনে হয় পঞ্চদশী। এখনও যেন কিশোরী। ওর অপাপবিদ্ধ মুখমণ্ডলে কিশোরীসুলভ আভা—সে যেন এখনও দুনিয়াদারির কিছুই বোঝে না—তাই তার হাসিটি অমলিন। সে সুখী।

এবার আমরা দেখব, দ্বিতীয় পোতালের চাতালে পূর্বমুখী দেবদাসীটিকে। সে পাখোয়াজ বাজাচ্ছে পোতালের দক্ষিণতম প্রান্তে। এ মেয়েটি আর ষোড়শী নয়—পূর্ণযৌবনা। ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মত তার যৌবন কানায় কানায় ভরা। অধরপ্রান্তে কি ক্ষীণ একটি হাস্যের লাস্য লেগে আছে? থাকলে তা জীবন-অভিজ্ঞতার জারক-রসে নিষিক্ত। তিন দৃষ্টি-কোণ থেকে তিনবার স্কেচ করেও ঐ পরিপূর্ণ-যৌবনার জলদ-গম্ভীর রূপলাবণ্য তুলির আগায় ধরতে পারলাম না—দুঃখ শুধু এইটুকুই (চিত্র—Plate IV, উপরে, বামে)।

তারপর ধরুন, প্রথম পোতালের দক্ষিণতম-প্রান্ত-বাসিনী পূর্বমুখী করতালবাদিনীকে। মনে হয়, এও কিশোরী নয়, মধ্যযৌবনা। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের চেয়ে বয়সে বুঝি কিছু ছোটই হবে। দেব-দাসী জীবনের একটা দিকই শুধু দেখেছে সে—পূর্ণ-চন্দ্রের মত যে পিঠ চন্দ্রিমায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু চন্দ্রাননী বুঝি জানে না—তার আর একটা জীবন পড়ে রয়েছে পিছনের দিকে। যৌবনোত্তর জীবনের সে পিঠের গ্লানিকর অন্ধকারের সম্বন্ধে ও মোটেই সচেতন নয়। তাই ওর অধরপ্রান্তে যৌবনোদ্ধতার গর্বিত ভঙ্গিমা। ওর হাসিতে মিশে আছে কিছুটা উপেক্ষা। শুধু হাসিতেই নয়, সমগ্র দেহাবয়বে, নৃত্যের ভঙ্গিমায় সে যেন বিশ্ববিজয়িনীর ব্যঞ্জনায় দাঁড়িয়েছে করতাল হাতে (চিত্র—Plate IV, নিম্ন, দক্ষিণ)।

এবার এ পর্যায়ের শেষ উদাহরণ। সেটি সংগ্রহ করেছি দ্বিতীয় পোতালের চাতাল থেকে। পশ্চিম-মুখী (উত্তর প্রান্তে) এ মেয়েটি যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা। আপন মনে খঞ্জনী বাজাচ্ছে অস্তাচলগামী সূর্যের দিকে মুখ করে। অপূর্ব এই নারী-মূর্তিটি। ওরও ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে আছে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস—কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবন্ত হাসি নয়—দেবদাসী জীবনের আইন-বাঁধা কৃত্রিমতা মাখানো। বেশ মনে হয়—মেয়েটি খিন্ন, বিষণ্ণ, পরিশ্রান্ত; আর সে শ্রান্তি দৈহিক নয়, মানসিক! দেবদাসী-জীবনের আবরণ ও আভরণে বুঝি ওর মন ভরেনি, যেন কোন দূর পল্লী-গ্রামের এক বাল্যবন্ধুর স্মৃতি আজও সে ভুলতে পারেনি। কিম্বা কি জানি, পশ্চিমমুখী বলেই এ মন্দিরের অধিদেবতার বিদায় গ্রহণে ও অমন বিষাদ-খিন্ন। তবু ও হাসছে (চিত্র—Plate III, দক্ষিণ)।

দেবদাসীদের পর্যালোচনা এখানেই শেষ করা গেল। কিন্তু এই শেষ নায়িকা-মূর্তিটির প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলব। এই ভাস্কর্য-নিদর্শনটির সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ইতিকথা সংগ্রহ করেছিলাম কোণার্কে। কাহিনীটি আমি শুনেছিলাম নিতান্ত ঘটনাচক্রে একজন বৃদ্ধ গাইডের মুখে। আমাকে ঐ নারী-মূর্তিটির স্কেচ করতে দেখে সে ঘনিয়ে এসেছিল। এ জাতীয় কৌতূহলী দর্শককে উপেক্ষা না করতে পারলে আউট-ডোর স্কেচ করা যায় না। আমি তাকে আদৌ পাত্তা দিইনি। তবে বুঝতে পেরেছিলাম সে গাইড, সম্ভবতঃ সরকারী গাইড, অন্ততঃ সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রদর্শক এবং তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে।

ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

একটু দূরে বসে সে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে আমাকে। বিশেষ করে আমার ছবিটিকে। তখন বেলা দুপুর। শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। রৌদ্রের তাপ আছে। সেই মধ্যাহ্নে কোণার্ক প্রায় নির্জন। দু-একটি স্থানীয় ছোকরা ডাব আর কাটারি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল এতক্ষণ—তারাও বিদায় হয়েছে। বিশ্বচরাচরে যেন শুধু আমরা দুটি প্রাণী। না, এ ছাড়া সেখানে ছিল অগুন্তি ঘুঘুপাখি। তাদের মধ্যাহ্ন-কূজন ঘুমপাড়ানিয়া। আমি ফ্লাস্ক খুলে ঢালতে গিয়ে দেখি ভাড়ে ভবানী!

তখনই লোকটা প্রথম কথা বলল, পাণী লা-দেউ ক্যা?

স্কেচখাতাখানি নামিয়ে রেখে হেসে বলি, কাছে-পিঠে পাওয়া যাবে?

—কেঁউ নহী? আভি লা-দেতা হুঁ।

লোকটা জল নিয়ে এসে যখন ঘনিয়ে বসল তখন তার সঙ্গে আলাপ জমালাম। হ্যাঁ, সে সরকারী গাইড। বাড়ি মুঙ্গের জিলা। এখানে আছে অনেক দিন। এ বছরই অবসর নেবে। সে জানতে চাইল, এতগুলি নারীমূর্তির ভিতর আমি বেছে বেছে কেন এরই ছবি আঁকতে বসেছি। সত্যি কথাই বলি—না, আমি অনেকগুলিরই ছবি এঁকেছি। দেখ না।

খাতাখানা উল্টে-পাল্টে দেখে ফেরত দিল। হঠাৎ একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল, বাবুজী, বলতে পারেন, মেয়েটা আসলে হাসছে না কাঁদছে?

বললাম, সেটা ঠিক মালুম হচ্ছে না। তুমি জান?

—না, জানি না। তবে এই মূর্তিটির সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত গল্প জানি, আপনার যদি সময় থাকে তো বলতে পারি।

আমি ছায়ায় সরে এসে বলি, অনেকক্ষণ এঁকেছি। তোমার গল্পটাই শোনা যাক।

ও বললে এই আজব কাহিনীটি সে শুনেছিল অপর একজন স্বর্গত পেশাদার গাইডের মুখে, অন্ততঃ ত্রিশ বছর আগে। এই মুখে-মুখে চলে-আসা উপকথার মূল কোথায় আজ আর তা খুঁজে বার করার উপায় নেই। জানি, এ লোকগাথার কোনও মূল্য নেই ঐতিহাসিক, গবেষক অথবা পুরাতাত্ত্বিকের কষ্টিপাথরে—কিন্তু আপনার-আমার মতো রস-পিপাসু দর্শকের কাছে এ আষাঢ়ে গল্পটা—নিতান্ত ঘটনাচক্রে সংগৃহীত কাহিনীটি নিজের ভাষায় সাজিয়ে পরিবেশন করার লোভ সামলাতে পারছি না।

কোণার্ক-জগমোহনের তলা-পোতালের ষোলোটি বৃহদায়তন দেবদাসীর মূর্তি নাকি একই ভাস্করের নিপুণ হাতে গড়া। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর সমতুল্য ভাস্কর সে-যুগে আর দ্বিতীয় ছিল না। আমাদের গল্পের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম বিশ্বকর্মা মহাপাত্র। বিশ্বকর্মার সৃষ্ট মূর্তিগুলির অধিকাংশই মহাকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে কোণার্ক-জগমোহনের সুউচ্চ পোতালে। সামুদ্রিক লোনা-হাওয়ায় তারা পেলবতা ক্ষুইয়েছে, তাদের অনিন্দ্য দেহসৌন্দর্যে অসংখ্য ব্রণচিহ্নের দাগ, তবু তাদের মূল আবেদন, তাদের হাসি-কান্নার ইতিকথা আজও অম্লান। তারা কালজয়ী! কিন্তু ভাস্করের ব্যক্তিগত জীবনটি ছিল অভিশপ্ত। বিশ্রুতকীর্তি ভাস্কর হওয়া যদি অপরাধ হয় তাহলে তিনি অপরাধী--আর কোন পাপ তিনি করেননি—স্বাধিকারপ্রমত্ততার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পায়নি তাঁর আচরণে; তবু যৌবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল! রাজাদেশে বস্তুতঃ তাঁকে বন্দী করে আনা হয়েছিল এই অর্কক্ষেত্রে। জগমোহনের উপর অলিন্দে দাঁড়িয়ে সূর্যসাক্ষী পুষ্করমেঘের উদ্দেশ্যে তিনি কুর্চি ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করলেও কোন কবি তা নজর করেননি। কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা ভাস্করজায়ার সঙ্গে ইহজীবনে আর তাঁর পুনর্মিলন হয়নি। বহুবার ছুটি চেয়েছিলেন—দু-চার দিন গ্রাম থেকে ঘুরে আসতে; ছুটি মঞ্জুর হয়নি। রাজার দাবী সর্বযুগেই সর্বাগ্রে। শেষপর্যন্ত বিশ্বকর্মা জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন এই অর্কক্ষেত্রেই। মন্দির সমাপ্ত হবার আগেই।

ভাস্কর বিশ্বকর্মা তো মুক্তি পেলেন, কিন্তু মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়া

কর্তৃক নিযুক্ত এ মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যের! তলা-পোতালের মূর্তির সমতুল্য উপর-পোতালের মূর্তিগুলি যে তখনও গড়া হয়নি! বিশ্বকর্মার সহকারী দু-চারজনকে দিয়ে সে-কাজ করানোর চেষ্টা হল—কিন্তু না, তাদের হাতের কাজ একটুও মনোমত হল না। মহামাত্য চতুর্দিকে সন্ধান করতে থাকেন, বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার মতো উপযুক্ত ভাস্কর কেউ কোথাও আছে কি না। রাজাদেশে দূত ছুটল বিশাল কলিঙ্গরাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

শেষ পর্যন্ত সন্ধান এল দূতের মুখে। আছে। বিশ্বকর্মার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো কারিগরও আছে স্বর্ণপ্রসূ কলিঙ্গরাজ্যে। দূত দেখে এসেছে তার হাতে গড়া পাথরের মূর্তি। সে মূর্তি নাকি অপূর্ব! কোণার্কেও নাকি অমন সুন্দর, অমন প্রাণবন্ত মূর্তি নেই।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল মহামাত্যের। বললেন, কী বকছ উন্মাদের মতো?

হাত দুটি জোড় করে সংবাদবহ বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছি প্রভু; না হলে এ ধৃষ্টতা প্রকাশ করতাম না।

—তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

—সে এল না। অস্বীকার করল। বললে, তোমাদের রাজাও মন্দির গড়ছেন, আমিও মন্দির গড়ছি। আমার সময় নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহামাত্য! কে এই দুঃসাহসী, দুর্বিনীত ভাস্কর? আত্মসংবরণ করে বললেন, কী বল্‌ল সে? মন্দির গড়ছে! কোন দেবতার মন্দির?

—তা জানি না, প্রভু। মন্দির এখনো শুরু হয়নি। সে গড়ছে একটি দেবমূর্তি—আমি সে অসমাপ্ত মূর্তিটি দেখেছি, প্রভু। কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্তি তা বুঝতে পারিনি। পুরুষ মূর্তি—দেবী নয়, দেবতা—মুখখানি শেষ হয়নি; তখনো খোদাই করছিল। শুনলাম, দিবারাত্র সে কাজ করে চলেছে। অশ্বমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে...

—অশ্বারোহী দেবমূর্তি? হরিদশ্ব?

সংবাদবহ মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে না প্রভু। দেবতা অশ্বারূঢ় নন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ভূতলে, অশ্বের বল্‌গা ধরে তার গতিরুদ্ধ করছেন।

দুরন্ত কৌতূহল হল মহামাত্যের। সপার্ষদ তখনই রওনা হয়ে পড়েন অশ্বপৃষ্ঠে, কলিঙ্গের দূরতম পল্লীপ্রান্তে।

স্বচ্ছতোয়া মহানদীর প্রান্তে এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরধ্বনিতে। রাজ-প্রতিনিধি মহামাত্য নাকি স্বয়ং এসেছেন গ্রামে। অশ্বারোহীর দল সেই সংবাদবহর নির্দেশ অনুসারে এসে থামে গোলপাতায় ছাওয়া একটি পর্ণকুটিরের সম্মুখে। বেরিয়ে আসে নগ্নগাত্র একজন তরুণ ভাস্কর, তার সর্বাঙ্গ পাথরের কুচিতে ভরা, চুল রুক্ষ, হাতে ছেনি-হাতুড়ি। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে রাজ-প্রতিনিধিদের দিকে, কী চাই?

মহামাত্য আত্মপরিচয় দেবার পর তাড়াতাড়ি একখানি তালপাতায় বোনা মাদুর বিছিয়ে দেয় মেঠো-দাওয়ায়। বলা বাহুল্য মহামাত্য তাঁর মহামূল্য বসনে ধূলার প্রলেপ লাগাতে সম্মত হলেন না। ওখানে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করেন, তোমার নাম?

—কৌস্তুভ।

—তুমি নাকি পরমভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজ নরসিংহদেব লাঙ্গুলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি দেবদেউল গড়ছ?

কৌস্তুভ ম্লান হেসে বললে, আজ্ঞে না। আমি উন্মাদ নই। কারও সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো ইচ্ছাও আমার নেই। তবে হ্যাঁ, 'দেউল' না গড়লেও একটি 'দেবমূর্তি' আমি নির্মাণ করছি বটে।

—কোন দেবতার মূর্তি?

—ভাস্করের।

—সূর্যের? হরিদশ্বমূর্তি?

—আজ্ঞে না। তিনি স্বর্গের ভাস্কর নন, মর্ত্যের ভাস্কর। সূর্যের অপেক্ষাও তিনি গরীয়ান্।

অর্থ গ্রহণ হয় না মহামাত্যের। অখ্যাত পল্লীবাসীর এ ঔদ্ধত্যে স্বভাববশেই মহামাত্যের দক্ষিণহস্ত দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরেছে তাঁর তরবারির মুঠ। কোনক্রমে আত্মসংবরণ করে বলেন, আমরা তোমার গড়া সেই মূর্তিটি একবার দেখতে পারি?

—সচ্ছন্দে। এতো আমার সৌভাগ্য। আসুন ভিতরে।

প্রাঙ্গণে রক্ষিত প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্তিটির দিকে দৃক্‌পাতমাত্র চম্‌কে ওঠেন মহামাত্য। বলেন, এ কী! এ দেবতা কোথায়? এ তো আমাদের কোণার্কের ভাস্কর, স্বর্গতঃ বিশ্বকর্মা মহাপাত্র!

সবিনয়ে কৌস্তুভ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরই মূর্তি। আমার কাছে তিনিই স্বর্গ, তিনিই ধর্ম—তিনিই আমার পরমংতপঃ!

—তুমি...তুমি আমাদের বিশ্বকর্মার পুত্র?

কৌস্তুভ হেসে বলে, তা না হলে ও-কথা কেন বলব বলুন?

কৌস্তুভের কোন ওজর-আপত্তিতে কর্ণপাত

করলেন না মহামাত্য। এ অলৌকিক যোগাযোগ! এ দেবতার নির্দেশ! না হলে এ ভাবে কেমন করে তিনি এসে উপনীত হবেন তাঁর প্রয়াত প্রধান ভাস্করের ভিটেতে! তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন মুহূর্তে—বিশ্বকর্মার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে তারই সুযোগ্য পুত্র! এ নিতান্ত ভবিতব্য! দেবতার ইঙ্গিত তাই!

কিন্তু তরুণ শিল্পীও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বললে, আমাকে মার্জনা করবেন মহামাত্য! আমি দেশান্তরে যাব না। এই পল্লীপ্রান্তেই সামান্য মূর্তি-গড়ার কাজে...

—অসম্ভব! এমন প্রতিভা এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী!

—কী আশ্চর্য! জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন উঠছে কী ভাবে? আমি খ্যাতি চাই না, সম্মান চাই না, অর্থ সম্পদ চাই না! আপনারা জোর করে তা আমাকে দেবেন?

—হ্যাঁ তাই দেব! রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সব কিছুর গুরুভার বইতে হবে তোমাকে—খ্যাতি, সম্মান, অর্থ-সম্পদ! সব কিছু!

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে কৌস্তুভ বললে, মায়ের সমস্ত অভিশপ্ত জীবনটা আমার চোখের উপর কেটেছে। কেঁদে কেঁদেই বোধকরি তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমিই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। এ আদেশ আপনি করবেন না প্রভু। আর তাছাড়া—

সঙ্কোচে সে মাঝপথে থেমে যায়।

কিন্তু রাজার প্রয়োজনের কাছে মায়ের চোখের জলের আর কী মূল্য?

অবশেষে কৌস্তুভ-জননী স্বয়ং এসে জড়িয়ে ধরলেন মহামাত্যের চরণ দুটি। কৌস্তুভের অসমাপ্ত বাক্যটি শেষ করে বিধবা বললেন, পুত্রের বিবাহ স্থির করেছি। আগামী মাঘী-শুক্লা-সপ্তমীতে আমার গৃহে আসছেন নববধূ। পক্ষকালও আর বাকি নেই প্রভু, এমন সময়ে আপনি এ কী সর্বনাশের কথা বলছেন?

—সর্বনাশ কেন হবে? অর্কক্ষেত্রের মহামন্দিরের প্রধান ভাস্করের পদলাভ করা কি দুর্লভ সৌভাগ্য নয়?

—অন্ততঃ বিবাহটা হয়ে যাক...

—তা কেমন করে সম্ভব? এখন প্রতিটি দিন মহামূল্যবান! ওকে আমার সঙ্গে এখনই যেতে হবে।

—কিন্তু বিবাহ?

—হবে। ছুটি মঞ্জুর হলেই।

বিধবা বলতে পারলেন না—তাঁর স্বামীর কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়নি।

বধূও গ্রামের মেয়ে। নাম লক্ষ্মী। সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। লক্ষ্মীর সঙ্গে কৌস্তুভের শিশুকাল থেকেই জানাশোনা। খেলাঘরের বরবউ হত ওরা। প্রতিবেশীরা বলত, আহা দুটিতে সত্যিই বড় সুন্দর মানায়। পাল্টি ঘর। বিবাহে কোন বাধা হওয়ার কথাও নেই। তারপর লক্ষ্মী বড় হয়েছে, এখন সে সঙ্কোচে তার বাল্যবন্ধুর সামনে বড় একটা আসে না। বরং সে বাড়িতে অনুপস্থিত জানলে এসে দেখে যায় তার হাতে-গড়া মূর্তি। লুকিয়ে লুকিয়ে। এখন দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত। এতদিন বিবাহ হয়নি যেহেতু বিশ্বকর্মা ছুটি পায়নি। এখন আর সে প্রশ্ন নেই। গ্রাম্য পুরোহিত বিধান দিয়েছেন—কালাশৌচের মধ্যেও এ বিবাহ সিদ্ধ; কারণ কন্যা অরক্ষণীয়া। কৌস্তুভকে কিছু দান করতে হবে প্রায়শ্চিত্তবাবদ—তা পুরোহিত নিজেই দান গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ওদের গভীর প্রণয়ের কথা গ্রামবাসীরও অজানা নয়। তারা বারে বারে কাতর অনুনয় বিনয় করতে থাকে। কিন্তু রাজ-প্রতিনিধি মহামাত্যের হৃদয় পাষাণ দিয়ে গড়া।

শেষ পর্যন্ত অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা এসে হাত দুটি জোড় করে বললেন, আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে গেছে প্রভু! এ কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! ঐ লগ্নেই কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হবে! আপনি ওকে স্বচক্ষে দেখুন, নিজে চোখে দেখলে আপনি কিছুতেই অমন লক্ষ্মী প্রতিমার এতবড় সর্বনাশ করতে পারবেন না।

কন্যাদায়গ্রস্ত অর্ধোন্মাদ ভীড়ের ভিতর থেকে টেনে নিয়ে আসেন ব্রীড়াবনতা একটি নতমুখী চতুর্দশীকে। সলজ্জে এগিয়ে এসে সে মহামাত্যের পদধূলি গ্রহণ করে। তাকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান মহামাত্য! কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! এমন পরমা সুন্দরী একটি নারীরত্ন কেমন করে এতদিন লুকিয়ে ছিল এই ছায়াঘন পল্লীপ্রান্তে!

ধীরে ধীরে বললেন, তুমি সত্যই বলেছ! এমন অনিন্দ্যকান্তি সুন্দরীর অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব! আমি কথা দিচ্ছি, মহারাজের আশীর্বাদে এই কুমারী-কন্যার সর্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দেব আমি; কিন্তু তার পূর্বে কৌস্তুভকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে মহারাজের সভায়। সব কথা খুলে বলতে হবে মহারাজকে।

কৌস্তুভ বলে, স্বর্ণালঙ্কারে আমাদের প্রয়োজন

নেই! এ-মূর্তি অসমাপ্ত রেখে আমি কোথাও যাব না। আমি স্বাধীন শিল্পী, গরিব, দিন আনি, দিন খাই—কারও অনুগ্রহভাজন নই! রাজশক্তির এমন ক্ষমতা নেই যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

তার মুখ চেপে ধরেন বিশ্বকর্মার অন্ধ-বিধবা। কথাটা শেষ হয় না। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না কারও।

তবু আশ্চর্য! মহামাত্যের কোনও ভাববৈকল্য দেখা গেল না এবার। তাঁর দক্ষিণ হস্ত এবার আর তরবারির মুঠের দিকে এগিয়ে গেল না। বরং একটি বিচিত্র হাসির আলিম্পন ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠ-প্রান্তে। বললেন, তোমার এই মূর্তিটির কী ব্যঞ্জনা কৌস্তুভ? ও কেন অমন করে অশ্বের বল্‌গা চেপে ধরেছে?

বিধবার স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। তিনি ভেবেছিলেন, দুর্বিনিত পুত্রের অসমাপ্ত বাক্যটির অর্থ প্রণিধান করতে পারেননি মহামাত্য।

তরুণ ভাস্কর ম্লান হেসে বললে, কোণার্ক-মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত মহামাত্যকে বুঝিয়ে দিতে হবে মূর্তির ব্যঞ্জনা? কিন্তু ব্যাখ্যাতে কি শিল্পের রসাভাস ঘটে না?

মহামাত্য বলেন, শুধু বল—ও কেন অশ্বারূঢ় নয়, ও কেন মাটিতে?

—শুনুন। ব্যাখ্যা করেই বলছি: আপনারা অর্কক্ষেত্রে যে দেবদেউল গড়ছেন উত্তরকাল তাকে বলবে শ্রীমন্ মহারাজ নরসিংহদেবের সূর্যমন্দির। তারা জানবে না, এ মন্দিরের প্রধান ভাস্করের নাম! তারা চিনবে না বিশ্বকর্মা মহাপাত্রকে। এটাই অবশ্য এ মহান উপদ্বীপের ঐতিহ্য! আমরা জানি না—ত্রিভুবনেশ্বর—শুধু লিঙ্গরাজ কেন, সমগ্র কলিঙ্গ-রাজ্যের অযুতনিযুত দেবদেউলের হতভাগ্য ভাস্কর-দলের নাম, স্থপতির পরিচয়। তাই আমার এই প্রতিবাদ! আমার এ মূর্তি তাই ভাবীকালকে ডেকে বলবে—শৃন্বন্তু বিশ্বে! কোণার্ক মহাতীর্থে নভচারী মার্তণ্ডদেবের রথাশ্বের বল্‌গা একদিন চেপে ধরেছিলেন: ভাস্কর বিশ্বকর্মা মহাপাত্র! অরুণ-চালিত সে স্বর্গীয় রথাশ্ব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মহাপ্রলয়ের শেষদিন পর্যন্ত মহাকাশে চলবে, শুধু চলবে—কিন্তু মর্ত্যে, এই মাটির পৃথিবীতে, এই কোণার্ক মহাতীর্থে—মানুষের হাতে সে গতিশূন্য! চরৈবেতি-মন্ত্রে দীক্ষিত স্বর্গের ভাস্করের অশ্ব মর্ত্যের ভাস্করের হাতে গতিহীন! গগন-অশ্বের বেগ হয়েছে মাটির তিলক-কাটা মগন-শিল্পীর আবেগ! ভক্তের কাছে ভগবান দিয়েছেন ধরা!

মহামাত্য বলেন, তাই যদি হয়, কৌস্তুভ, তবে এ মূর্তিও আমি নিয়ে যাব অর্কক্ষেত্রে। এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে কে দেখতে আসবে তোমার ঐ অপূর্ব ভাস্কর্য? আমি বিশ্বকর্মা মহাপাত্রের এই অনবদ্য প্রতিমূর্তিটিকে কোণার্ক দেবদেউলের দক্ষিণদ্বারে স্থায়ী আসনে বসাবো! হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি—কলিঙ্গের অযুত-নিযুত মন্দিরে স্থপতি ও ভাস্কর উপেক্ষিত। সহস্রাব্দীকালের সে ত্রুটি সংশোধন করব তুমি-আমি! ভাবীকালকে ডেকে আমরা দুজনে বলব—অর্কক্ষেত্রের প্রধান ভাস্করকেও সম্মান জানাতে ভুল হয়নি আমাদের! পৃথিবী দেখুক—স্বর্গীয় ভাস্করের অশ্বের বেগ মর্ত্যের ভাস্করের কাছে কীভাবে শিল্পের আবেগ হয়েছে! ভৃগুপদ-চিহ্ন একমাত্র নারায়ণই বুকে ধারণ করেননি, মার্তণ্ড-দেবও ভক্তের হাতে ধরা দিয়েছেন কোণার্ক তীর্থে।

কৌস্তুভ বললে, তথাস্তু!

মহামাত্য তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কৌস্তুভের স্বহস্তে গড়া বিশ্বকর্মার প্রতিমূর্তিটি আপনারা আজও দেখতে পাবেন জগ-মোহনের দক্ষিণদ্বারে, যদিও সে মূর্তি আজ মুণ্ড-হীন (চিত্র—11·9)।

কৌস্তুভও রেখেছিল তার প্রতিশ্রুতি। বছরের পর বছর সে কাজ করে গেছে কোণার্কে। তরুণ ভাস্কর হয়েছে প্রৌঢ়, ক্রমে বৃদ্ধ। কোণার্ক দেউল শেষ হবার পরেও তার ছুটি হয়নি। ছুটেছে কলি-ঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। রাজাদেশে। গড়ে গেছে মূর্তি। একের পর এক, তারপর আবার এক! কে জানে কোথায় সে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। হয়তো বাপের মতোই মৃত্যুকালে তার মুষ্টিতেও ধরা ছিল ছেনি-হাতুড়ি! কোণার্ক-জগমোহনের উপর-পোতালে তার হাতের কাজ আজও দেখতে পাবেন—বুঝতে পারবেন না যে, সে মূর্তি-গুলি নিচের পোতালের ভাস্করের হাতে গড়া নয়। বোধকরি পুত্রের হাতে পিতার পরাজয়ই ঘটেছিল!

বৃদ্ধ গাইডকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিলাম, আর লক্ষ্মী?

—কী লক্ষ্মী, বাবুজী?

—বাঃ! লক্ষ্মীর কী হল তা তো তুমি বল্‌লে না? কৌস্তুভের নিরলস পরিশ্রমের বিনিময়ে মহা-রাজ কি লক্ষ্মীর সোনার অঙ্গ স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে দেননি?

বৃদ্ধ গাইড ম্লান হেসেছিল। বলেছিল, মহা-মাত্য কি তাঁর কথার খেলাপ করতে পারেন? আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ সত্যিই স্বর্ণালঙ্কারে মুড়ে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকে। আপাদমস্তক!

কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল বৃদ্ধের ঐ হাসি-টায়। যে মূর্তিটির ছবি আঁকতে আঁকতে এত কথার অবতারণা সেই মূর্তির হাসির প্রতিবিম্ব পড়েছে যেন ঐ বৃদ্ধ গাইডের মুখদর্পণে! তাই পুনরায় প্রশ্ন করেছিলাম—কিন্তু লক্ষ্মীকে বিয়ে করে কৌস্তুভ কি নিজের কাছে নিয়ে আসেনি? কৌস্তুভ-জননীর মতো সে বেচারিও কি অন্ধ প্রোষিত-ভর্তৃকার জীবনযাপন করেছিল!

—না বাবুজি! মহামাত্যের সঙ্গে মহারাজ একমত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ঠিকই বলেছ মহামাত্য—এমন সুলক্ষণা কন্যার অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব। ও দেবতার ভোগ্য! আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুজি! লক্ষ্মীর বিবাহ হয়নি—সে হয়েছিল দেবদাসী! দেবতার মন্দির-চত্বরে খঞ্জনী বাজাতো সে! কৌস্তু-ভের সঙ্গে তার দেখাও হয়েছে! কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। রাজাদেশে কৌস্তুভ লক্ষ্মীরও একটি প্রতিমূর্তি গড়েছিল!

—লক্ষ্মীর প্রতিমূর্তি! কোথায় সেটা?

এই তো এতক্ষণ আপনি লক্ষ্মীর স্কেচই আঁক-ছিলেন বসে বসে!

স্বীকার করছি, এ কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নেই—এ গল্প বিশ্বাস করাও শক্ত। তবু মন চায় বিশ্বাস করতে—যেন তাহলেই ঐ অনিন্দ্যকান্তির ঐ বিষাক্ত হাসিটার অর্থ হয়! ওর চোখে কোন্ মাঘী শুক্লা সপ্তমীর কুয়াশাঢাকা চন্দ্রালোক! যে শুক্লা সপ্তমী চিরদিনই রয়ে গেল ওর নাগালের বাহিরে! পিগ্‌ম্যালিয়ানের মতো প্রাণের সবটুকু আকুতি উজার করে গড়েছে বলেই কৌস্তুভ ঐ দেব-ভোগ্যা দেবদাসীটিকে এভাবে রূপায়িত করতে পেরেছে—পাথর তো নয়, ও মূর্তি যে প্রেম দিয়ে গড়া! (প্লেট—III, দক্ষিণ)

একটা কথা। যদিও আমরা কলিঙ্গ-স্থাপত্যের আলোচনা পঞ্চম পর্যায়ের কোণার্ক মন্দিরে সমাপ্ত করছি, তার মানে এ নয় যে, কলিঙ্গ-শিল্পীরা সেখানেই থেমে গিয়েছিলেন। পরবর্তী যুগেও ওখানে মন্দির হয়েছে, মূর্তি তৈরী হয়েছে, আজও হয়—কিন্তু নিঃসন্দেহে কোণার্কই এ শিল্পের সর্বোচ্চ-শিখর। তারপর যা-কিছু হয়েছে তা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের অবক্ষয়ীরূপ। পরবর্তী মুসলমান আধি-পত্যের যুগে রাজানুগ্রহে বিশাল মন্দির নির্মাণের প্রশ্নই ওঠেনি। পৃষ্ঠপোষকের অভাবে এ শিল্প অব-ক্ষয়ের পথে যাত্রা শুরু করল; কিন্তু শিল্পীমন তো সেজন্য থেমে থাকতে পারে না। প্রকাশের ব্যাকুলতায় তা আপনিই পথ করে নেয়। তাই দেখতে পাই এর পরের যুগে কলিঙ্গশিল্পীর দল অন্যান্য অনাবিষ্কৃত শিল্পরাজ্যে রসের অভিসারী। জন্ম নিচ্ছে নূতন নূতন শিল্প—হাতে-লেখা পুঁথির উপর সূক্ষ্ম তুলির কাজ, পিতল-কাঁসা-রূপার অপূর্ব ঢালাই-এর কাজ, বয়ন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাঁথা ও কাঠের কাজ। বয়ন ও বস্ত্রশিল্পে কলিঙ্গশিল্পীর ঐতিহ্য অবশ্য দীর্ঘ-দিনের। প্রাক-গুপ্ত যুগেও কলিঙ্গ থেকে অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশে সুতীবস্ত্র রপ্তানি করা হত। বস্তুতঃ, তামিলভাষায় সে স্বীকৃতি স্থায়ীভাবে স্বাক্ষর রেখেছে; তামিলভাষায় 'সুতীবস্ত্র'-এর প্রতিশব্দ 'কলিঙ্গম্'।

স্থাপত্য-ভাস্কর্যে যা দেখেছি, এখানেও তাই দেখতে পাচ্ছি—কলিঙ্গ তার স্বকীয়তার স্বাক্ষর প্রতিটি শিল্পে রাখতে চায়। ওদের রূপা-কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্রে যে সূক্ষ্ম কারিগরী তার একটা বিশেষজাতের রূপরীতি বা 'স্টাইল' আছে। কটকী শাড়ি, কটকী মীনার কাজ সহজেই তার বিশেষ রূপটি মেলে ধরে বলে সে অনন্য। ধরা যাক নৃত্য-শিল্পের কথা। উড়িষ্যার 'ওড়িসি'-নাচ তার বিশেষ ছাপটি ছাড়েনি। তামিলনাড়ুর 'ভারত নাট্যম' বা 'মোহিনী আট্যম্', কেরলের 'কথাকলি', অন্ধ্রের 'কুচিপুড়ি', উত্তরখণ্ডের 'কথক', আসামের 'বিহু' অথবা মণি-পুরের 'মণিপুরী'-নাচ যেমন এক-একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যতার দাবী রাখে, উড়িষ্যার 'ওড়িসি'-নাচও তেমনই স্বকীয়তার দাবীতে ভাস্বর। নৃত্যরাজের সেই বিশেষত্বটুকু কী, তা বুঝতে হলে আপনাদের ওড়িয়া গবেষক শ্রীকবিচন্দ্র কালীচরণ পট্টনায়কের গবেষণা গ্রন্থটি দেখতে হবে।

কিন্তু উড়িষ্যার যাবতীয় শিল্পকলা আমাদের বিচার্য নয়। আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র তার দেব-দেউলের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে। উপসংহারে এত কথার অবতারণা করছি এজন্য যে, আমাদের মনে হয়েছে, কলিঙ্গবাসীরা জাতিগতভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল, 'কনজার্‌ভেটিভ'। ভাবতে অবাক লাগে—যে কলিঙ্গ তার শ্রীক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে ফেলতে পারল—যা নাকি আসমুদ্র হিমাচলে আর কোথাও সম্ভবপর হল না,—সেই কলিঙ্গই কী-করে তার যাবতীয় শিল্পভাবনায়—ভাস্কর্যে, স্থাপত্য, নৃত্যে, সঙ্গীতে, মীনার কাজে, বস্ত্রশিল্পে এতটা রক্ষণশীল হয়ে থাকল সহস্রাব্দি-কাল ধরে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের শিল্পস্ফুরণ সে দেখেছে, বুঝেছে,—কিন্তু নিজ জারকরসে সম্পূর্ণ জীর্ণ না করে কোনকিছুই সে গ্রহণ করেনি। ধরুন

ভাষার কথা। 'ওড়িয়া' বোধকরি উত্তর-ভারতের সংস্কৃতজ একমাত্র ভাষা যে, অর্ধসহস্রাব্দিকালের ভিতর সবচেয়ে কম পরিবর্তিত হয়েছে। মাগধি প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত উত্তর-পূর্ব ভারতের ছয়টি ভাষার (বাঙলা, ওড়িয়া, আসামী, মৈথিলী, মাগধী এবং ভোজপুরী) মধ্যে ওড়িয়াই তার শব্দের অন্তস্থ স্বর-বর্ণটিকে টিকিয়ে রেখেছে এবং এই ছয়টি ভাষার ভিতর রক্ষণশীল ওড়িয়াই আদিম 'মাগধী অপভ্রংশ'-গুলি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।

কলিঙ্গ দেব-দেউল পরিক্রমার শেষে ওড়িয়াদের এই জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু আমরা বিশেষভাবে প্রণিধান করেছি। ভাবের রাজ্যে, আগেই বলেছি, বাঙলার সঙ্গে চিরকালের যোগ আছে কাশীর ও পুরীর। সেজন্য কাশী উত্তরপ্রদেশে এবং পুরী উড়িষ্যাতে হওয়া সত্ত্বেও ঐ দুটি স্থানে গেলে বাঙালীর মনে হয় না যে, বিদেশে এসেছি।

স্যার জন মার্শাল বলেছিলেন, ভারতবর্ষে কোন বিদেশী এলে তাঁর পক্ষে অন্ততঃ ছয়টি স্থাপত্যকীর্তি দেখা উচিত : 'অজন্তা, এলোরা, সাঁচী, খাজুরাহো, কোণার্ক এবং তাজমহল।' গণ্ডীটিকে আরও যদি ছোট করি তবে বলব, ভারতবর্ষের তিনটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে—অজন্তা, তাজমহল এবং কোণার্ক। □



॥ টীকা ও উৎস-নির্দেশ ॥

[প্রথম সংখ্যাটি ক্রমিক, দ্বিতীয়টি পৃষ্ঠার, তৃতীয়টি স্তম্ভের এবং চতুর্থটি পংক্তির]

প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ কলিঙ্গ-শিল্পের বৈশিষ্ট্য ও যুগবিভাগ

1.3.1.10 ব্রহ্মপুরাণ, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক 29-31।
2.3.1.11 ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডল, 147।
3.3.1.17 মহাভারত, শান্তিপর্ব, চতুর্থ অধ্যায়।
4.3.1.22 ঐ , বনপর্ব, প্রথম অধ্যায়।
5.6.2.12 *Architecture through Comparative Methods*, Bannister Fletcher.
6.7.2.6 *Advanced History of India*, R. C. Majumdar, Vol. II, London, 1950.
7.8.1.25 *Archaeological Remains of Bhubaneswar*, K. C. Panigrahi, 1961, p. 11.
8.8.1.28 *Indian Historical Qly. Journal* Vol. XXI, 45, p. 215.
9.8.1.31 *J. R. A. S. B.*, (New Series), Vol. XIII, p. 68.
10.8.1.38 *Historical Qly. Journal*, Dec. '46, D. C. Sarkar.
11.9.1.5 *History of Orissa*, R. D. Banerji, Vol. I, p. 249.
12.9.1.6 *Arch. Remains of Bhub.*, K. C. Panigrahi, p. 12.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ মৌর্যযুগ

1.11.2.7 *An Account of Orissa Porper or Cuttack*, A. Starling (Asiatic Research, Vol. XV), 1822.
2.11.2.7 *Orissa*, Vol. I & II, Hunter.
3.11.2.8 'পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা', ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়।
4.11.2.8 *Antiquities of Orissa*, R. L. Mitra, Vol. I, 1875.
5.11.2.11 *J. B. O. R. S.*, Vol. XIII, R. Chandra, 1927.
6.11.2.11 *History of Orissa*, R. D. Banerji, Vol. I, p. 109 & p. 219.
7.11.2.36 *History of the Rajas of Orissa*, translated from 'Vamshabali' in the Jour. of Asiatic Soc. of Bengal, Vol. VI, (1837), pp. 756-67.
8.12.1.42 *Ancient India*, Vol. V, p. 62-105.
9.12.2.22 *Antiquities of Orissa*, R. L. Mitra, Vol. II, 1880, p. 89.
10.12.2.33 *Arch. Rem. of Bhubaneswar*, Panigrahi, p. 183-86.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ গুহামন্দির যুগ

1.14.2.19 বরাবর পর্বত বিহারে, গয়া জেলায়; গয়া শহর থেকে 30 কি. মি. উত্তরে।
2.15.1.19 *Asiatic Researches*, Vol. XV, 1824.
3.15.1.21 *Journal of the Asiatic Soc.*, Vol. VI, 1837.
4.15.1.23 *Antiquities of Orissa*, R. L. Mitra, Vol. II, 1880.
5.15.2.12 শিলালিপির পংক্তি-সংখ্যা শ্রী বি. এম. বড়ুয়া-কৃত *"Old Brahmi Inscriptions"* গ্রন্থ অনুসারে উল্লিখিত। তাঁর ইংরাজী অনুবাদ থেকে বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।
6.16.1.13 *The Early History of India*, V. A. Smith, 4th Edn. p. 139.
7.16.1.25 *Arch. Rem. of Bhubaneswar*, Panigrahi, p. 125-198.
8.16.2.38 *History of Indian & Eastern Architecture*, J. Fergusson.
9.18.1.12 "Nor is any trace of Buddhism found among them ; the figures of *Gaja-Luxmi* or *Shri*, of snakes and sacred trees, the Swastika and other symbals are as much Jaina as Buddhist, and in several of the Caves—not perhaps the earliest, are found figures of the Jaina *Tirthankaras* and their attendants."—History of Eastern Architecture, Vol. II,—Sir J. Fergusson, pp. 11-12.
10.18.1.29 "Even as late as in 1880, Babu Rajendralal Mitra, who had the most ample opportunities of examining every details of the Orissan Caves, had no suspicion of their being other than Buddhist origin ; and his readings of the *Hati Gumpha* inscriptions—like the whole of his works (i.e., Antiquities of Orissa, 1875) is simply worthless." *Ibid*, Page 11, foot note.

11.18.2.27 ফার্গুসন জানিয়েছেন, স্বস্তিকা-চিহ্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মে সমভাবে একই আকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কথাটা ঠিক নয়। জৈন-স্বস্তিকা-চিহ্ন দক্ষিণাবর্ত (clockwise)। সপ্তম তীর্থঙ্কর সুপর্ণনাথের পদতলে যে স্বস্তিকা-চিহ্ন দেখা যায় তা সর্বত্র দক্ষিণাবর্তের। খণ্ডগিরি পর্বতে সাতবক্র-গুহায় সুপর্ণনাথের পদতলে স্বস্তিকা-চিহ্নটি লক্ষণীয়। অপরপক্ষে বৌদ্ধ-স্বস্তিকা-চিহ্ন বামাবর্ত। অনন্তগুম্ফায় যে স্বস্তিকা-চিহ্নটি আছে সেটি বামাবর্ত (anti-clockwise)। রানীগুম্ফা, গণেশ গুম্ফাতেও এ জাতীয় বেশ কয়েকটি বামাবর্তের স্বস্তিকা-চিহ্ন আমার নজরে পড়েছে।

12.21.1.36 *Artaballava Mohanti Lectures,* 1st Series, Prof. S. K. Chatterji.

13.24.2.20 *History of Indian & Eastern Architecture,* J. Fergusson.

14.25.2.23 *Artaballava Mohanti Lectures,* S. K. Chatterji.

15.25.2.27 *Archaeological Remains of Bhubaneswar, Panigrahi.*

16.25.2.43 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে', 28.3.1939, 'আকাশপ্রদীপ', রবীন্দ্রনাথ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ কলিঙ্গ-স্থাপত্যের মৌল-পরিচয়

1.27.1.23 'কণারকের মন্দির', অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু।

2.27.1.26 'উড়িষ্যার দেব-দেউল', মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

3.27.2.1 *Antiquities of Orissa,* Vol. II, R. L. Mitra.

4.33.1.19 "Within the tower (of the Rekha-deul of the main temple at *Lingaraja*) is the cella, 19 ft. square, but instead of a ceiled chamber, it is continued upwards somewhat in the manner of a well or chimney, forming a hollow space throughout the entire height."—*Indian Architecture, Buddhist & Hindu Period,* (1942), Percy Brown, Taraporewalla, Bombay, p. 127.

5.35.2.13 *Bhubaneswar,* Smt. Debala Mitra, Archaeological Survey of India, p. 17.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ কলিঙ্গ-ভাস্কর্যের মৌল পরিচয়

1.37.2.16 'ভারতশিল্পে মূর্তি', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃঃ 27।

2.40.2.7 ঐ, পৃঃ 29।

3.40.2.16 ঐ, পৃঃ 29।

4.41.2.30 'অজন্তা অপরূপা', নারায়ণ সান্যাল, ভারতী বুক স্টল, তৃতীয় মুদ্রণ, 1983, পৃঃ 168।

5.57.2.19 'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন', নারায়ণ সান্যাল, বেঙ্গল পাবলিসার্স, 1980।

6.57.2.19 *Erotica in Indian Temples,* Narayan Sanyal, Navana, 1984.

7.58.1.2 *Orissa & Her Remains,* M. M. Ganguli, 1912.

8.58.1.7 *History of Orissa,* R. D. Banerji, Vol. II, p. 40.

9.58.1.17 *Kama Shilpa,* F. Leeson, Taraporewalla & Sons, Bombay, 1962, Preface.

10.58.2.8 *Bengal Lancers,* F. Y. Brown, London, 1930.

11.59.1.11 *Kama Kalpa,* P. Thomas, Bombay, 1959, p. 139.

12.59.2.26 *Khajuraho Sculptures & Their Significance,* Smt. U. Agarwal, Bombay.

13.59.2.39 An Article, by M. Danieleu, *Marg,* Vol. X, No. 3, 1948.

14.60.2.20 *Kama-Kala,* Dr. M. R. Anand, Geneva, 1958, p. 26.

15.61.2.43 শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী অনূদিত ভর্তৃহরির কবিতার অংশ। কোথায় পড়েছি মনে নেই, স্মৃতি-নির্ভর উদ্ধৃতি।

16.62.1.41 'কনারকের বিবরণ', অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, 1960, পৃঃ 77-78।

17.63.2.27 *Kamasutra,* Vatsyayana, Bk. III, sloka 2.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥ আদি হিন্দুযুগ

1.75.2.10 "প্রাচীন বাঙলার রেখ-দেউল বা শিখর-দেউলগুলি বিশ্লেষণ করিলে সহজেই উহাদের সহিত ভুবনেশ্বরের শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায় এবং কালের দিক দিয়া যে উহারা সমসাময়িক তাহা বুঝা যায়...অনেকক্ষেত্রে জগমোহনের পরিবর্তে সম্মুখদিকের দেওয়ালে একটি অলিন্দের সংযোজন আছে।" —বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পোরিয়াম, পৃঃ 818।

2.76.2.22 'ভারতশিল্পে মূর্তি', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃঃ 3।

3.80.2.12 কার্লে-চৈত্যের ঐ মূর্তি দুইটি সে-অর্থে মিথুন নয়; দাতা এবং তাঁর সহধর্মিণীর যুগলমূর্তি। তার একটি আলোকচিত্র পাবেন The Art of Indian Asia (by H. Zimmer), Vol. II, plate 81-এ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥ মধ্য হিন্দুযুগ

1.86.1.18 *Bhubaneswar,* Smt. Debala Mitra, Arch. Soc. of India, 1961, p. 42.

অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥ খিচিঙ

1.91.1.8 'বিশ্বকোষ', সাক্ষরতা প্রকাশন, নবম খণ্ড, পৃঃ 211।
2.92.1.11 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদি পর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, ১৩৫০, পৃঃ 818।

দশম পরিচ্ছেদ ॥ পুরী

1.105.1.21 'কলিঙ্গের দেবদেউল', নারায়ণ সান্যাল, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৮১।
2.105.1.26 'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন', নারায়ণ সান্যাল, বেঙ্গল পাবলিসার্স।
3.107.1.23 *Epigraphica Indica,* Vol. XXXII, pp. 229-38.
4.107.1.24 *Epigraphica Indica,* Vol. XXX, pp. 197, ff.
5.107.1.38 *Artaballava Mohanti Memorial Lectures,* Series I, Prof. S. K. Chatterji.
6.107.2.3 ডাঃ আর্তবল্লভ মোহান্তি কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচী সমিতি', পৃঃ 23-29।
7.107.2.4 আচার্য সুনীতিকুমারের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত।
8.108.2.37 *Journal of the Asiatic Soc. of Bengal,* Vol. LXVII, Pt. I, 1998.
9.110.2.17 *Konarak,* Smt. Debala Mitra, Archaeological Survey of India, 1968, p. 76.

একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ কোণার্ক

1.115.1.29 উত্তরখণ্ডের এই বিজাতীয় পূজারীদের প্রভাবেই সম্ভবত সূর্যের পায়ে বুট্ জুতা।
2.116.1.25 এই সময়ে কলিঙ্গরাজের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা। সে হিসাবে আইন-ই-আকবরী-মতে কোণার্ক মন্দিরের নির্মাণব্যয় 36 কোটি টাকা।
3.118.1.38 *Ain-i-Akbari,* Vol. II, Jadunath Sarker & H. S. Jarratt, Cal. 1949, pp. 140-41.
4.118.2.3 *Asiatic Researches,* Vol. XV, p. 327.
5.118.2.5 *Orissa,* Hunter, Vol. II, p. 288.
6.119.1.32 এখানে মাদলাপঞ্জী একটি ভুল করেছেন তা বোঝা যায়। শাহ্ সেলিম অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছিল পূর্ব বৎসর অর্থাৎ 1627 খ্রীষ্টাব্দে। খুর্দার রাজা যখন কোণার্ক-দর্শনে আসেন তখন দিল্লীশ্বর ছিলেন শাহ্‌জাহাঁ।
7.120.1.18 *Indian Architecture, Buddhist & Hindu Period,* Percy Brown, p. 129.
8.120.2.17 *Asiatic Researches.* XV, (Serampore Series, 1825), p. 326.
9.121.1.12 *Konarak,* Ms. Debala Mitra, Arch. Soc. p. 10.
10.121.1.40 *Journal of the Asiatic Soc. of Bengal,* VII, Pt. II, 1838, p. 681.
11.121.1.44 *Antiquities of Orissa,* Vol. II, (1880), p. 150.
12.121.2.25 একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, কোণার্ক মন্দিরচূড়ায় নাকি একটি চুম্বক-শিলা বসানো ছিল, যাতে পর্তুগীজ নাবিকেরা দিকভ্রান্ত হয়ে যেত। তাই পর্তুগীজ বোম্বেটের দল জাহাজ থেকে গোলা মেরে নাকি ঐ চুম্বক-শিলা সমেত মন্দিরকে ধ্বংস করে। এ কিংবদন্তীর কোনও ঐতিহাসিক নজির নেই। গবেষকরা এ গল্প স্বীকার করেন না। এ তথ্য বিজ্ঞানসম্মত হওয়ার সম্ভাবনাও অল্প।
13.124.2.11 'কনারকের বিবরণ', নির্মলকুমার বসু, ক'লকাতা, 1926।
14.126.1.43 ঐ, পৃঃ 34।
15.129.1.3 নরসিংহদেবের অমাত্য বলছেন, ধ্বজা-কলস ওঁরা স্বস্থানে দেখেননি। অথচ দেখা যাচ্ছে তার মাপ লেখা হয়েছে—'তিন কাঠি, আট অঙ্গুলি' (অর্থাৎ ছয় ফুট)। সম্ভবতঃ কলস ও ধ্বজার যে ধাতবদণ্ডটি ('চুম্বক-লোহা-ধারণ') তিনি স্বস্থানে দেখেছিলেন তাই থেকে ঐ মাপ আন্দাজ করা গেছে।
16.131.1.24 খ্রীঃ পূঃ 1450 অব্দে তৃতীয় অ্যামিনাফিস্ কর্তৃক নির্মিত।
17.131.2.2 *Indian Sculpture & Paintings,* E. B. Havell, p. 146.
18.131.2.13 মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার বসু।

নির্ঘণ্ট

দেবতীর্থ কলিঙ্গ

নারায়ণ সান্যাল

